শাপ মোচন

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়



শাপ মোচন

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

দ্বীপায়ন প্রকাশনী

প্রকাশক

একমাত্র পরিবেশক
শব্দশিল্প
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
চিরঞ্জীব সেন

কম্পোজ
প্যারাডাইস কম্পিউটারস
আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
চৌধুরী অফসেট প্রিন্টার্স
নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা।


Free
Download
Songs
music2radio.blogspot.com

শারদীয়া পূজা।

বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ। এত মন্বন্তর, মহামারী ছাপিয়ে এ আনন্দের স্রোত বাংলার গ্রামে গ্রামে প্লাবন এনেছে, চিরদিনই আনে। খাদ্যে রেশন; কাগজ কন্‌ট্রোল, কর্মে ছাটাই, তবুও বাঙালি মহা পূজার আয়োজনে ব্যস্ত।

মহেন্দ্র কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। বাড়িতে অন্ধ দাদা, অসুস্থ বৌদি আর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র খোকন, এই তিনটিমাত্র প্রাণীর জীবনে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মাটির প্রদীপের আলোও সে জ্বালাতে পারলো না, নিরাশ হয়ে ফিরে এলো, মহেন্দ্র শুধু খোকনের জন্য একটা পাঁচ সিকের সূতীর জামা কিনে।

ওতেই আনন্দ হয়তো উথলে উঠতো বাড়িতে, কিন্তু খোকার শরীর ভালো নেই, ওদের নয়নের জ্যোতিটুকু মলিন হয়ে উঠলো। সপ্তমীর দিন একটু ভালো থাকলো খোকন, অষ্টমীর দিন কাকার গলা জড়িয়ে বললো :

কলকাতা যাবে না কাকু? কলকাতা!

কেন রে মানিক?

সেই যে তুমি বলেছিলে, কলকাতায় কে তোমার কাকা আছে তার ঘরে হাতী থাকে।

'ও হ্যাঁ যাব, কাল যাব।' বলে কবেকার বলা বিস্মৃত কথাটা একবার মনে করল মহেন্দ্র। যেতে হবে, শেষ চেষ্টা একবার করবে সে।

নবমীর সকালেই রওনা হয়ে গেল মহেন্দ্র কলকাতায়। খোকন ভাল আছে, অতএব চিন্তার কারণ নেই। পূজার আনন্দ তো তার নেই কিছু। রাত্রে পৌছাল হাওড়া ষ্টেশনে, রাতটা কাটিয়ে দিল গঙ্গার উপর, পুলের ফুটপাতে শুয়ে বসে। পুলিশে ধরতে পারতো, কিন্তু কি জানি কেন, ওকে কেউ ধরলো না, এমনকি কেউ কোন প্রশ্ন পর্যন্ত করলো না। গামছা বাঁধা কাগজের পুঁটলীটা মাথায় দিয়ে মহেন্দ্র নিরাপদে কাটিয়ে দিল, কিন্তু দশমীর সকাল, সে এখন যায় কোথায়? যেখানে যাবে লক্ষ্য করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, সেখানে যেতেও ভয় করে, কে জানে ওকে ওরা চিনবে কিনা? যদি না চেনে, যদি তাড়িয়ে দেয় অপমান করে?

না, যেতে হবে খোকন বলেছে, "যাবে কাকু? খোকন তার শিশু দেবতা, খোকন তার তপ—জপ আরাধনা, যাবে মহেন্দ্র শ্যামবাজারে ওর পিতৃবন্ধু উমেশ ভট্টাচার্যের বাড়ি, ওর অনেক আশা রয়েছে সেখানে।

মহেন্দ্র উঠে পড়ে, স্নানাদি করা দরকার, বেশটা যা হয়েছে, যেন পথের হন্যে কুকুর। মহেন্দ্র কাছের ঘাটে নামলো গঙ্গাস্নান করতে। ও হরি স্নান করবে কি করে? ওর আর কাপড় নেই, গামছা আছে আর আছে একখানা লুঙ্গি, অতএব মহেন্দ্র স্নান করে লুঙ্গি পরে কাপড়খানা ওখানেই শুকিয়ে নিল। এখন কিছু খেতে হবে। আনা আষ্টেক পয়সা ওর কাছে এখনো। কিন্তু কলকাতা শহরে কি অত কম পয়সায় খাওয়া হয়? সাহস করে মহেন্দ্র কোন দোকানে ঢুকতে পারছে না, যদি বেশি পয়সা খেয়ে ফেলে? কিন্তু দুরন্ত ক্ষুধা পেয়েছে, আর বেলাও তো হয়েছে অনেকটা! মহেন্দ্র ভাবতে ভাবতে হাঁটে অনেক দূর। একটা পার্কে সার্বজনীন দুর্গোৎসব চলছে, কি বিরাট প্যান্ডেল, কী চমৎকার সাজসজ্জা, কী অপরূপ প্রতীমা, মহেন্দ্র দেখতে লাগলো। কত টাকা খরচ করে এতবড় ব্যাপার করা হয়েছে। দশ হাজার. পনের হাজার, বিশ হাজার? হয়তো আরো বেশি। কত কাঙ্গালি ভোজন হবে, চিড়ে লা, দুই লাইন করে বসেছে সব, মহেন্দ্রকে একজন কর্তৃপক্ষগোছের লোক ঠেলে বললো, বসে যাও, বসে যাও সব—

বসে গেল মহেন্দ্র লাইনের এক জায়গায়। নিজেকে দেখলো, হ্যাঁ ভিক্ষুকের চেয়ে ভালো চেহারা ওর নয় এখন আর, যদিও ওর চেহারা সত্যি ভালো। একমুখ দাঁড়ি,

চুল রুক্ষ, তারপর গঙ্গার মেটে জলে আলুথালু গায়ের রং খড়ি মাখা হয়ে গেছে, ধুতী অত্যন্ত ময়লা, কামিজের পিঠখানা ছেঁড়া। এ অবস্থায় কে তাকে ভদ্র বলবে? কিন্তু ভদ্রলোক নিজে ঠেলে বসিয়ে না দিলে কিছুতেই ও লাইনে বসতে পারতো না। বসে কিন্তু ভালোই হলো খাবার পয়সা বেঁচে গেল।

বেশ খেল মহেন্দ্র, পুরো পেট খেল, কাঙালীদের সঙ্গে খেতে খেতে ও ভুলেই গেল যে ও মহেন্দ্র মুখুয্যে, ভদ্র পরিবারের সন্তান আর এখানে এসেছে রোজগারের চেষ্টায়, বরং মনে হচ্ছিল, ও এদেরই সমগোত্রীয়, এই অন্ধ, কুষ্ট ব্যাধিগ্রস্থ অশ্লীলভাষী কথক ভিখারীদের একজন। খাওয়া শেষ হলে কিন্তু মহেন্দ্রের মানসপটে জেগে উঠলো। আত্মগ্লানি, এতোটা দীনতা স্বীকার করার কোন দরকার ছিল না, একবারে ভিকারী হলেও পারতো। ওর গামছার সঙ্গে লুঙ্গিটা আর দু'খানা পুঁথি উপন্যাস নয়, ঠিক দর্শন শাস্ত্র। ওদের প্রাচীন পরিবারের কে কবে টোল খুলেছিলেন, অন্ন এবং বিদ্যাদান একসঙ্গে করতেন।

পুঁথি এখনও জমা আছে। এই দুইখান মহেন্দ্র তার মধ্যে থেকে বেঁছে এনেছে, যদি কেউ কেনে তো বিক্রি করবে। ও শুনেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়াম তৈরি করেছে স্যার আশুতোষের নামে। সেখানে পুঁথি দু'টো বিক্রি করার চেষ্টা করবে মহেন্দ্র, অতএব ও এখনও নিঃস্ব নয়। কিন্তু কে জানে, পুঁথি ওরা কেনে কি না।

কয়েক বছর আগের কথা, গ্রামের স্কুলে ম্যাট্রিক পাস করেছে মহেন্দ্র, দাদা তখনও রোজগার করতেন এবং কিছু জমিজমাও ছিল ওদের। তিনি মহেন্দ্রকে পাঁচক্রোশ দূরের হোতমপুর কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এলেন, মহেন্দ্র আই. এ. পড়বে। কিন্তু বিধাতা যদি বিরূপ হন তো, মানুষ কতটুকু কি করতে পারেন। অকস্মাৎ দাদার হলো বসন্ত। সেই অসুখে চোখ দু'টি তার নষ্ট হয়ে গেল, এবং তারপরই হলো আরও কি কঠিন ব্যাধি চিকিৎসা করতে যা কিছু ছিল সব বেরিয়ে গেল, রইল যা তা অতি সামান্য। বই কেনা হয় না, কলেজের মাইনে দেওয়া হয় না, বোডিং—এর খরচ জোটে না। নিরুপায় হয়ে মহেন্দ্র একদিন সন্ধ্যাবেলা কলেজ হোষ্টেল ত্যাগ করে বাড়ি ফিরলো। খোকন তখন মাত্র এক বছরের। তারপর এই ক'বছর ধরে রোজগারের চেষ্টায় ফিরছে মহেন্দ্র, নানা কাজের সন্ধান কিন্তু বিধি প্রতিকুল। মহেন্দ্র কিছুই করে উঠতে পারল না। ওদের পিতৃদেব ক্ষেত্রনাথ ছিলেন পশ্চিমের এক রাজসভায় সুর শিল্পী এবং কুমারদের সঙ্গীত শিক্ষক? দেশীয় রাজা এবং রাজার স্নেহ ভাজন ছিলেন বলে রোজগার তিনি ভালোই করতেন এবং পৈতৃক বিষয় আর পূজা উৎসব ভালোই চালাতেন। তারই বন্ধু এই উমেশবাবু কলকাতায়, মহেন্দ্র যাবে বলে বেরিয়েছে, ওর রাজ্যের বনবিভাগ থেকেই কাঠের কারবার করে উমেশবাবু নাকি একজন মস্ত ধনী, দাদা দেবেন্দ্র তাঁকে দেখেছেন, মহেন্দ্র কখনো দেখেনি। মহেন্দ্রর ছোট বেলাতেই পিতৃ বিয়োগ হয়, দেবেন্দ্রের বয়স তখন আঠারো তিনিই মহেন্দ্রকে মানুষ করেছেন কিন্তু বাইরে আয় না থাকায় বিষয় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে দেবেন্দ্রের অসুখে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল।

দাদা দেবেন্দ্র—উমেশবাবুকে চেনেন, কিন্তু তিনি এখন অন্ধ, তাই মহেন্দ্র একদিন বলতে শুনেছে উমেশ কাকা বাবার কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন। এখন তিনি মস্ত ধনী, তাঁর কাছে একবার গেলে হয় না। যদি কোনো চাকরির ব্যবস্থা হয়।

ধনীদের কি অত মনে থাকে মহীন। দাদা বলেছিলেন উত্তরে।

—তবু একবার দেখা উচিত।

—বেশ, যাবি! খুব আগ্রহের সঙ্গে তিনি কথাটা বলেননি।

অতঃপর মহীন বলেছিল খোকনকে, মহীন যেমন তার কাকা, তেমনি তারও এক কাকা আছেন কলকাতায়, সেখানে মহীন যাবে আর সেই উপলক্ষ করেই মহীন বেরিয়েছে। কিন্তু এখন যেন আর উৎসাহ পাচ্ছে না মহীন। বড় লোকের বাড়ি, কে জানে কি বলেন তারা। হয়তো ঢুকতেই পারবে না মহেন্দ্র। কিন্তু খোকনকে যে মানুষ করতেই হবে। না, থামলে চলবে না, মহেন্দ্র যাবেই। উঠে পড়লো। শ্যামবাজারের

পথ, ট্রাম চলেছে, কিন্তু অনর্থক পয়সা খরচ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। পূজার—বাজার সাজানো দোকান আর নানান পোষাকের মানুষ দেখতে দেখতে চলেছে মহেন্দ্র। পথে একটা বাচ্চা ছেলে, খোকন নাকি। চমকে উঠেছিল মহেন্দ্র। কিন্তু—না খোকন এত পোষাক পাবে কোথায়। মহেন্দ্র ছেলেটাকে আর দেখলো না ভালো করে। ঠনঠনের কালীতলায় প্রণাম করল, চাকরি যেন একটা জোটে। তার খোকনের জুতো, জামা, কাপড় যেন সে আসছে বছর কিনতে পারে। মহেন্দ্র জোরে হাঁটতে লাগলো।

অনেকখানি রাস্তা, অপরাহ্ন বেলা, পথের ভিড় কিন্তু মহেন্দ্র আর কোথাও থামলো না। একেবারে বাগবাজারের মোড়ে এসে দাঁড়ালো, হ্যাঁ এইখানে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে ২৪ নম্বর কাঁঠালপুর লেনটা কোথায়। এক দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলো মহেন্দ্র। "আগে যান" বলে দোকানী নিজের কাজে মন দিল কলকাতার দস্তুর এই রকম, বলবেনা যে, জানি না মশাই। মহেন্দ্র অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করলো। লোকটি ভদ্র—তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন সোজা গিয়ে বাঁ দিকে মোড় ফিরবেন—তারপর প্রথম গলিটাই কাঁঠালপুর লেন। এই মোড়ের প্রকান্ড বাড়িটাই বোধ হয় চব্বিশ নম্বর। মহেন্দ্র নমস্কার করে চলতে লাগলো।

চেহারাটা যা হয়েছে, চেনা যায় না, কিন্তু কিছুই করবার নাই। না আছে কাপড় বা আয়না চিরুনী। মোটা ধুতিটা হাঁটুর উপর কুঁকড়ে উঠেছে। মহেন্দ্র টেনে নামালো। মাথার চুল যথাসাধ্য বাগিয়ে নিল একটা রাস্তার কলের জল ছিটিয়ে গামছা পুঁটলিটাও একটু চৌকস করে বেঁধে নিল। তবুও ভদ্র বললো না মহেন্দ্র। দুর চাই। চলো—যা হয় হবে। মহেন্দ্র অনাসক্তবৎ চলতে লাগলো, যেন দারওয়ান গলাধাক্কা দিলেও সে অপমান বোধ করবে না, নিঃশব্দে ফিরে আসবে।

কাঁঠালপুর লেন মোড়েই মস্ত বাড়িটা চব্বিশ নম্বর। গেটে তিনজন দারওয়ান। তারপর বাগান, তার ওপারে তিনতলা বাড়ি, যেন ছবি একখানা। বাড়ির দক্ষিণ দিকে খোলা লেন—সেখানে জাল খাটিয়ে কয়েকজন যুবক যুবতী টেনিস খেলছে। দেখতে পাচ্ছে মহেন্দ্র।

এই বাড়িটাই তো। মহেন্দ্র নিজের মনেই প্রশ্ন করলো, হ্যাঁ নেমপ্লেট রয়েছে ইউ সি, ভট্টাচার্য—টিম্বার মার্চেন্ট এন্ড কন্ট্রাক্টর। ঢুকবে না, মহেন্দ্র এক মিনিট ভাবলো। কিন্তু ফিরলে চলবে না। মহেন্দ্র সটান গেটের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দারওয়ানরা ওকে আটকাবে না তো? না কেউ কিছু বলবো না— হয়তো বহু লোক এমন যায় আসে বলে কেউ ওকে বাধা দিল না। বাগান পার হয়ে মহেন্দ্র বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ভেতরে হলঘর দেখা যাচ্ছে, সেখানে চারজন লোক, একজন ইজিচেয়ারে। ইনিই বোধ হয় উমেশবাবু। মহেন্দ্র আন্দাজ করছে বাইরে দাঁড়িয়ে। একটা চাকর ওকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে গেল। গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ানো মোটর থেকে এজন ড্রাইভার উঁকি দিয়ে দেখলো। একটা মস্তবড় কুকুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওর কাপড় শুঁকছে, এইবার হয়তো ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করবে।

কিন্তু কুকুরটা তাড়া করবার পূর্বেই ইজি চেয়ারস্থ বৃদ্ধের নজর পড়লো দরজার দিকে। মাথাটা তুলে তিনি বললেন—

—কে? কি চান?

—আজ্ঞে, আমি— বলতে বলতে সেই দামী কার্পেট পাতা মেঝেতে ধুলো মলিন পায়ই ঢুকে পড়লো মহেন্দ্র এবং ভুমিষ্ঠ হয়ে তার পদ প্রণাম করলো গিয়ে, তারপর বললো—আমি চন্ডীপুর থেকে আসছি—ক্ষেত্রনাথ মুখুর্যের ছেলে আমি।

অ্যাঁ। বলে বৃদ্ধ যেন চমকে চেয়ার ছেড়ে খাড়া হয়ে গেলেন, তারপর মহেন্দ্রের চিবুক ধরে বললেন এসো বাবা, এসো, মা ভাল আছেন।

মা গঙ্গালাভ করেছেন বছর দশেক হলো।

—ওহো—দাদা, দেবেন্দ্র।

হ্যাঁ দাদা—বসন্ত হয়ে দাদা অন্ধ হয়ে গেছেন।

—অন্ধ। বলে বৃদ্ধ গভীর বেদনার্তভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মহেন্দ্রের মুখ পানে।

মহেন্দ্র আশা করেনি, এতোটা স্নেহ এই ধনীর প্রাসাদে, একটু পরে বৃদ্ধ আবার বললেন— সবই ভগবানের ইচ্ছা। বাড়িতে আর কে আছো তাহলে?

দাদা, বৌদি—আর একটা খোকন, বছর সাতেকের। বস, বস, এই চেয়ারটায় এইযে এইখানে বলে একবার নিজের ডান দিকে বড় চেয়ারখানা নির্দেশ করে দিলেন তিনি। অন্য বন্ধুগণ এতক্ষণ উপদ্রবটাকে ঘৃণার চোখে দেখছিলেন, ভেবেছিলেন চাকর বাকর বা বড় জোর চাকুরির উমেদার হবে, কিন্তু এখন বুঝলেন এ ছোকরা এখন যাবে না।

কাজেই ওদের একজন গাত্রোত্থান করে বললেন আমার একটু কাজ রয়েছে স্যার—আজ তবে উঠি।

—ও উঠবে। আচ্ছা। এই ছেলেটি আমার বাল্যবন্ধু ক্ষেত্রের ছেলে। অনেক বার আমি ক্ষেত্রনাথের কথা আপনাদের বলেছি, সেই ক্ষেত্রনাথ।

তিনজন উঠে গেলেন। শেষের লোকটার হয়তো কিছু কথা ছিল, তখনো রইলেন। বাইরে টেনিস লনে যারা খেলা করছিল, তারা অকস্মাৎ হৈ চৈ করে বারান্দায় উঠে এলো— মহেন্দ্র দেখলো তাদের। দু'টি মেয়ে, চারজন পুরুষ। ওরা এবার বারান্দায় বেতের চেয়াগুলোতে বসে চা খাবে, তার আয়োজন চলছে। আকাশে মেঘ ছিল, বৃষ্টি পড়ছে তাই ওরা বারান্দায় এলো।

যে ভদ্রলোকটি এতক্ষণ বসেছিলেন তিনি এবার ধীরে ধীরে বললেন লাখ খানেক টাকাতেই হয়ে যেতে পারে ওটা। আপনি নিজে একবার দেখুন, প্রকাণ্ড বাগান বাড়ি প্রায় দেড়শ বিঘে জমি তবে একটু দূরে নইলে ওর দাম তিন লাখের কম হতো না।

—আচ্ছা আমি ভেবে দেখবো, আজ আপনি যান, আজ আর সময় হবে না, বলে উমেশবাবু মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন,—হাত মুখ ধোও বাবা, চা খাবে। ওরে কে আছিস, এদিকে আয়।

একটা চাকর এসে দাঁড়ালো। এই চাকরটাই কিছুক্ষণ আগে মহেন্দ্রকে দরজায় দেখে গিয়েছিল? উমেশবাবু বললেন—একে পাশের বাথরুমটা দেখিয়ে দে আর তোয়ালে সাবান এনে দে।

চাকরটা এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে চলে গেল। সে চাহনি এমনি অবজ্ঞাসূচক যে মহেন্দ্রের মনে হলো এখনি উঠে যাবে এখান থেকে। কিন্তু বাড়ির মালিকের সেই কোমল দৃষ্টি ওর সর্বাঙ্গে আপতিত রয়েছে। মহেন্দ্র স্থির হলো। ঠিক সেই সময় ঢুকল এক যুবক।

—এই যে অতীন, বৃদ্ধ বললেন—এই আমার বন্ধু ক্ষেত্রের ছোট ছেলে। এই মাত্র এলো দেশ থেকে।

মহেন্দ্র উঠে প্রণাম করতে যাবে, কিন্তু অতীন্দ্র নামধারী যুবকটির দৃষ্টি তার দিকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র বুঝতে পারলো উনি প্রণামটা পছন্দ করবেন না। সে হাত তুললো কিন্তু অতীন তার পানে এক নিমেষ দৃষ্টিপাত করেই বললো, ও আচ্ছা—বাণ কোম্পানীর কাজটা তাহলে ধরছি বাবা। এক লক্ষ বিশ হাজার টাকায় রফা হলো বলেই বগলের ফাইলটা বৃদ্ধের সামনে ফেলে এক মিনিট কি একটা কাগজ দেখলো, তারপর সটান গিয়ে ঢুকলো হল ঘরের পাশের একটি ঘরে যার খোলা দরজার ফাঁকে মহেন্দ্র দেখতে পাচ্ছিল এক বব করা মেমসাহেব খটখট টাইপ করে চলেছে। ওটা হয়তো অফিস ঘর। মহেন্দ্র ভাবতে লাগলো। এই নিদারুণ ধনলোভী মানুষগুলোর কাছে সে কেন এসেছে, কি সে এখানে পাবে। আপনার দীন বেশ তাকে ক্রমাগত কুণ্ঠিত করতে করতে প্রায় চেয়ারের সাথে মিলিয়ে এনছে কিন্তু উমেশবাবুর স্নেহদৃষ্টি তেমনি উজ্জ্বল তার সর্বাঙ্গ যেন প্লাবিত করে বয়ে যাচ্ছে।

—যতীন, বৃদ্ধ ডাকলেন জোরে। বারান্দায় চা পানরত একজন সুন্দর বলিষ্ঠকায় যুবক উঠে আসতে বললো—

ডাকছেন বাবা।

হ্যাঁ শোন, এই আমার বন্ধুর ছেলে চণ্ডীপুর থেকে এসেছে, এইমাত্র এল। ও হাঁ,

যতীন তাকিয়ে দেখলো মহেন্দ্রকে একবার, তারপর আস্তে বললো, বেশ তো, বসুক। কুমার নৃপেন্দনারায়ণ এসেছেন বাবা, আমি তাঁকে চা টা খাইয়ে নিই। তারপর ওর সঙ্গে আলাপ করবো। নাম কি তোমার? শেষের প্রশ্নটা মহেন্দ্রকে।

—মহেন্দ্র অতি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল মহেন্দ্র।

আচ্ছা বস বলেই যতীন চলে গেল ব্যস্ত ভাবে।

তোয়ালে আর সাবান আনতে গেছে যে চাকরটা সে এখনও ফিরলো না, হয়তো ভুলেই গেছে মহেন্দ্রের কথা। বড় লোকের বাড়ির চাকর, কে আর মহেন্দ্রের মত অতিথিকে পছন্দ করে।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজলো ঢং করে। ঠিক সেই সময় সুন্দর টেডি পরিহিত জনৈক যুবক আর তাঁর সঙ্গে দু'টি মেয়ে এসে ঢুকলো বারান্দা থেকে ঘরে। যুবক বললো—

শরীর ভালো আছে তো জ্যাঠামশায়? তখন লোক ছিল তাই দেখা করতে পারি নি।

—হ্যাঁ ভালো আছি। রাজবাহাদুর দার্জিলিং থেকে ফিরছেন নাকি?

'না— বাবা নভেম্বরে ফিরবেন আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম।

বেশ, চা—টা খেলে বাবা? খেলা হলো তোমাদের?

আজ্ঞে হ্যাঁ এবার যাব। বলে কুমার একচোখে মহেন্দ্রকে দেখলো।

বৃদ্ধ বললেন, ও আমার বন্ধুর ছেলে কাজকর্মের সন্ধানে এসেছে!

ও, তাই নাকি? পড়াশুনা করেছো কিছু? কুমার প্রশ্ন করলো, যেন কাজ সে দিতে পারে এক্ষুনি। বৃদ্ধ তাকালেন মহেন্দ্রের পানে। মহেন্দ্র দুর্বল কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললো—

পড়াশুনা বিশেষ কিছু করতে পারিনি, ম্যাট্রিক পাশ করার পরই দাদার অসুখ তারপর দুঃখে দৈন্যে এই কটা বছর কাটছে।

ম্যাট্রিক! বলে কুমার যেন আতকে উঠলো, ওতে কি চাকুরী জুটবে?

আচ্ছা দেখা যাবে, বলে তিনি যেমন কিছুটা বিদ্রুপ মাখা মৃদু হেসে চলে যাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় বৃদ্ধের পিছনের ঘরটায় মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হয়ে উঠল মধুর কণ্ঠে।

কে যেন সন্ধ্যাদ্বীপ জ্বালছে।

এ ঘরের সবকটি প্রাণী নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কুমার বাহাদুরও দাঁড়িয়ে গেল, বৃদ্ধের যেন যৌবন ফিরে এসেছে অকস্মাৎ সোজা হয়ে ডাকলেন—মাধু মা। যাই বাবা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এক অষ্টাদশী তরুণী, ডান হাতে ধুপদানী, বাঁ হাতে প্রদীপ। গৈরিক বর্ণের তনুদেহ দিয়ে জ্যোতিরেখা যেন উদ্ভাসিত হচ্ছে। দীর্ঘায়িত চোখে অবর্ণনীয় এক কোমলাভ। বৃদ্ধ বললেন, তোর বাবাকে টাইফয়েডের সময় বাঁচিয়ে ছিল যে ক্ষেত্র, তারই ছেলে। দীপ হাতে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটি, আধ মিনিট দেখলো মহেন্দ্রকে, তারপর বলল পায়ে জুতো নেই কেন?

কিনবার পয়সা নেই। মহেন্দ্র মাথা নীচু করে জবাব দিল।

—জামাকাপড় অত নোংরা।

—ওই একই কারণে।

—তা অত হেটমুণ্ড হবার কি হয়েছে। দুনিয়ার সবাই বড়লোক হয় না। উঠুন আসুন আমার সঙ্গে বলে ধুপদানী আর দীপ নিয়ে সে এগুলো।

—যাও বাবা। বললেন বৃদ্ধ, তারপর মেয়েকে বললেন ও পাড়াগাঁয়ের ছেলে মা, দেখিস কেউ যেন কিছু না বলে।

—তোমার কিছু ভাবনা নাই বাবা—আমি এক্ষুনি ওকে ঘষে মেজে হীরের মতো ধারালো করে দেব, বলে সঞ্চায়িনী লতার মত সে এগিয়ে যাচ্ছে, মহেন্দ্রও উঠলো, পিছনে চললো। মেয়েটিও কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেছে। সে গামছার পুটলীটা পড়ে রইল ওখানেই। ভুলে গেছে নিয়ে যেতে। বৃদ্ধ সেটা সযত্নে তুলে নিজের চেয়ারের মাথায় রাখলেন, বললেন ওরে রামু, এইটা দিয়ে আয় তো—

কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণের চোখ দু'টো অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য পরক্ষণেই শান্ত সহাস্য কণ্ঠে বললেন—

একেবারে হীরকের মতো ধারালো হয়ে যাবে ওই পাড়াগাঁয়ের ভুত।

ওর কথা ওই রকম বললো। ওখানে দাঁড়ানো একটি মেয়ে সম্ভবত কুমারের বোন। বৃদ্ধের মেঝ ছেলে যতীন এতক্ষণে বললো, বড়দার অফিসেই একটা কাজে ওকে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে বাবা, আপনি ভাববেন না।

আমারই তো একটা লোকের দরকার। কুমার বললো, অবিশ্যি কাজটা তেমন ভাল কিছু নয় বাজার সরকার।

বৃদ্ধ মুখ তুলে চাইলেন, বললেন, এসেছে দু'দিন থাক, পরে দেখা যাবে। অন্য কেউ আর কিছু বলবার পূর্বেই বৃদ্ধ বেরিয়ে গেলেন বাগানের দিকে।

মাধুরীর পেছনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো মহেন্দ্র। সাদা মার্বেলের মেঝে ওর খালি পা পিছলে যাচ্ছে। চকচক করছে দেয়াল, তাতে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলো গলে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—মহেন্দ্রের আয়ত চোখ জলভরা হয়ে গেল ঘরের আত্যুজ্জ্বল আলোধার দিকে তাকিয়ে। কামরা সাজানো, গোছানো যেন ইন্দ্রভবন' কত আসন, কুশন আসবাব, চেনে না, মহেন্দ্র।'

ওইটা বাথরুম ওখানে গিয়ে সাবান দিয়ে গা ধোন তেল মাখুন,

আয়না চিরুণী সব আছে আমি আসছি বলে চলে যাচ্ছে কিন্তু. মহেন্দ্র ওই কোনায় মেহগিনি কাঠের একটা চকচকে দরজা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না কোথায় বাথরুম কেমনে কি করতে হয় সেখানে জানে না। মাধুরী মুখ দেখেই বুঝতে পারলো।

এই আসুন, দেখিয়ে দিই বলে কোণের দরজায় হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে টেনে খুললো ভিতরের কামোড ঝাজরী জল খুলবার প্লাগ সব এক এক করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল ওকে, তারপর বললো—

এই দরজাটা আপনি বন্ধ করে স্নান করুন, আমি এসে ডাকলে খুলবেন। স্নানাগারে সে দেখেনি কল্পনাতেও না আর এমন মেয়েও কি দেখেছে? কি পছন্দ সাবলীল অথচ কি সংযত। কিন্তু সংযমটা যেন একটু কম ওর, মহেন্দ্রের পল্লী কন্যা দেখা অভ্যস্ত চোখে কেমন যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হলো। কিন্তু এটা তো পল্লী নয় শহর।

স্নান করছে আর ভাবছে মহেন্দ্র ক'দিন থাকা যাবে। বৃদ্ধ এবং এই মেয়েটি ছাড়া আর কারও ব্যবহার তো প্রসন্ন মনে হলো না। এ বাড়িতে কি মহেন্দ্র কিছু আশা করতে পারে? কিন্তু মহেন্দ্র ভাগ্যবাদী, ভাগ্যকেই সে জীবন নিয়ন্ত্রণের ভার দিয়ে স্নান শেষ করলো।

—হোল আপনার। বাইরে থেকে ডাক দিল মাধুরী।

হ্যাঁ সাদা তোয়ালেটা পরে মহেন্দ্র বেরিয়ে এল। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ গায়ের চামড়ায় সদ্যস্নাত গা বেয়ে জলবিন্দুর নিম্ন গতি আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মৌনতা সব মিলিয়ে কেমন একটা মোহকারী পরিবেশ, মাধুরী এক নিমেষ দেখলো। মুখে একটু হাসি ফুটলো, তারপর হেট হয়ে এক জোড়া চটি নামিয়ে দিয়ে বললো—

চটিটা পায়ে দিন, তারপর কাপড় ছাড়ুন এই কাপড় আন্ডারওয়াড়, গেঞ্জী আর চাদর।

এত দামী কাপড়। মহেন্দ্র জরী পাড় ধুতীখানা হাতে নিতে নিতে বললো।

হ্যাঁ—এখানকার আসবাব সব দামী হয়—মাধুরীর উত্তর খুব গম্ভীর।

কিন্তু আমি আসবাব নই।

না আপনি একজিবিট। হাসলো না মেয়েটা একটুও—তেমনি গম্ভীর ওর মুখ।

কাপড় নিয়ে মহেন্দ্র আবার বাথরুমে ঢুকে আন্ডাওয়ার, ধুতী আর গেঞ্জী পরে এল, এসে দেখলো মাধুরী নাই। ও যেন কিছুটা স্বস্তিবোধ করছে মাধুরীকে না দেখে, ওকে একজিবিট বলে বিদ্রুপ করলো নাকি মেয়েটা। এ বাড়িরও সবাই কি সমান অহঙ্কারী, শুধু বৃদ্ধ ছাড়া। মহেন্দ্র চুল আঁচড়াবার ফাঁকে ভাবতে লাগলো, এই বিরাট বাড়িখানা সত্যি একজিবিশন আর সে সেখানে একজিবিট, জু, বললে আরও ভালো হতো, সেখানে সে একটা জানোয়ার বনে যেত। কিন্তু এবারে সে কি করবে। দীর্ঘ দর্পনে

প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হয়ে ভাবছে মহেন্দ্র। সে দেখতে তো মন্দ নয়। চেহারাটা ভালোই, একটা একজিবিট হবে ও এখানে কিন্তু বিদ্যা। সেটা যে ওর কিছু মাত্র নেই। বুদ্ধি ওর খুবই ছিল, ক্লাসে প্রথম দ্বিতীয়ই হোত বরাবর, বিধি বাম, নইলে বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙ্গিয়ে যাবার যোগ্যতা ওর কম ছিল না।

পড়ার কথা মনে হলো, যাঃ ফেলে এসেছে পুটলীটা নিচের ঘরেই ফেলেছে। এমন ভোলা মন মহেন্দ্রের। নিজের উপর বিরক্ত হয়ে মহেন্দ্র ঘরের বাইরে বারান্দায় এল, শুনতে পেল রেডিওতে গান চলছে মালকোশ।

দাঁড়িয়ে গেল মহেন্দ্র ওখানেই। চমৎকার আলাপ করছেন গায়ক। বহুদিন শোনে নাই, 'বাজনা' শেখার সখ আর মিটল না মহেন্দ্রের অথচ ওদের বাড়িতে গানের বিশেষ চর্চা ছিল! আজও তার সাক্ষীস্বরূপ মৃদংগ, সেতার তানপুরা ভাঙ্গা অবস্থায় একটা ঘরে পড়ে আছে।

খাঁটি রাগ—রাগিনী আজকাল প্রায় শোনা যায় না—ইনি গাইছেন কে ইনি নমস্যা শিল্পী। মহেন্দ্র দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো, যন্ত্রটা কোথায় আছে জানা যাচ্ছে না শুধু সুর ভেসে আসছে, আঃ চমৎকার।

—কি চমৎকার। ঐ আলাপটা?

হ্যাঁ মহেন্দ্র জবাব দিল।

—একদম বাজে। আসুন এ দিকে।

—কেন। মহেন্দ্র যেতে যেতে বললো। বাজে কেন? মালকোশ রাগ—

—থাক। ও শুনলে আমার মাথা ধরে—ওটা খাঁটি নয়, নকল রেকর্ড গলা রেকর্ড, তার থেকে রেডিওতে, সেখান থেকে আপনার কানে। তিন নকলে আসল আর থাকে কোথায় মশাই। এই যে এই দিকে মার কাছে চলুন।

—আমার বেশ ভাল লাগলো আলাপটা মহেন্দ্র অতি আস্তে বললো।

আপনার পছন্দটা অত্যন্ত দীন বলতে বলতে ফিরে দাঁড়ালো মাধুরী। বললো, দেখুন, আপনি নিজে দরিদ্র হতে পারেন, আপনার পছন্দকে দরিদ্র করবেন না, চৌরাস্তার মোড়ের গান ওটা, রেকর্ড আর রেডিওর আমি ভালো ওস্তাদ আনিয়ে আপনাকে মালকোশ শুনিয়ে দেব আসুন।

মহেন্দ্র যেন এতটুকু হয়ে গেল, কোথায় নিয়ে যাবে, কি আবার বলবে। কে জানে। ভাল জামা—কাপড় পরায় মহেন্দ্রের কুণ্ঠা কিছুটা কমেছে এখন তবু বিদ্যার স্বল্পতা তাকে যেন আড়ষ্ট করেছিল। তারপর এই তীক্ষ্ণধী তরুণী যার প্রতি কথায় বিদ্যুতের কণা, মহেন্দ্র নিরুপায়ের মত চলল। খানিকটা সিঁড়ি নেমে একটা বড় ঘরে তার লাগাও একটা ছোট কুঠরী। আগাগোড়া মার্বেল বাধানো—দেওয়ালে নানা দেবদেবীর ছবি, মেঝেতে সুন্দর আসনের উপর একজন স্থূলাঙ্গী বৃদ্ধা তার পাশেই একজন অবগুণ্ঠীতা বধু। বধুটি অত্যন্ত সুন্দরী বয়স ত্রিশের কম। বোধ হয় বড় বৌ। মাধুরীর পিছনে মহেন্দ্র এল।

—মাঃ এই মহীনদা বলে পরিচয়টা সংক্ষেপে সারলো মাধুরী, আর ঐ বড়বৌদি,

—এসো বাবা, বলে হাত বাড়ালেন বৃদ্ধা। মহেন্দ্র ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রমাণ করলো তাঁকে তারপর বড়বৌদি ঘোমটা কমিয়ে দিয়ে বললো। খুব ছেলেমানুষ। আমি ভেবেছিলাম কতই বা না বড় হবে।

ইনি বড়দা নন মাধুরী বললো বড়দা বাড়িতে আছেন তিনি দাদার থেকে বড় বুঝলে বৌদি? বড়দার নাম দেবেন্দ্রনাথ মা তুমি তো জানো।

হ্যাঁ মা জানি। এসো মহীন বলে বৃদ্ধা তাকে কাছেই বসালেন, তারপর বধুকে আদেশ করলেন জল খাবার আনতে।

মহীন এই ছোট সুন্দর ঘরখানি আর তার দেওয়ালের ফটো দেখবে কিংবা সম্মুখের মাতৃস্বরূপিণী ঐ মহিলাকে দেখবে বুঝতে পারছে না।

—এতদুঃখ পেলে বাবা, মহীন, আমাদের একটা খবরতো দিতে হয়।

—ভুল হয়েছিল কাকিমা, কষ্টভোগ মহেন্দ্র বললো।

—না মা, গরীবের অভিজত্যেবোধ—মাধুরী বললো ব্যঙ্গ করে যেন। বড় বৌ খাবার নিয়ে এল।

বসে খাওয়ালেন মহেন্দ্রকে বৃদ্ধা ছেলের মত যত্ন করে। ওর মধ্যেই সংসারের খবর জেনে নিলেন। মাধুরী কোথায় গেছে কে জানে। মহেন্দ্র অনেক স্বস্তিবোধ করছিল ওর অনুপস্থিতিতে, যেন জলন্ত অগ্নিকুণ্ডটা কাছে নাই। তার স্নিগ্ধ উত্তাপটুকু রয়েছে।

তোমার বাবাকে আমি দেখেছি মহীন, তুমি তেমন হয়েছ। চেহারায় এত মিল।

বাবাকে আমার ভালো মনে পড়ে না—মহেন্দ্র বললো।

হ্যাঁ তুমি তখন খুবই ছোঠ। তিনি যে উপকার আমাদের করেছেন বাবা। মুঙ্গেরে ওর টাইফয়েড হলো, তোমার বাবা দিন রাত্রি জেগে ওকে বাঁচালেন। সেই সময় তাকে দেখেছিলাম রুগী যায় যায় হলো, তোমার বাবা বললেন, কেঁদো না বৌমা—যমের সাধ্য নাই যে তোমার সিঁথির সিঁদুর মুছবে। আমার পরমায়ূ দিয়ে আমি ওকে বাঁচাব—ঝরঝর করে জল গড়ালো বৃদ্ধার চোখে।

তাই তো তোমার কূল উজ্জ্বল করা সন্তানেরা পায়ে জুতো নাই, আর কাপড় ময়লা দেখে নাক সিটকে পালাল—আর ঐ কুমার না কুমাণ্ড। মাধুরী অকস্মাৎ অভিভুত হয়ে বললো কথাগুলো! কন্ঠের দৃঢ়স্বর ভাষার ঝলকে যে অগ্নিবৃষ্টি ঝরছে বড়দার অন্তত এটা উচিত হয়নি মা। কি বলবি? আমি বলবো বড়দাকে।

বলবো যে, এই অকৃতজ্ঞতা উমেশ ভট্টাচার্জির বড় ছেলের উচিত হয়নি আর মেজদা ঐ কুমারটাকে এনে খারাপ অবস্থা করেছিল, ভাগ্যিস আমি সে সময় গিয়ে পড়েছিলাম। যাকগে মেজদাকে কিছু বলবো না, বড়লোকের জামাই, বিলেতে যাবে, তার কথা বাদ দাও। দেখি ছোট দা এসে কি বলে।

নারে, কেউ কিছু বলবে না ওরা ঠিকমত বুঝতে পারে নি, মহীন কত আপনার। ওর আবার বুঝবার কি আছে মা। ক্ষেত্র জ্যাঠার ছেলে এই—ই যথেষ্ট পরিচয় ওর। আবার কি বুঝবে হাতী ঘোড়া। এতকাল খবর নাও নি তার জন্যে অনুতাপ কর।

কেউ কিছু বললো না। একটু পরে মাধুরীই বলল বড় বৌদি—দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটায় মহীনদার থাকবার ব্যবস্থা করলেন বড়বৌদি, তুমি একবার দেখিয়ে দিয়ে। সব ঠিক আছে কিনা, আমি ওকে নিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে যাচ্ছি। মহীনদা গাড়ি তৈরি?

কোথায় যেতে হবে? মহীন ভয়ে ভয়ে তাকালো।

অত খবরে কাজ কি। যা বলছি চটপট এগোন। মহীন উঠে, চললো ওর পিছনে নামতে নামতে বললো—আমার গামছার পুটলীটা—

যা, আছে তো একখানা ছেড়া লুঙ্গি আর খানকতক হিজিবিজি কেতাব কি ওগুলো?

পুঁথি সেকেলের হাতে লেখা পুঁথি।

কি হবে ও দিয়ে। পড়াই তো যায় না।

পন্ডিতরা পড়বেন। বিক্রি করার জন্যে এনেছি।

আচ্ছা আমিই কিনে নিবো, দু'টোর দাম চার টাকা হয়ে রইলো।

আপনি ও দিয়ে কি করবেন? মহেন্দ্র অকস্মাৎ নির্বোধের মত প্রশ্ন করল।

আমি এই বাড়ির সবার থেকে ছোট, আমাকে আপনি বললে পর হয়ে যাবে, তুমি বলতে হয় বুঝলেন?

তাহলে আমাকেও আপনি বললে তো পর হয়ে যেতে পারি। মহেন্দ্র সাহস করে বলে ফেলল, এবার কিন্তু জবাব এল।

হ্যাঁ আপনি তো পরই, দায়ে পড়ে আত্মীয়তা করতে এসেছেন, ঠেলায় পড়ে অভাবে পড়ে, পর না হলে এমন কেউ করে নাকি?

মহেন্দ্র আর জবাব খুঁজে পাচ্ছে না, অসম্মান বোধ হচ্ছে ওর। অকস্মাৎ হাসির যেন ঝরণা বইছে। সুমিষ্ট হাসিটা থামাতেই চায় না। এক মিনিট পরে বললো মাধুরী—আমি এই বাড়ির কাউকে আপনি বলি না, সবাইকে তুমি বলি সবাই আমার আপনার। তোমাকে এই অপমানজনক কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমায় ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম যে, এখানে তুমি অত্যন্ত আপনার। সবাই তোমাকে তুমি বলবে। এ বাড়ির মালিক তোমার বাবার কাছে দেনা হয়ে আছেন। নিজেকে এত কুণ্ঠিত ভাববার

কারণ নেই, এসো তোমাকে কলকাতায় প্রতিমা বিসর্জন দেখাবো বলে গাড়ির দরজা নিজের হাতে খুলে দিল মাধুরী। মহেন্দ্র জীবনে চড়েচি এত বড় মোটরে।

বুইক গাড়ি নিঃশব্দ সঙ্করণশীল। কখন যে মাধুরী আর মহেন্দ্রকে নিয়ে বাগবাজারে পাঁচ রাস্তার মোড়ে এসে পড়লো। বোঝাই গেল না, দাঁড়ালো গাড়ি। রাজপথ আলোকাকীর্ণ শোভাযাত্রা করে প্রতিমা বিসর্জন করতে চলেছে কলকাতার বারো—মারা পুজকেরদল। কী চমৎকার প্রতিমা, কী তার সাজ—সজ্জা। কী অপরূপ ছন্দায়িত যেন দেখার বস্তু সত্যিই। মহেন্দ্র মুগ্ধ বিস্ময়ে এই মহোৎসব দেখছিল অকস্মাৎ মাধুরী বললো—

বিশ্বের মা শ্বশুর বাড়ি চলেছে তুমি আজ এলে, মহীনদা।

হ্যাঁ কেন? মহীন চমকে প্রশ্ন করলো।

আজ দিনটা ভালো কিনা, তাই বলছি। বিজয়াদশমী। হাসলো মাধুরী। মহেন্দ্র কিছু বললো না, মহেন্দ্রের গ্রাম্য মস্তিষ্কে মাধুরীর সুক্ষ্ম ব্যঞ্জন কোন রস সৃষ্টি করতে সমর্থ হল না। ওর তখন খোকনের কথা মনে পড়েছে তাকে এই উৎসব সমারোহ করে দেখাতে পারবে মহেন্দ্র কবে? এমনি বুইক গাড়িতে বসিয়ে না হোক পায়ে হেঁটে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ও কি সে তার শিশু দেবতাকে এই উৎসব দেখাতে পারবে না: অবশ্য দেখাবে।

কি ভাবছো, মহীনদা?

খোকনটাকে মনে পড়ে গেল—বাড়িতে থাকলে কাঁধে চড়ে প্রতিমা বিসর্জন দেখতে যেত। কে জানে কে এবার তাকে নিয়ে যাবে?

যেই হোক নিয়ে যাবে তার জন্য ভাবনা কি? আসছে বছর খোকনকে এখানে এনে আমিই নিয়ে যাব কোলে চড়িয়ে। খোকন দেখতে কেমন?

আমাদের বংশের চেহারা সব প্রায় এক রকম রং ঢং আকৃতি।

ও বুদ্ধিটাও যেন তোমার মত না হয়— বলে মৃদু হাসলো মাধুরী।

না, না ওর বুদ্ধি সত্যি খুব ভালো। যদি পড়াতে পারি—

দিগ্‌গজ হয়ে উঠবে, এই তো, বেশ, পড়ানো যাবে। তার জন্যে আজ থেকে ভাবনা কেন?

আমি অভাবের জন্য পড়তে পারলাম না, ওকে পড়াতে হবেই। আমাদের বংশে ছাড়া মুর্খ কেউ নেই, দাদাও কাব্য ব্যাকরণতীর্থ চোখের অসুখ না হলে—

থাক্ থাক্ ওসব আমার জানা হয়ে গেছে— মাধুরী বাধা দিল—তোমার বিদ্যাদিগগজ হবে হবেই। আপাতত চল বাড়ুজ্যেদের প্রতিমা দেখবে খুব প্রাচীন চণ্ডীমন্ডপ ভাঙা অবস্থা, তবু দেখতে কত সুন্দর এসো। মাধুরী দরজা খুলে নামলো, মহীনও নামলো দু'জনে ঠাকুর বাড়িতে ঢুকল গিয়ে।

নবমীর দিন রওয়ানা হয়েছে মহেন্দ্র বাড়ি থেকে, খোকনই তাকে পাঠিয়েছে বলা চলে, কিন্তু কাকার যাওয়ার পর থেকে ছেলেটা আর কারও সঙ্গে কথা কয়নি রাতটা ঘুমিয়েছিল, বিজয়াদশমীর সকালেই শিউলী ফুল কুড়িয়ে রেখে খিড়কীর পুকুরটা একবার ঘুরে এলো—দু পয়সার বেলুনটা ফু দিয়ে যতদুর সম্ভব ফুলিয়ে ফাটিয়ে দিল, অপরাজিতা ফুলগুলো তুলে দু'হাতে চটকে তাল পাকালো, তারপর আর কী করা যায়?

অন্ধ বাবার কাছে বড় একটা যায় না সে না ডাকলে প্রায় যায় না! আবার পুকুরঘাটে এসে দেখতে লাগলো। পোনামাছের বাচ্চাগুলো অল্পজলে খেলা করছে এখনি ও দু'চারটে ধরতে পারে কিন্তু ধরে কি হবে? কাকু বাড়িতে নেই, ভাজা মাছের কাটা বেছে কে ওকে খাওয়াবে? থাক্ গে। একটা ঢিল ছুড়ে মারলো ঘাটের জলে মাছগুলো ত্বরিতে সরে গেল, ঠিক সেই সময় ডাকে—খোকন। বাবা নয়, মা ডাকছে। উঠে এলো খোকন, মা ওর পানে চেয়ে বললো—

আয় জামাটা পরিয়ে দিই? পূজা দেখতে যাবি না?

না বলে খোকন সরে পড়তে চায়।

কাকু তো চার পাঁচদিন পরেই আসছে অত মন খারাপ করছিস কেন? তুই তো পাঠালি। যা ঠাকুর দেখে আয়।

না বলে উঠোনের এক কোণে শিউলী গাছটার কাছে দাঁড়ালো গিয়ে। ফুলগুলো সকালেই কুড়িয়ে রেখেছে, তার হলদে বোটাগুলি ছিঁড়তে লাগলো শুকিয়ে রাখবে। সরস্বতী পূজোর সময় বাসন্তিরঙ্গের কাপড় পড়বে। মা জানে খোকনের মনের অবস্থা, আর কিছু বললো না। একটু পরে ডাক দিল আয়, মুড়ি আর নারিকেল কোরা খাবি? না বলে খোকন নিজের কাজ করতে লাগলো। অন্ধ দেবেন্দ্র ও ঘর থেকে বললো ওকে কেন মিথ্যা ডাকাডাকি করছ, যা খুশি করে কাটাক। মহীন না ফেরা পর্যন্ত অমনি তো করবে। ওকে বল যে; কাকু লক্ষী পূজার দিন ফিরবে।

ও জানে। খোকনের মা তাকে আর কিছুই বললো না? অভাবের সংসার। আজ বিজয়াদশমী বাড়িতে বহু ব্যক্তি প্রণাম করতে আসবে। তাদের মিষ্টি মুখ করাতে হয়। অন্য মিষ্টি কিছু জোগাড় করা যাবে না, গুড় আর নারিকেল দিয়ে নাড়ু তৈরি করছে। আর যৎসামান্য মিঠাই কিনে আনা যাবে। আজকের দিনে বাড়িতে তো খালি মুখে কাউকে ফেরানো যাবে না, নিজে না খেয়েও অতিথির জন্য আয়োজন করে রাখতে হয়, খৈ কিছু ভাজা আছে, তাই দিয়ে মুড়কি তৈরি করবে। অন্য বছর খোকনের কত উৎসাহ থাকে এসব ব্যাপারে। উনুনের কাছ ছাড়া হয় না বকুনী খায় তবু। এবার কিন্তু কাছ দিয়ে ও এল না। আচ্ছা কাকাভক্ত ছেলে যাহোক? মা নিজেই একটু হাসলো?

বাইরের ঘরটায় দেবেন্দ্র বসে থাকেন। চোখ নাই, চোখ নাই তাই পড়াশুনা বন্ধ কিন্তু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতি কণ্ঠ স্বর তাই বহু লোক আসেন তার কাছে বিধান নিতে, ভগবত্ব আলোচনা করতে, সৎকথা শুনতে। বংশের একটা ছেলে পণ্ডিত হোক, এই ইচ্ছায় ওর বাবা ক্ষেত্রনাথ ওকে কাশীতে পড়িয়েছিলেন সংস্কৃত। অভাব ছিল না তাই সখ হয়েছিল। অন্ধ না হলে অর্থ ভালোই উপার্জন করতে পারতেন দেবেন্দ্র।

ইংরেজীও ভালো জানেন কিন্তু চোখ আর নাই, বিশ্ব তার কাছে অন্ধকার। এখন সম্বল ঈশ্বরের অনুধ্যান তাঁহার তপস্যা। ইচ্ছে আছে ঈশ্বরীর কথা কিছু লিখবেন। কিন্তু নিজে লিখতে অক্ষম তাই হয়ে ওঠে না? ভগবান শ্রী কৃষ্ণের মতামত শোনাবার একটা লোকও নাই, যারা আসেন বাড়িতে, তাদের কাউকেও ধরে কখনো পড়িয়ে শোনেন।

নিত্যকর্ম শেষ করে উনি বসেছিলেন তক্তপোষে, কেউ আজ আসেনি। সকলেরই তো বিজয়াদশমী, প্রতি বাড়িতে উৎসব। বড় ইচ্ছে করতে লাগলো। জগ্যমাতার সপ্তশতী স্তোত কিছু শোনেন— কিন্তু কে ওকে চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে যাবে অনেকটা দূরে বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপ সেখানেই যেতে হবে। বর্ষার গ্রাম্য পথ পঙ্কিল এবং পিচ্ছিল হয়। লাঠি ধরে তিনি একা যেতে পারবেন না কিন্তু আজ একটু চণ্ডীপাঠ শুনতে হয়। বিশেষ করে মহেন্দ্রের কল্যাণ কামনা করবার জন্যে চণ্ডীমণ্ডপে যেতে হবে ওকে। ডাকলেন—

খোকন?

উঁ যাই—

খোকন নিতান্ত নিরুপায় ভাবে খেলা ছেড়ে এসে দাঁড়ালো, বললো—

কি?

জামাটা পরে আয় তো বাবা, আমাকে একবার ঠাকুর দেখিয়ে আনবি।

আচ্ছা বলে খোকন চলে গেল। ঠাকুর দেখিয়ে আনবে, কথাটা উনি যেন বিদ্রুপ করেই বললেন অভিমান করে। অনন্ত জগতে বিধাত্রী যিনি, তাঁরই বিধানে ঐ দশভুজা রূপ দেখবার শক্তি আর নাই দেবেন্দ্রের। অন্তরে চিন্ময় মুর্তির ধ্যান ছাড়া কিছুই তিনি আর করতে পারেন না কথাটা তাই বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। খোকন জামাটা গায়ে দিয়ে এসে বললো—

কৈ লাঠিটা কোথায় বলেই কোন থেকে বাঁশের লাঠিগাছ নিয়ে বললো— এসো বাবা।

লাঠি অন্যপ্রান্ত ধরে দেবেন্দ্র উঠলেন? খোকনের অভ্যাস আছে ওকে এভাবে নিয়ে যাওয়া—অতি সাবধানে নিয়ে যায় ঈশ্বরের কৃপার দান খোকন।

বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপের বহু ভাগীদার, এই উৎসব তেমন হয় না, শুধু প্রতি অংশীদার

সগর্বে প্রচার করতে চায়, সেই যেন মালিক প্রজার। দশ পনের বছর আগে পূজার দিনে গ্রামস্থ সকলকে আহ্ববান করা হতো, কেউ অনাহুত গেলে প্রচুর আদর আপ্যায়ন পেতো। কিন্তু এখন কেউ গেলে মালিকেরা কৃপার দৃষ্টি তাকান যেন ওরা পূজা করেছেন বলেই নিতান্ত হতভাগা গ্রামবাসীরা প্রতিমা দর্শন করতে পারলো। কাছাকাছি দু'তিনখানা গ্রামে প্রতিমা পূজা নাই, তাই বিসর্জন দেখবার জন্য চারপাশের গ্রাম থেকে সন্ধ্যাবেলা বহু লোক আসে ছেলে মেয়ে পর্যন্ত। কিন্তু বাবুদের খোশখেয়াল এমনি তারা প্রতিমা বের করতে রাত বারোটা বাজান, নিরাশ হয়ে দূরের লোক ফিরে যায়। গ্রামের ছোট ছেলে মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে। বাবুরা বিজয় গর্বে বিসর্জন করে এসে খাটে শুয়ে ভাবতে থাকেন ভাগ্যি তাদের বাড়ি পূজা হয়েছিল। তাই এত লোক বিসর্জন দেখলো।

গ্রামে যার দু'পয়সা আছে সে গেলে বাবুরা খাতির করেন ভালোই, কিন্তু দেবেন্দ্রর মত নিঃস্ব ব্যক্তির সেখানে কোন সম্মান নাই, কৃপার দৃষ্টিপাতও কম হয় তার প্রতি কারণ ধন না থাকলেও বিদ্যা তার আছে এবং মাথা তিনি কোথায়ও নিচু করেন না। ছেলের সামনে দেবেন্দ্র গিয়ে দাড়ালেন। চণ্ডীমণ্ডপের বহু লোক প্রায় সকলেই অংশীদারদের পরিবার কেউ কেউ একবার তাকালেন ওর মুখের পানে। কিন্তু দেবেন্দ্র ওদের কাছ থেকে সম্মানলাভের প্রত্যাশায় যান নাই। মন্ডপের দাওয়ায় না উঠেই তিনি খোকনকে বললেন মার মূর্তির সামনেই আমাকে দাঁড় করা? খোকন ঠিক তাই করলো। ভেতরে চণ্ডীপাঠ চলছে। দু'একজন বললেন এখানে আসুন মুখুর্য্যেমশাই, আসুন দেবুদা।

থাক ভাই এখান থেকেই শুনছি। পুরোহিত তখন পড়ছিলেন—

প্রশতানাং প্রসীদ তং দেবী বিশ্ববিত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যধাসিনামীড্যে লোকাং বরদাভব।
দেবেন্দ্র ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

সুন্দর পালঙ্কে পুরু বিছানায় শুয়ে মহেন্দ্র ভাবতে লাগলো স্বপ্ন রূপকথার শোনা ব্যাপারটাই সে স্বপ্নে দেখছে। হাওড়া ব্রীজের উপর রাত যাপন, ভিক্ষুক হয়ে ভোজন স্বর্গ ছাড়া কি আর। তারপর এই বিশাল পালঙ্কে শয়ন এমন আজগুবি স্বপ্ন কম লোকেই দেখে, কিন্তু এটা কি সত্যি স্বপ্ন? নিজের হাতের আঙ্গুল কামড়ে মহেন্দ্র পরীক্ষা করলো ব্যথা বোধ হয়। বেডসুইচটা পিটে আলো জ্বালালো, ঠিক জ্বলছে। উঠে কয়েক পা পায়চারী করলো, হ্যাঁ ঠিক বলা যায় তাহলে স্বপ্ন নয়, সত্যিই সে তার পিতৃবন্ধুর বাড়ীতে রয়েছে কলকাতার প্রাসাদে।

দেওয়াল ঘড়িতে সাড়ে বারো। বাইরের রাস্তায় এখনও বিসর্জনের বাদ্য কোলাহল জানালাপথে আকাশচারী ফানুশ দু'একটি দেখা যাচ্ছে। হাউই ছুটছে, পটকার আওয়াজ আর নীচে বাগান থেকে উঠে আসছে হাসনাহেনা ফুলের মদির গন্দ। অপূর্ব আবেষ্টনী অদ্ভুত পরিবেশ।

মহেন্দ্র আবার শুলো—সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল, চোখ বুজলো ঘুমুবে এবার। খোকনকে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলো। তার শিশু দেবতার আশ্রয় নিতে চাইল, কিন্তু আশ্চর্য কিছুতেই খোকনের মুখখানা মনে পড়ছে না। হোল কি তার আজ? খোকনকে মনে পড়ে না। এমন অসম্ভব ব্যাপার তার জীবনে আর কোনদিন ঘটেছে কি? না তো। কিন্তু খোকনকে এভাবে মনে করবার চেষ্টা সে করেনি কোনদিন। হয়তো খুব বেশী প্রিয়জনকে ধ্যান করা যায় না, অনেক সময় মহেন্দ্র চিন্তা করতে লাগলো গলা জড়িয়ে বলছে একটা গল্প বল না, কাকু?

শোন এক ছিল—চমকে উঠলো মহেন্দ্র। কাকে গল্প শোনাচ্ছে সে বালিশকে ছিঃ। খোকনের অকল্যাণ হবে যে। মহেন্দ্র বালিশটা ঠেলে সরিয়ে দিল। পাশ ফিরলো তারপর অকস্মাৎ উঠে পা তলে রাখা ব্যাগখানা তুলে মেঝেতে ফেলল। মহেন্দ্র নিজের মনেই বললো—

খোনকে ছেড়ে এত ভালো বিছানায় শোয়া যাবে না—

একটা ছোট বালিশ টেনে নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লো, মহেন্দ্র ঘুমিয়ে গেল নিটোল নিবিড় একটি ঘুম স্বপ্নহীন সুষুপ্তি। মহেন্দ্র যেন জীবিত ছিল না, অকস্মাৎ খিলখিল হাসির সোনার কাঠি উজ্জ্বল জলকল্লোল হাসির ঝরণা। বালিশ থেকে মাথা তুলে মহেন্দ্র দেখলো বারান্দার পাশের একটা দরজা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে মাধুরী।

হাসিটা ওরই কিন্তু এতে হাসবার কি হয়েছে? মহেন্দ্র উঠে বসবার পূর্বেই মাধুরী বললো, যোগাভ্যাস চলছে সন্ন্যাসী ঠাকুর?

যোগাভ্যাস? না দাদা ওসব করেন। মহেন্দ্র বোকার মত জবাব দিল উঠতে উঠতে।

তুমিও করবে, দণ্ড কমণ্ডলু আমি কিনে দেব। বলে ভেতরে এল মাধুরী।

ঠাট্টা? বলে মহেন্দ্র এতক্ষণে যেন বিদ্রুপটা অনুধাবন করল।

ঠাট্টা কি? ওসব আমি করি না। যোগাভ্যাস কিছু খারাপ ব্যাপার নয়। আজ থেকে খাট পালং বিছানা তুলে কম্বল পেত দেব নাও উঠে পড়, সকাল অনেকক্ষণ হয়েছে। যোগের লক্ষণ ব্রহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ।

যোগের অনেক কিছু শিখে ফেলেছ দেখছি মহেন্দ্র এতো পরে বললো কথাটা সাহস করে। কাল থেকে এ পর্যন্ত মহেন্দ্র একতরফা শুনছে। আজ সাহস পেলে। হ্যাঁ যেটুকু শিখতে বাকী আছে, তোমার কাছে শিখে নেব। হাতমুখ ধুবে এসো দাদাদের চা হয়ে গেল।

তোমার? মহেন্দ্র যেতে যেতে প্রশ্ন করলো।

তোমার মত মেষ শাবকের ভার আমার ওপর, তখন তোমাকে খোয়াড় মুক্ত না করে আমি খাব কেমন করে? বলেই মাধুরী কম্বলখানা আর বালিশটা তুলে দিল। বাথরুমে ঢুকে মহেন্দ্র ভাবতে লাগলো স্নান হয়ে গেছে মাধুরীর ভিজে চুলগুলো পিঠ জুড়ে রয়েছে। মহেন্দ্র স্নানটা সেরে নেবে নাকি? কাপড় কোথায় আছে, কে জানে? আর থাকলেও এ বাড়ীতে মানাবেনা। কাজেই মুখ ধুয়ে মহেন্দ্র বাহিরে এল নিজেকে যথাসাধ্য ভদ্র করে নিয়েছে সে এর মধ্যেই। চুলটাও আচড়ে নিয়েছে। বেরিয়ে দেখলো একটা চাকর দাঁড়িয়ে। বললো ছোটদা ডাকছেন স্যার আসুন।

মহেন্দ্র চটি পায়ে, তার পিছনে বেরিয়ে এল? বৃদ্ধ উমেশবাবু গিন্নি আর বড়বৌ বসে আছেন চেয়ারে মাধুরীকে কোথাও দেখতে পেলেন না। বৃদ্ধ বললেন এস বাবা, কাল বেশ ঘুম হয়েছিল তো।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহেন্দ্র বললো চেয়ারে বসতে বসতে।

কম্বলে না শুলে ওর ভাল ঘুম হয় না বাবা—বলে মাধুরী কোত্থেকে এসে দাঁড়ালো—খাটে না শুয়ে মেঝেতে কম্বল পেতে শুয়েছিল আজ ওকে একটা মৃগচর্ম কিনে দিতে হবে।

সে কিরে মা। বলে বৃদ্ধা বিস্মিত হাসিমুখে তাকালেন মহেন্দ্রের পানে? সলজ্জ মহেন্দ্র বললো—

আজ্ঞে না অত ভালো বিছানায় শোয়া তো, অভ্যাস নেই। অভ্যাস করাটাও ঠিক হবে না তাই—

কৃচ্ছ সাধন করেছিলেন বললো মাধুরী বেশ তো, ঐ অশ্বত্থ গাছটার তলায় মৃগচর্ম পেতে দেবো।

বসলো মাধুরীও রুটিতে মাখন লাগিয়ে গিন্নী মা প্লেটখানা এগিয়ে দিলেন। বললেন ওসব করো না। বাবা, ব্যাটাছেলেরোজগার করবে, চিরদিন কি কেউ গরীব থাকে। তোমার এই কাকাই তখন সি, পিতে যান সামান্য সম্বল নিয়ে, তখন আমাদের অবস্থাও খুব খাটো ছিল। তোমার বাবার অবস্থা তখন আমাদের চেয়ে ভালো।

মহেন্দ্র কিছু বললো না, চুপ করে খেতে লাগলো। মাধুরী ওর চা ঠিক করে দিতে দিতে বললো ভালো করে দিনকতক খাও, শরীরটাও অল্প সারুক তারপর কম্বলে না হয় শোবে কোপীন পরবে কচুপোড়া খাবে যা খুশী করবে। মহেন্দ্র এবারেও কথা কইল না, একটু হাসলে মাত্র। উমেশবাবু বললেন কিছু টাকা আজই পাঠিয়ে দাও তোমার দাদার নামে লিখে দাও তুমি এখানেই রয়েছে ওরা যেন না ভাবে।

চাকরী বাকরি একটা কি জুটবে? অতি ক্ষীণ কণ্টে বললো মহেন্দ্র।

অত ব্যস্ত কেন, বাবা? এখানে তুমি নিজের বাড়ীতেই আছ মনে করবে। চাকরির কথা এবার আমি ভাববো এতোকাল বন্ধুর ছেলেদের খবর নিইনি এ যে আমার কতবড় অপরাধ, তা আমি বুঝেছি। মাধুমা, টাকাটা তুই নিজেই মানি অর্ডার করিয়ে দিস আর জুতোজামা কাপড় সব কিনে দিবে যা।

শীত আসছে, বাবা গরম কোর্ট শার্ট দরকার।

না না, ওসব না। আমার খোকনের সুতার গেঞ্জী রয়েছে।

মহেন্দ্র এমন আকস্মিক আর্তকণ্ঠে কথাটা বলে উঠলো যে উপস্থিত তিন জনেই ওরা করুণ এই আবহাওয়াটাকে শীত পড়তে দেরী রয়েছে, তার আগেই তোমার খোকনের জামা কাপড় তৈরী হয়ে যাবে—বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি কতবার খোকনের কথা ভেবেছ মহীনদা?

ও ছাড়া কিছুই আর ভাবী না, মাধুরী। অন্ধ দাদা খোকনের মতই বয়স থেকে আমায় মানুষ করেছেন তার কথাও ভাবি না। যোগী পুরুষ অদ্ভুত অসাধারণ মনঃশক্তি—অভাবকে তিনি অবহেলায় অগ্রাহ্য করেন বৌদি তার যোগ্য সহধর্মিণী কিন্তু আমি বড় দুর্বল—

তাই সবল হওয়ার জন্যে কাল কম্বল পেতে ছিলে? বড় বৌ বললো এতক্ষণে।

না বৌদি খোকনকে কখনো ভাল বিছানায় শোয়াতে পারিনি, ফুলের মত ছেলে, ঘুটিং বেরুনো শানে পড়ে থাকে—

ব্যাটাছেলের ঐ রকম ভাবেই মানুষ করতে হয় বললো মাধুরী। নইলে ঐ দেখো না আমার ছোড়দা ললিতা লবঙ্গলতা, একটা পালং এ আটখানা বালিশ দেড় হাত মোটা গদী আর সিল্কের চাদর না হলে ঘুমুতে পারে না।

ঠিক সেই সময় একজন সুন্দর যুবক প্রায় মহীনের সমবয়সী, এসে দাঁড়ালো কবি কবি চেহারা। লম্বা চুল, গায়ে দামী সিল্কের গেঞ্জী তবে স্বাস্থ্য খুব ভাল বলা চলে না। একখানা চেয়ারে বসতে বসতে বললো দে তোর মহীনদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে, আর এক—কাপ চাও যদি দিস।

চা দিচ্ছি কিন্তু আলাপ করিয়ে দিবে হবে কেন, তুমি কি বিলেতী না আমেরিকান? কি এমন বয়স হয়েছে যে পরের লোকের সঙ্গে ইন্‌ট্রোডিউস না করলে কথা বলতে পারবে না? লক্ষ্ণৌ ঠুংরী হয়ে যাচ্ছো ছোড়দা।

তার মানে? লক্ষ্ণৌ ঠুংরী কিরে?

সবাই হেসে উঠলো কথাটা শুনে। মাধুরী একটু গম্ভীর গলায় বললো—

নয় তো কি। তোমার লক্ষ্ণৌ এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে, সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেব তাকে চা খাওয়াতে হবে। ওস্তাদ গান শোনবার একজন সমঝদার শ্রোতা তুমি পেলে ছোড়দা, এর জন্যে।

তোমাকে ধন্যবান দেওয়া উচিত। তোমাকে কেন ধন্যাবদ দেব।

কারণ আমিই আবিষ্কার করেছি? এসো ইনট্রোডিউস করিয়ে দিই—মাল-কোশ শোনাতে হবে, তোমাদের খাঁ সাহেবকে আজ ডেকে আনবে।

ছোড়দা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এতক্ষণ কথা বলেনি মহেন্দ্রের সঙ্গে, ইংরেজী কায়দায় পরিচয় করিয়ে দেয়নি কেউ বলে নয়। নিতান্ত একজন গ্রাম্য যুবক।

কি কথা বলবে এই ভেবে সময়ক্ষেপন করেছিল। মহেন্দ্র গানের সমঝদার শুনে সাগ্রহে বললো—

গান বাজনার সাধনা করা হয় তাহলে?

আজ্ঞে না সাধন করবার সময় কোথায়? পেটের ধান্দায় ঘুরছি সব আছে সময় সুযোগ পেলে বসি এক আধবার মহেন্দ্র অলকা ক্লাবে।

না! অতি তীক্ত কণ্ঠে বললো মাধুরী। ওখানে ও যাবে না। ওখানে তোমাদের রাজাবাদশার মজলিসে আমাদের গরীবের মানায় না ওকে। আমি নিজেই গান শুনিয়ে আনবো কোথাও, নইলে বাড়ীতেই উস্তাদ ডাকবো।

কেন? ওখানে যেতে আপত্তি কি? আমার সঙ্গে যাবে রতীন শুধালো।

আপত্তি অনেক। ওরা সবে মহীনদাকে কৃপার চক্ষে দেখবে, বলবে পাড়া গাইয়া অশিক্ষিত গরীব। ওসব হতে দেব না আমি। চল মহীনদা, বাজারে যেতে হবে বলে মাধুরী উঠে পড়ল।

ভালো গায়কের সম্মান ওখানে খুব বেশী, জানিস ওকে সবাই লুফে নেবে।

ও তোমাদের মতো ভালো গায়ক নয়, নাকী সুরে প্যানপ্যানে গানও গাইতে পারে না। মাধুরী এগিয়ে বললো এসো দেরী হয়ে যাচ্ছে।

মহেন্দ্র উঠতে উঠতে ভাবতে লাগলো——প্যানপ্যানে নাকি সুরের গান সে যে পছন্দ করে না এ খবর মাধুরী জানলো কেমন করে? আশ্চর্য তো কথাটা কিন্তু খুবই সত্যি। ওদের বংশটা ওস্তাদের বংশ, বাবা ভাল গাইতে পারতেন। সম্ভবতঃ উমেশ কাকার মুখে মাধুরী সে কথা শুনে থাকবে। এখানে এসে মহেন্দ্র তো একবার তাতানা শব্দও করেনি অবশ্য রেডিওর গানটা শুনেছিল কিন্তু এতেই কি মাধুরী তার সংগীত প্রিয়তা সম্বন্ধে এত খবর জানতে পারলো। এই পরমাশ্চার্যের কথাটা চিন্তা করতে সে যাচ্ছে। ছোড়দা রতীন বললো——

আচ্ছা বাজার করে আসুন পরে আলাপ হবে।

হু বলে মহেন্দ্র মাধুরীর সঙ্গে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। বললো——

একটা অনুরোধ রাখবে মাধুরী।

অনুরোধ যখন, তখন শুনে বলা যাবে রাখবো কিনা। আদেশ হলে নিশ্চয়ই রাখতাম।

বেশ, আদেশই বললো মহেন্দ্র। খুব বেশী দামী জামা কাপড় আমার জন্যে কিনো না। আমি তো সত্যি গরীব আর অশিক্ষিতও। ভদ্রভাবে চলতে যতটুকু যা দরকার, তাই আমার জন্যে কিনে দাও। বড় মানুষী করবার আমার সখ নেই লক্ষ্মী।

ও বাড়ীটাকে আবুহোসেনী রাজত্ব বলে মনে হচ্ছে—— কেমন? আচ্ছা বোঝা যাবে।

হাসলো মাধুরী নিটোল মধুর হাসি—— তারপর বললো গম্ভীর স্বরে——

আমাদের বাড়ীতে তুমি শুধু একটা গায়ে পড়া আত্মীয়ও নও। বাবা এটা সকলকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চান আর আমিও চাই। এখানে যেভাবে থাকলে বাবার সম্মান বজায় থাকে, তাই তোমাকে করতে হবে। হ্যাঁ, কিন্তু তার জন্যে কি মানুষ দরকার?

অবশ্য দরকার, কারণ তিনি বড় মানুষ সেলফম্যান এবং মর্যাদায় অভিজাত। কলকাতায় আমাদের চার পুরুষের বসতি বনেদী বংশ আর তুমি সে বাবার পরম বন্ধুর ছেলে। তোমাকে কোনো ছুটকে রাজকুমারের বাড়ীতে বাজার সরকারী করতে বাবা নিশ্চয়ই পাঠাবেন না। তুমি কেন অত কুণ্ঠিত হোচ্ছ মহীনদা?

না কুণ্ঠ নয় মাধুরী, অনভ্যাস। নিজেকে বড় মানুষ ভাবতে আমার ভয় করে। বড় মানুষ মানে ধনী মানুষ——

হ্যাঁ, তা বুঝেছি। বেশ অন্যদিকে বড় মানুষ হও—— বিদ্যায়, জ্ঞানে মানুষত্বেও সেটাই আমি হতে চাই, বলে মহেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললো। আমাকে অতবড় ঘরে পালঙ্কে না রেখে নীচের তলায় একটা ছোট ঘরে তুমি একখানা তক্তপোষে রাখলে আমি খুশিই হই মাধুরী।

না, আমি খুশী হব না। তার থেকে বরং একটা কাজকর্ম যোগাড় করে তুমি এ বাড়ী থেকে চলে যাবে। যেখানে ইচ্ছে থাকবে গিয়ে, কিন্তু এখানে যতক্ষণ ততক্ষণ বড় লোকের ছেলের মতই থাকতে হবে অন্ততঃ আমাদের সাধারণ ভদ্রলোকের ছেলের মতো। দীনভাব আমি ভালবাসি না।

কিন্তু আমি দীন——

না। মাধুরী তীব্র প্রতিবাদ জানালো—— নিজেকে দীন মনে করা অপরাধ। মানুষ অমৃতের পুত্র। দীন কেন হবে?

গাড়ীটা চৌরঙ্গীর একটা বড় দোকানের সামনে দাঁড়ালো, মাধুরী নামলো মহীনকে নিয়ে, দারোয়ানরা সেলাম জানাচ্ছে। উমেশবাবুর তিন ছেলে এক মেয়ে মাত্র যথাক্রমে

অতীন, যতীন, রতীন আর মাধুরী। মাধুরী সবার ছোট। তাই সকলের আদরের। বাবা মার কথা তো না বলাই ভালো, দাদারাও ওকে অত্যন্ত স্নেহ করে। কেহ কখনো ওকে এতোটুকু কড়া কথা বলে না। বড়দার থেকে ও অনেক চোট তাই বড়দার স্নেহটা আরো বেশী ওর উপর। বৌদিও।

বড় বৌদি জমিদার বাড়ীর মেয়ে সুন্দরী সুলক্ষণা এবং সদগুণশালিনী আর এই বধুটি আসার পর থেকে উমেশবাবুর উন্নতি আশাতীত হয়ে উঠেছিল, বড় বধুর সম্মান ও বাড়ীতে বেশী। একমাত্র পুসত্রসন্তান সাড়ে তিন বছরের। মেঝ ছেলে উচ্চশিক্ষিত কলকাতায় এক বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের কন্যাকে বিয়ে করেছে সন্তানাদি এখনো হয়নি। শীঘ্রই সস্ত্রীক বিলাতে আমেরিকা যাবে বেড়াতে, কিছু বিদ্যা শিক্ষারও ইচ্ছা আছে। খেলাধুলায় ঝোঁক বেশী, ভাল ক্রিকেট খেলতে পারে। ব্যারিষ্টার কন্যাটি বিলেতী ঢঙে মানুষ হয়েছে, বাড়ীর চালচলন তার খুব পছন্দ নয় তবে যতদুর সম্ভব মানিয়ে চলতে চায়। ছোট ছেলে রতীন এম এ পাশ করে সঙ্গীত চর্চা করছে। ওদিকে খুব ঝোঁক ওর। লক্ষ্ণৌ এর একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ীর কন্যার সঙ্গে বিয়ের কথা চলছে। আগামী অগ্রহায়ণেই হতে পারে। ছোট মাধুরী, উইমেন্স কলেজে আই, এ পড়ে। গাড়ীতে আসে যায়। এখন পূজার ছুটি তাই অখন্ড অবসর ওর। গিন্নীমা পূজা পার্বন নিয়েই থাকেন। বড় বধুই সাহায্য করেন। আর মাধুরীও করে সাহায্য। বাড়ীতে নিত্য পূজা তো আছেই তাছাড়া ওর নিজের তপজপও যথেষ্ট আছে তাই বাড়ীর মধ্যে আলাদা একটা ঘরই আছে ওঁর জন্যে। অত্যন্ত ভক্তিমতি নিষ্ঠামতী মহিলা। কেউ যদি বলে আপনাকে ভাল কীর্তন শোনাবো, তা তৎক্ষণাৎ তাকে লুচি মিষ্টি খাইয়ে দেবেন আর কীর্তন শোনালে তো কথাই নাই। পোলাও কালিয়া খাওয়ান! নিত্য গঙ্গা স্নান করে আসেন তাই কালীগঞ্জে ওর বাড়ি করা হলো না, গঙ্গা দূর হয়ে যাবে। দক্ষিণেশ্বর প্রতি শনিবার যান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সাধানপীঠ দর্শন করতে কথামত ওর প্রায় মুখস্থ। কিন্তু নিজে তিনি মোটে লেখাপড়া জানেন না সব পড়িয়ে শোনেন। কেউ যদি গিয়ে বলে আপনাকে কথামৃত পড়ে শোনাবো, তার তখুনি ওখানে নিমন্ত্রন হয়ে গেল খাবার। পাড়ার কত চালাক ছেলে-মেয়ে ওঁর এই দুর্বলতার সুযোগ যে নেয়, তার ইয়ত্তা নাই। এইবার পূজোর আগে পাড়ার ছেলেমেয়ে এসে বললো, জেঠাইমা বা কাকিমা মাসিমা যাহোক সম্বোধন করে মহিষমদিনী অভিনয় হবে, মায়ের মহিষাসুর বধ লীলা আপনাকে না শোনালে আমাদের পূজোই মিথ্যে হয়।

মহা খুশী হয়ে তিনি একশো চাঁদা দিলেন এবং নবমীর দিন রাত্রি জাগরণ করে শুনে এলেন গিয়ে যাত্রা। বললেন—

নিজের ছেলেরা করেছে তাই ভালো খুব ভালো হয়েছে!

অবশ্য এ জন্য পাড়াতে ওঁর অত্যন্ত সুনাম আপদে বিপদে ওর কাছেই লোকে ছুটে আসে, সাহায্য তিনি করেন যথেষ্ট। কলকাতার শহরে এরকম গিন্নী আধুনিক যুগে দুর্লভ এ জন্য সকলেই বলে মা বলে ভগবতী।

সংসারটা সুন্দর কোথাও কোনো কলঙ্ক চোখে পড়ে না। বাইরে থেকে শুধু মেজবৌটার চাল চলন ও বাড়ীর পক্ষে একটু বে-মানান। কিন্তু সে খবর বাইরের লোকের জানাবার কথা নয়। তার বিস্তর বন্ধু নারী এবং পুরুষ টেনিস একটু না খেললে রাত্রে তার ঘুম হয় না। রাত্রে মোটরে চড়ে ক্লাবে তাকে যেতে হয়, তিনখানা খবরের কাগজ সে সকাল থেকে পড়ে। রান্না বান্নার প্রায় কিছু জানে না। চায়ের লিগার ঠিক করে দিলে কোন রকমে কাপে ঢেলে দুধ চিনি মিশিয়ে দেয়, এছাড়া মাঝে মাঝে সৌখিন রান্না করে। বন্ধুদের দেওয়া পার্টি পিকনিকে যায় আর ইংরেজী গান শিখে রেকর্ড বাজায়। বিদ্যায় এম, এ। ইংরেজী কথা মুখ ফরফর করে বলতে পারে। বই যা পড়ে সব ইংরেজী, বাংলার কোনো লেখকের নাম বোধ হয় ওর জানা নেই এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। রবীন্দ্রনাথকে জানে কারণ ছোটবেলায় দিনকতক শান্তি নিকেতনে পড়তে গিয়েছিল। তার পর ওর বাবা ওকে দার্জিলিং-এর মেম স্কুলে পড়ায়। কিন্তু একেবারে বিদেশী করে তোলা কেন? দেশী কর্তব্য কে জানে।

যতীনের সঙ্গে ক্রিকেটের মাঠে ওর আলাপ হয়। পরে বন্ধুত্ব তারপর লাভ ম্যারেজ। নইলে উমেশবাবু ও বাড়ীতে ছেলে বিয়ে দিতেন না। এই বধুটিকে নিয়ে সংসারে যা একটা ভাবনা। ঘর না ভাঙে। নইলে ভাইরা স্নেহ পরায়ণ বড়দার ওপর সবাই নির্ভর, আর বড়দাও অতিশয় ভালোবাসেন ভাই বোনদের। বড় বধূর তো কথাই নাই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। মাধুরীকে নিয়ে একটু গন্ডগোল আছে। সবার ছোট এবং সকলের অদূরে তাই ওর মন মেজাজ বোঝা কঠিন। কিন্তু ছেলেমানুষ দাদারা ওর বক্তব্যের মধ্যেই আনেনা বলে ও আমাদের আরেকটা ভাই। ওর যা খুশী করবে কেউ কিছু বলে না ওকে।

ওর বিয়ের চিন্তা কেউ কখনো করেনি। বয়স প্রায় আঠারো। বিয়ে হলে কিন্তু মন্দ হয় না। মেজবৌদির বন্ধু কুমার সাহেবের বেশ একটা লোভ আছে ওর দিকে, কিন্তু মাধুরী গ্রাহ্য করে না তাকে। এমন কি কুমার যেদিন আসে মাধুরী সেদিন এ তল্লাটে থাকে না। ছোটদার এক বন্ধু আছে সুশীল বড় লোকের ছেলে গানবাজনার সখ। না মাধুরী তার দিকে ফিরেও চায়না। আর একজন আছে বড়বৌদির ভাই, নাম বরুণ, সুন্দর চেহারা বলিষ্ঠ, শিক্ষিত, সদালাপী সবাই ভাবে হলে বেশ হতো কিন্তু যার জন্যে এসব চিন্তা তার কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ছোট থেকে মানুষ করেছে বড়বৌ ওকে মেয়ের মত স্নেহ করে; মাধুরী সুখী হলেই বড়বৌ সুখী হবে। শোনরে ছোটদি আজ মার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যেতে পারবি?

আমি তো যাবই তুইও চল না— ওখানে তোর জন্যে ভাল বরের প্রার্থনা করবো।

আমার জন্যে বর চাই না, অভিশাপ পাও তো কুড়িয়ে এনো, আমি আজ রতীনদাকে নিয়ে ঈষা খাঁর গান শুনতে যাবো বলে মাধুরী চলে গেল।

দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে ঠাকুর দর্শন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের মন্দির ইত্যাদি দেখে জপ সমাপন করে ফিরলো, রাত তখন দশটার উপর। কিন্তু মাধুরী মহেন্দ্র তখনও ফেরেনি। বড়বৌদি বললো—

এখনো ফেরেনি মাধু, বাবা। মেয়ে যা হোক—

তোমার তাতে কি? বড়দা বললো কথাটা শুনে। আমার কিছু না কিন্তু বোনটি বড় হয়েছে, বুঝলে? মেয়েরা অত রাত অব্দি বাইরে থাকবে!

মাধুরী তোমার মতন ছিচকাঁদুনে মেয়ে নয়। যার কাজ তাকেই সাজে।

স্বামী মাধুরীর দোষ দেখবে না, জানা বড়বৌদির। হেসে বললো বিয়েটিয়ে দিতে হবে না বোনের?

না বিয়ে ওর খুশী হয় করবে টিয়ে একটা পেলে দেখতাম।

টিয়ে নিজেই জোগাড় করে নিয়েছে ওই মহেন্দ্রকে। বলে হাসলো বড়বৌদি বেশ তো। কিন্তু খারাপ নয়, বলে বড়দা চলে গেল খাওয়া শেষ করে।

আর সব খেয়েছে, বাকী মাধুরী, মহেন্দ্র আর বড়বৌদি স্বয়ং। কিন্তু শাশুড়ী ওপর থেকে বললেন তুই খেয়ে নে মা, ওরা যখন আসবে খাবে, তুই কচি ছেলের মা রাত জাগলে অসুখ করবে—

নিরুপায় হয়ে বড়বৌ খেয়ে শুতে গেল তখনো মাধুরীর ফেরেনি, আশ্চর্য তো। এমন কি শুনছে ওরা বারোটা বাজে বড়বৌ ঘুমিয়ে গেল।

কে জানে মাধুরী আর মহেন্দ্র কখন ফিরছে?

পাঁচ সাত বিঘে ধানজমি মাত্র দেবেন্দ্রর বছরের ভাতের চালটা কোন রকম হয়, কিন্তু পরনের কাপড় আর নুন, তেল, মসলার জন্য নগদ কিছু দরকার কাজেই নিত্য অভাব লেগেই থাকে। খিড়কীর ডোবাটায় আগে কিছু মাত্র মাছ হতো ধারে কিচু শাক বেগুনও, কিন্তু দীর্ঘকাল সংস্কার না হওয়ার এখন আর বারো মাস জল থাকে না আর শাক বেগুনের চাষ করবার লোকাভাব। অন্ধ দেবেন্দ্র পেরে উঠেন না অতএব তবুও এ বছর কিছু মাছ ছাড়া রয়েছে, আর পুকুরের জলে কলমীলতা বপন করেছে খোকনের মা। লতাটা বেশ বড় হয়ে উঠলো। ওরই শাক প্রায় প্রতিদিন রান্না হয়! ওদিকে পাড়ে একটা আমরা গাছ আছে তার অম্বল হয় রোজই। এই উপাদান দিয়ে কোনরকমে অন্ন উদরস্থ করতে হয় ওদের কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে।

পুরনো বাড়ী পেছনের অংশটা অব্যবহার্য— ইঁদুর চামচিকের বাসভুমি। সামনের দিকটাই একটু ভাল আছে তারই কয়েকখানা ঘর আর উঠোনটুকু নিয়ে এই পরিবারটি। বাইরের ঘরটায় দেবেন্দ্র প্রায় সারাদিন বসে থাকেন চৌকিতে যে কেউ আসে এই ঘরেই বসে। মাঝে মাঝে সেতার তানপুরা মৃদঙ্গ বাজাতেন দেবেন্দ্র কিন্তু তানপুরাটাই ভেঙ্গে গেছে সেতারটা প্রায় অব্যবহার্য্য কাজেই তার সেই অবলম্বনটুকু নাই আর এখন খালি গলায় দু'একটা গান মাঝে মাঝে ধরেন।

খোকনের গান বাজনার বড় ঝোঁক। ওইটুকু ছেলে তবলার চাটি শুনলেই দৌড়াবে সেখানে। রাত জেগে গান শুনতে চায় ভাঁঙা কেনেস্তার বাজিয়ে বোল শেখে। গলাটা অত্যন্ত মিষ্টি এরই মধ্যে দু'একটা শ্যামাবিষয়ক গান শিখে ফেলেছে। কিন্তু ওকে শিক্ষা দিতে যন্ত্রপাতির দরকার তার অভাবে কিছু করা যাচ্ছে না। দেবেন্দ্র অনেক ভেবে চিন্তে আজ সকাল থেকে খোলাটা নিয়ে পড়েছেন, কীর্তন শেখাবেন খোকন বসে বসে দেখছে এবং সাহায্য করছে—অন্ধ বাপের ঐ এখন বন্ধু।

গ্রামের দু'জন লোক এসে দাঁড়ালো—স্বাগতম জানিয়ে দেবেন্দ্র বললেন কি খবর চাকলাদার মশাই?

ওঃ পাড়ায় মাহমায়া লতায় আজা একটু গান বাজনা হবে, তাই তোমাকে যেতে হবে, ভাই দেবেন। আমার ছেলে এসে নিয়ে যাবে আর দিয়ে যাবে।

ঃ সে তো আনন্দের কথা তা বাইরের কেউ আসবে নাকি?

ঃ হ্যাঁ ভুরশুশরী ওস্তাদ কালীচরণ আসবে, আমাদের বিপিন আছে আর তুমি রয়েছ। তাহলে এই কথাই রইল কেমন।

ঃ না, তেমন কিছু নয়। ভাল কথা, মহেন্দ্র কোথায়?

ঃ সে কলকাতায় গেছে কিছু একটা চেস্টা— চিঠি পাইনি এখনো, ভাবছি।

ঃ ভাবনা কি? চিঠি পাবে। আচ্ছা আসি এখন, বাবুদের বাড়ীর দু'এজনকে বলতে হবে বলে চলে গেলেন ওঁরা।

দেবেন্দ্র খোলটা সারবার চেষ্টা করতে করতে ভাবতে লাগলেন, একদিন এই বাড়িতেই গানের কত আসর বসতো। আর আজ তাকে যেতে হবে ও পাড়ায়। কিন্তু দুঃখের কি আছে। ওরা সব মনে করে ওকে ডেকেছেন, এইতো যথেষ্ট। গরীবকে কে আর মনে রাখে? বহুদিন ভালো গান বাজনা শোনেন নি আজ শুনতে পাবেন ভেবে আনন্দিত হয়ে উঠলেন মনে মনে।

এ গ্রামে সঙ্গীত চর্চা একদিন খুব ছিল এমন প্রায় নাই বললেই হয়। এখন পরচর্চা এবং পরের অনিচিন্ত ছাড়া আড্ডা প্রায়ই জমে না। যাকগে, তান পুরাটা কোনোরকমে সারিয়ে খোকনকে গান শিখাতে হবে। পড়া শুনায় ছেলেটায় বুদ্ধি খুব কিন্তু গান শেখানো দরকার। গ্রামের ফ্রি প্রাইমারী স্কুল পড়ে সে, মাইনে লাগে না ও বিষয়ে কিছু ভাবনার নাই। পড়ার বইও যোগাড় করা হয়েছে, তা ছাড়া ওর মা, ঘরে পড়ায়, তাই খোকনের খেলায় ধুম খুব বেশী। গান বাজনা হবে শুনেই বললো—

ঃ আমি যাব বাবা।

হ্যাঁ, যাবি, মা যাবে না তো? না।

আয় তোকে স্বর—মাত্রা শেখাবো—বলে আরম্ভ করে দিলেন মুখে মুখে। খোকনের আগ্রহ অত্যন্ত বেশী। আর এত সহজে বুঝতে পারে যেন মনে হয় পূর্বজন্মের সংস্কার সা—রে—গা—মা সমানে চালিয়ে যাচ্ছে বাপের সঙ্গে ওর মা ভেতরে থেকে একবার উঁকি দিয়ে দেখলো। ও একনিষ্ঠ সুরসাধকের এখন ঐ শিশুটি সম্বল। অথচ কত ভালো গান উনি গাইতে পারেন। চোখে জল আসছে, সামনে এগিয়ে এসে বললো—

ঃ স্নান করো, বেলা হয়ে গেছে।

ঃ হ্যাঁ, যাই গা মা পা ধা তাল দিয়ে চলেছেন দেবেন্দ্র আর খোকন ঠিক মত অভ্যাস করছে। অপূর্ব কণ্ঠস্বর ভগবদদও। কি মিষ্টি যে লাগছে কচিমুখে। সাধারণ বদরী বেদীতে যেন ওই পিতাপুত্র, ওই গুরু শিষ্য। খোকন গাইছে—

শ্মশান ভালবাসিস বলে, ওরা শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশান সিনী শ্যামা, নাচবি বলে নিরবধি।
শ্মশান ভালবাসিস বলে—

ঝরঝর জল পড়ছে দেবেন্দ্রের দৃষ্টিহীন চোখ থেকে। জানালাপথে চেপে আছে যেন আকাশ উজ্জ্বল করা জ্যোতির্ময় শ্যামামূর্তি দেখছেন। গাইছেন—

আর কিছু ধন নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিরে,
চিতাভস্ম চারিভিতে, রেখেছি মা আসিস যদি,

ঃ থামো। এটুকু ছেলেকে গান কেন শেখাচ্ছে? বললো খোকনের মা। মরণকালে গাইবে গো—আমার আর ক'দিন। ওর মুখে গান শুনতে শুনতে—

থামো। তোমার পায়ে পড়ি। থামো বলে ছুটে এসে মুখে হাত চাপা দিল। খোকন অবাক হয়ে বড় বড় চোখ দু'টো দিয়ে দেখছে বাবা মার এরকম ব্যাপার ও আর দেখেনি। কী এমন হলো যে বাবা কাঁদছে আর মা চুপ করাচ্ছে। সে ভাবলো আজ সকালে জলখাবার জন্য মা কৈ কিছু দিতে পারেনি, তাই কাঁদাছ বাবা। বলে বসলো—

ঃ আমার খিদে পাইনি মা, দু'টো ডাসা পেয়ারা খেয়েছি রাজুদের বাড়ীতে।

ঃ চুরি করে? দেবেন্দ্র প্রশ্ন করলেন।

ঃ না বাবা, রাজু দিয়েছিল। আর একটা আতা— আতাটা পাকা নয় তাই রেখে দিয়েছি পাকলে খাব। কাল পেকে যাবে।

ঃ সকালে কারও বাড়ী যাসনে খোকন, মা বললো, ওদের ছেলেপেলেরা সব ভাল খাবার খায় তুই কেন ভিখারির মত গিয়ে দাঁড়াস বাবা? যাসনে।

না মা রাজুর দুধমুড়ি খাওয়ার পর আমি গিয়েছিলাম। আর যাব না গান শিখতে হবে ভোরবেলা, বাবা বললো।

হ্যাঁ, ভোরবেলা গলা সাধবে। এসো স্নান করে ভাত খাবে এবার মা ওকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। ওইটুকু ছেলে সকাল থেকে বারোটা পর্যন্ত কিছুই খায়নি দু'টো ভাত রেঁধে দিতে পারতো, কিন্তু কাঠ—কয়লা কিছু ছিল না শেষে পিছনের দালানের একটা পুরানো কড়িকাঠ ছড়িয়ে উনুন জ্বালতে হোল, বেলা তখন অনেক হয়ে গেছে। নগদ পয়সা হাতে থাকলে কিছু কিনে দেয়া যেত। কিন্তু যা ছিল, মহেন্দ্রকে দেয়া হয়েছে ট্রেনভাড়া বাবদ। দেবেন্দ্র সবই জানেন, কিছু বলেন না। বলে লাভ তো নেই।

পূজা সেরে খেতে বসলেন মাসকলা—এর ডাল, ভাত আর আমড়ার অম্বল। বাড়ীর শাক অবশ্য পাতের এক কোণে ছিল একটু, ওতেই হোল। কিন্তু খোকনের বড্ড কষ্ট হয়, কোনো রকমে খায়, যাকে বলে পেটের জ্বালা। দৈন্য মানুষের আসে কিন্তু এদের যেন অতিরিক্ত মাত্রায় এসেছে কিন্তু যেদিন মহেন্দ্র রোজগার করবে সেদিনই তো সংসার সচ্ছল হয়ে উঠবে। দুঃখের দিন শেষ হয়ে আসছে।

আহারের পর একটু বিশ্রাম করার অভ্যাস, দেবেন্দ্র চৌকিতে শুয়ে চোখ বুজছেন, খোকন বাইরে রোয়াকে বসে সা রে গা মা সাধছে। হঠাৎ পিওন তাকে কি যেন বলল, খোকন তিন লাফে ভিতরে এসে বললঃ

বাবা, ও বাবা টেলিগ্রাম নাকি, কাঁপছেন দেবেন্দ্র উদ্বেগে।

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, টেলিগ্রাম মানি অর্ডার, পঞ্চাশ টাকা, বলতে বলতে গ্রামের পোষ্টম্যান সাগরময় এসে ঢুকলো ভেতরে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছুটলে যেন। মানি অর্ডার। টেলিগ্রাম নয়, আহঃ। আনন্দে চোখে জল এসে পড়লো দেবেন্দ্রের। মহীন টাকা পাঠিয়েছে, কোথায় টাকা পেল, কি করে পাঠালো কে জানে। কোন খবর নয় এই যথেষ্ট।

ঃ ফর্ম খানা হাতে দিয়ে দেবেন্দ্র বললেন আমারই নামে আছে তো সগর, কোথায় সই করতে হবে, দেখিয়ে দাও।

ঃ আজ্ঞে, চিঠিও আছে একখানা, বলে সাগর একটা পোষ্টকার্ড দিল।

চিঠিখানা আগে পড়লো খোকনো মা। মহীন ভালো আছে। উমেশবাবু তাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করেছেন, এই টাকা তিনি পাঠাচ্ছেন খোকনের জন্যে। চাকরিও তিনি একটা করে দেবেন শীঘ্রই।

পঞ্চাশ টাকা একসঙ্গে অনেকদিন দেখেনি দেবেন্দ্র হাত পেতে নোটখানা নিলেন কিন্তু এটা একজনের দান সাহায্য। মহীনের রোজগারের টাকা নয়। যতটা আনন্দ ওর হওয়া উচিত ছিল, তা হোল না। তবু মহীন ভালো আছে সেখানে। আর উমেশবাবু ধনী হয়েও তাদের ভুলে যায়নি এই সান্ত্বনা, খুশীই হলেন তিনি। মহীন লিখেছে খোকনের যেন রোজ আধাসের দুধের ব্যবস্থা করা হয়, ছেলেটা ঠিকমত বাড়িত পারছে না খাদ্যভাবে? হাসলেন দেবেন্দ্র। দুধ স্বপ্নের ব্যাপার তার বাড়িতে। কিন্তু স্বপ্ন কেন? মহীন রোজগার করবে, দুধ অমন অসম্ভব কথা কি?

টাকাগুলো স্ত্রীর হাতে দিয়ে আবার শুলেন তিনি খাটে, মাথাটা এখনো ধরে রয়েছে। ডাক পিওন বিদায় হয়ে গেছে, মনি অর্ডার আর কুপন আর চিঠিখানা রয়েছে বিছানার একপাশে। খোকন মার সঙ্গে ভেতর বাড়িতে গেছে। একা দেবেন্দ্র শুয়ে। কিন্তু আর ঘুম আসে না কত চিন্তা কত অতীতের স্মৃতি কত ভবিষ্যতের স্বপ্ন যে ওর মনের আনাচে—কানাচে ঘুরতে লাগলো তার সংখ্যা নেই। নিশ্চুপ কিছুক্ষণ পড়ে থাকলেন, তারপর উঠে ভেতরে গেলেন দেয়ালে ধরে ধরে। স্ত্রীকে গিয়ে বললেন একটা টাকা সত্য নারায়ণের পূজার জন্য রাখে, বাকীটা খরচ করো। তোমার একখানা কাপড় বড় দরকার, দয়ালকে ডেকে আনতে পাঠিয়ে দাও।

আচ্ছা, তুমি উঠে এলে কেন?

ঃ কিচ্ছু না, এমনি মনটা অস্বস্তি লাগছে।

ঃ কে জানে?

ঃ কেন তা জানে অর্পণা। টাকাগুলো নিতে হলো দারিদ্রের তাড়নায়, নিরুপায় হয়ে, নইলে ক্ষেত্রনাথের পুত্র দেবেন্দ্র কারো অর্থ সাহায্য জীবনে গ্রহণ করেনি। আর এই জন্যই তিনি উমেশবাবুকে কোনো খবর পর্যন্ত দেননি, তার দুঃখ দুর্দশার। মহেন্দ্র জেদ করে গেল, নইলে তাকে ওখানে তিনি পাঠাতেই চাননি। অর্পণা বললো, উনি আমাদের লোকই তো টাকা দিয়েছেন তো ক্ষতি কি? মহীন চাকরী পেলেই আর কারও সাহায্য নিচ্ছি না আমরা, নিজের মনে করে তিনি দিয়েছেন, মনে অশান্তি কেন আনছো তুমি?

—অশান্তি নয় অপর্ণা অসহায় বোধ করছি। মহীনের রোজগারের পাঁচটা টাকা এলে আমি হয়তো আনন্দে নাচতাম।

—আসবে? পাঁচ টাকা কেন. পাঁচশো আসবে মহীনের। কত কষ্টে মানুষ করা ছেলে আমার মহীন, সে তো বসে থাকার ছেলে নয় কুড়েও নয়।

ঃ হু, যাক কাপড়টা আনিয়ে নাও, বলে তিনি ফিরে যাচ্ছেন।

অপর্ণ বললো। তোমার তানপুরার তারও আনতে দেব কি রকম তার চাই বলে দাও—

—না, অকস্মাৎ ফিরে দাঁড়ালেন দেবেন্দ্র। না অপর্ণা ওটা মহীনের রোজগারের টাকা এলে কিনবে। এই বংশের গৌরববাহী যন্ত্রে আমি পরের দানের স্পর্শ ঘটাব না। চলে গেলেন।

জানে অপর্ণা স্বামী স্বভাব। ভাঙ্গবে তো নুইবে না কঠোর কঠিন সংযমী পুরুষ, নির্লোভ নিরহঙ্কার কিন্তু কোথাও তার বংশগৌরব ক্ষুন্ন হতে তিনি দিতে চান না, একান্ত অসহায়। আজ তিনি অন্ধ, অন্ন বস্ত্রহীন, নইলে হয়তো এ টাকা তিনি ফেরত দিতেন।

দয়ালকে ডাকতে হলো না এমনি সে আসে। পাড়ার পরোপকারী যুবক অকাতরে অপরের জন্য শরীর ব্যয় করতে প্রস্তুত। এসে বললো—

ঃ কাকীমা, কিছু দরকার আছে?

ঃ হ্যাঁ বাবা একখানা শাড়ী এনে দিতে পারবি?

হ্যাঁ টাকা দাও, আর রেশন কার্ডটা।

অপর্ণা টাকা দিয়ে বললো খুব মিহি কিনিস না বাবা, মাঝামাঝি দেখে আনিস যেন টেকে। খোকনের জন্য প্যান্ট।

আর কি? দয়াল প্রশ্ন করলো!

—না আর কি? একটা রবারের বল পাস তো আনবি খোকনের জন্য দয়াল হয়তো সন্ধ্যা নাগাদ ফিরবে। কিন্তু তানপুরার তারটা কেনা হলো না। হলে উনি বাজাতে পারতেন সকাল সন্ধ্যায় একটা কাজ পেতেন খোকনের শেখা হতো, উপায় নাই। অপর্ণা নিঃশ্বাস ফেলে গৃহকর্মে মন দিল।

খোকন খিড়কী পুকুরের পাড়ে বাগান করেছে। চাপা দোপাটি আর সন্ধ্যামণি ফুলের গাছ লাগিয়ে। কবরী শুলঙ্ক আর গাদা আগে থেকেই ছিল ওখানে। বাগানের মাঝে গোটাকয়েক ভাঙ্গা ইট জড়ো করে বেদী বেঁধেই তার উপর শাহাজাদা বাদশার মতো বসে গান ধরেছে—

কেষ্ঠঠাকুর কালো হলো, গোরা হলো, গোরা হলো রাধা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, হঠাৎ শুনতে পেল বাবাকে ডাকতে এসেছে মহামায়া মন্দিরে গান বাজনার আসর থেকে। একছুটে ভিতরে এসে দাঁড়ালো, ও যাবে ওখানে। অপর্ণা ওর ছেঁড়া প্যান্ট খুলে নতুন প্যান্ট পরিয়ে দিল। আনন্দে খোকন চলে গেল বাপের সঙ্গে গান শুনতে।

আসরটা মন্দ হয়নি ওখানে। অনেক লোক এসেছে। দেবেন্দ্র ওস্তাদ সবাই খাতির করে বসালেন, গান আরম্ভ হলো, খোকন তালে তালে ঘাড় দোলাচ্ছে অবশেষে বাবার গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে আরম্ভ করে দিল। সবাই অবাক—সঙ্গীতে অসাধারণ প্রতিভা তার, আশ্চর্য তো।

ঃ খুব বড় গায়ক হবে বললো একজন।

ঃ কি করে হবে শেখবার অবস্থা নেই দেবেন্দ্র বললেন।

ঃ আপনি শুধু সা রে গা মা শিখিয়ে দিন, তারপর ও নিজেই শিখে যাবে।

ঃ সঙ্গীত বড় শক্তি বিদ্যা, বললেন দেবেন্দ্র কিন্তু আশায় আনন্দে ওর চোখ জলে ভরে উঠলো। খোকা বড় গায়ক হবে ঈশ্বরের আর্শীবাদ হয়ে দাঁড়াবে তার জীবনে।

জুতো জামা কাপড়ে মহেন্দ্র প্রায় অভিজাত হয়ে উঠেছে, চেহারাটা তো ঈশ্বরদত্ত! কিন্তু আচার ব্যবহার নিতান্ত দীনহীনের মত না হলেও ধনী সন্তানের মত মদগর্ব আসছে না। বহু ব্যাপার আছে এই সমাজে, যা যত্ন করে শিখতে হয়। জন্মাবধি যাদের অভ্যাস তারাই এই সব ভাল পারে। মহেন্দ্র নিতান্তই পল্লীবাসী, তাকে কাঁটা চামচেতে খাওয়া শেখাতেই যথেষ্ট সময় লাগবার কথা, কিন্তু মাধুরী অসাধারণ ভাল মাষ্টার। তার পাল্লায় পড়ে মহেন্দ্রকে শিখতে হচ্ছে।

সেদিন গান শুনে বহু রাত্রে ফিরলো মহেন্দ্র মাধুরী। খেয়েই এসেছিল, তাই বাড়ীর খাবারের আর খোঁজ করলো না। মহেন্দ্র তার নির্দিষ্ট ঘরে কম্বল পেতে শুলো, কিন্তু অতি ভোরে মাধুরী নয় বড়বৌদি এসে বললো, তোমার যোগাভ্যাস আপাততঃ তুলে রাখো ঠাকুরপো, ওর দেরী আছে। এজন্মে হবার আশা কম।

ঃ যোগভ্যাস নয় বৌদি। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করতে করতে বললো, বদভ্যাস করতে চাই না।

ঃ ভালো, বিছানায় শোওয়া বুঝি বদ অভ্যাস?

ঃ হ্যাঁ, বৌদি, পুরুষ যেখানে হউক শোবে, যা পাবে তাই খাবে, যে ভাবে হোক থাকবে পৃথিবীতে তাকে কর্মের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ঃ ওরে বাপরে! একেবারে পতঞ্জলী ঠাকুর। কিন্তু তোমার শরীর খুব ভালো নয় ঠাকুরপো। কাল তোমার বড়দা বলেছিলেন তোমার শরীরটা আগে সারা দরকার।

ঃ আমি খুব সুস্থ মানুষ, বৌদি, আপনি ভুল করছেন। বড়দাকে বলবেন দেখতে লম্বা আর রোগা হলেও আমি অসম্ভব খাটতে পারি। উঠলো মহেন্দ্র নিজের হাতে কম্বল—বালিশ গুটিয়ে তুলে রাখলো। মুখে চোখে জল দিল এবার।

ঃ কাল কেমন গান বাজনা হলো, বড়ো বৌদি শুধোল।

ঃ ভালো। তবে দেখলাম খাঁটি রাগ রাগিণীর দিকে প্রায় কেউ এগোল না।

ঃ আজ কালকার মানুষ খাঁটি কিছুই চায় না ঠাকুরপো। নাও উঠে মুখ ধুয়ে এসো, মা বাবা বসে আছেন চা নিয়ে।

ঃ মাধুরী কোথায়? ঘুমুচ্ছে? কথাটা অকস্মাৎ অতর্কিত বেরিয়ে গেল মহীনের মুখ থেকে।

ঃ না। হেসে উঠলো। বড়বৌদি, মাধুরী ভালোই আছে। ভোরে স্নান ওর অভ্যাস, তারপর ঠাকুর ঘরে যায়, এখনো সেখানেই আছে। নাও, মুখ ধোও। মহেন্দ্র আর কিছু না বলে বাথরুমে ঢুকলো। কিন্তু বৌদি কেন হাসলেন? অমন ব্যাকুলভাবে মাধুরীর কথাটা না শুধুলেই ভালো হতো। কে জানে কি ভাববেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এই বৌদি। এতবড় সংসার ওর নখাগ্রে রয়েছে, অথচ কিই বা বয়স? বড়বৌদির চোখকে ফাঁকি দেওয়া অতিশয় কঠিন। ফাঁকি দেবার মতো কি এমন দুষ্কর্ম করেছে মহেন্দ্র? না কিছু না। আশ্বস্ত হয়ে মুখ দিয়ে এল। চা খেতে গেল তারপর।

গিন্নী আর উমেশবাবু বসে আছেন। মহেন্দ্রকে দেখেই গিন্নী বললেন, ভালো ঘুম হয়েছিল বাবা? চোখ লাল কেন দেখাচ্ছে?

ঃ না ঘুমিয়েছি তো। বলে মহেন্দ্র বসলো। মাধুরী এখানে আনে নি ঠাকুর ঘর থেকে, ওখানে ও কি করে, কে জানে? ওর এখন ঠাকুর ঘরে অত সময় দেবার বয়স নয়, কিন্তু ওদের। মহেন্দ্র ভাবলো জিজ্ঞাসা করবে মাধুরীকে। ইতিমধ্যে ছোটদা রতীন্দ্র এসে বললো, আমাদের অলকা ক্লাবে কাল তুমি গেলে না মহীন? মাধুটাকে এত করে বললাম তোমায় নিয়ে যেতে— কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

ঃ চলো সঙ্গীতালয়ে। বহুবাজার।

ঃ আমাদের ওখানে গেলে না কেন? কাল ভাল গাইয়ে ছিল একজন।

ঃ তোমাদের দত্ত সাহেব তো। ওর গান আমাদের শোনা আছে। গলা তো নয় যেন ফাটা হাড়ি। লোকটার গান গাইতে লজ্জা করে না। কথাগুলো বললো মাধুরী।

স্নান করে ঠাকুর ঘর থেকে ফিরছে, অঙ্গে ওর ধুপ সুরভি, হাতের মুঠোয় এক মুষ্টি শেফালী ফুল। টেবিলের উপর সেগুলো নামিয়ে বসলো। রতীন্দ্র বললো, ভাঙ্গা গলা পুরুষের লক্ষণ জানিস। রাগিনী যেন রূপ ধরে উঠে ওর গানে। ওরে বাপ। সে তাহলে রাগিনী নয় বাঘিনি। বলে মাধুরী চা ঢালতে লাগলো। রতীন জানে কথায় ওর সাথে পারা যাবে না, তাই মহীনকে বললো তুমি একবার দত্ত গান শুনবে মহীন, বুঝলে? আমার সঙ্গে যেয়ো আজ বিকালে।

না, আজ আমাদের হাওড়া যাবার প্রোগ্রাম আছে, বেলুড় মঠ দেখতে, বলে মাধুরী কথাটা কাটিয়ে দিল। মহেন্দ্র কিছুই বলেনি ধীরে ধীরে চা খাচ্ছে।

ঃ দাদার চিঠি পেয়েছ? শুধালেন উমেশবাবু।

ঃ আজ্ঞে না, দাদা আমার চিঠি হয়তো পেয়েছেন, আজ জবাব দিলে আমি কাল পাব।

ঃ খোকার জন্য মন খারাপ করছ বাবা। শুধোলেন গিন্নী মা;

ঃ না হ্যাঁ ওটার কথাই মনে হয়; মহীন সলজ্জ হেসে জবাব দিল।

ঃ বেলুড়ে কি কাজ তোমাদের? রতীন প্রশ্ন করলো আবার।

ঃ কাজ এমন কিছু না। দেখতে যাব আজ গেলেও হয়, কাল গেলেও হয়, বললো মহেন্দ্র।

ঃ আজ যেতে হবে, আমার প্রোগ্রাম বদলায় না। মাধুরীর গলার স্বর দৃঢ় এবং উত্তেজনাপূর্ণ।

আচ্ছা বাপু যা। বেলুড়ই যা রামকৃষ্ণ, মিশনে যোগ দিলেই তো পারিস, বলে রতীন বিরক্ত হয়ে উঠে গেল। যেতে যেতে আবার বলে গেল, মনে করেছিলাম ক্লাবে টেলাবে নিয়ে একটু ভদ্র করে দেব, পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব তা তো তুমি হতে দেবে না। থাক অমনি জংলী ভূত হয়ে।

শহরে মামদো থেকে জংলী ভূতেরা অনেক ভালো। জবাব দিল মাধুরী।

ওরা পিঠোপিঠি ভাই—বোন, ঝগড়া প্রায়ই লেগে আছে ওদের। কিন্তু সে ঝগড়ায় স্নেহের অভাব নাই। ছোটদা খুবই ভালোবাসে মাধুরীকে। যেখানে যায় নতুন কিছু ওর জন্য কিনে আনে। সেই লক্ষ্ণৌ থেকে একটা পুতুল কিনে আনলো।

ঃ ও নিয়ে খেলবার বয়স পার হলাম ছোটদা, তোমার খুকীর জন্য রেখে দাও।

ঃ তুই এখনো যথেষ্ট খুকী আছিস, নে, নে বলছি, ছোটদা ওর ঘরে দিয়ে গেল ওটা। খুশি হলো মাধুরী খুবই। কিন্তু মুখে কথা বলতে ছাড়লো না বললো, আমাকে ওরা খুকী বানিয়ে রাখবার চক্রান্ত করেছে, ছোটদা সেই চক্রান্ত সভার প্রেসিডেন্ট।

ঃ আমি না, বড়দা বললো ছোড়দা।

ঃ আজ্ঞে তোমার ইচ্ছাই নয় যে আমি বড় হই। শাড়ি তো তুমি কিনে দিতে চাইতে না। এখনো তুমি স্বীকার কবছো না আমি বড় হয়েছি।

ঃ হোসনি বলে ছোড়দা চলে গেল। ভাই বোনের এই ঝগড়া বেশ লাগে অন্য সকলের ওরা সবার ছোট, সকলের স্নেহভাজন, তাই সবাই উপভোগ করে কথা কাটাকাটি। কিন্তু মহেন্দ্র ব্যাপারটা অন্য চোখে দেখলো। মাধুরীর মত বয়সের মেয়ে তার চোখে ছোট তো নয়ই বরং যথেষ্ট বড়। ওর বিয়ে এখনো হয়নি মহীনের কাছে প্রথম প্রথম এটা অত্যন্ত বিসদৃশ লেগেছিল। এই কয়দিনে অবশ্য সয়ে গেছে এবং সে বুঝেছে সে আধুনিক যুগে এটাই চলছে কিন্তু রতীন যেভাবে মাধুরীর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে যতখানি সহজে তার বেশি ধরে টান দিয়ে চড়টা—চাপড়টা লাগিয়ে দেয় মহেন্দ্রর পক্ষে তা সম্ভব নয় কিন্তু কেন? রতীন ওর সহোদর আর মহেন্দ্র নিতান্ত অনাত্মীয় না হলেও বন্ধুপুত্র। মাধুরীর পক্ষে সহজ ভ্রাতা—ভগ্নী ভাব কেন মহেন্দ্র আনতে পারছে না। নিজেকে কঠোর প্রশ্ন করেছে মহেন্দ্র দু'তিনদিন থেকে এটা অপরাধ হচ্ছে তার অন্তরাত্মার কাছে। নিজেকে এভাবে নীচু করা মহেন্দ্রের। মাধুরীর তরফটা সে ভেবে দেখলো, সে ঠিক সহোদরার মতো ব্যবহার করে, সহজ সরল সুন্দর। মাধুরী উঠে বললো। চলো, তোমার সেই গল্পটা শুনতে হবে।

ঃ কিসের গল্প রে মা? উমেশবাবু শুধালেন।

খুব ভালো গল্প বাবা, ধানগাছ আর ক্ষেত্রে কাঁকর ধরার গল্প, পান কৌড়ির ডুব সাঁতার, কাঠ ঠোঁকরার কঠকঠ তার সঙ্গে দোয়েল, পাপিয়া, বৌ কথা কও পাখীর গল্প, ও এতো সুন্দর করে বলে বাবা, যে শুনলে তুমিও শুনতে চাইবে।

ঃ ও, যা, শোনগে।

মহেন্দ্রকে নিয়ে মাধুরী চলে গেল। বড় বউ হেসে বললো, পাড়াগাঁ সম্বন্ধে মাধুরীর একটা স্বপ্ন আছে বাবা, ও কখনো দেখেনি কিনা।

হ্যাঁ, মা কলকাতার বাইরে ও যদি গেছে তো, দার্জিলিং কিংবা দিল্লী। পাড়াগাঁ দেখেনি।

ঃ আমি একবার ওঁকে বলেছিলাম, আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে কুন্তী নদী বয়ে যায়। তা শুনে বললো সে নদী আমি দেখবোই বৌ, কুন্তী, মহাবারতের কুন্তী দেখতেই হবে। বললাম, সেইটা একটা খাল বিশেষ। শুনে ওর চোখ ছলছল করে উঠলো, বললো, কুন্তীর মত গরবিনী মাকে তুমি খাল বলছো? ছি। সেই থেকে আমি খুব সাবধানে ওর সঙ্গে কথা বলি বাবা।

মা বাবা দু'জনেই হাসলেন। মা বললেন ওকে নিয়ে ভারী মুশকিল রে মা। কোথায় গিয়ে পড়বে, শ্বশুর বাড়ি কেমন হবে, বড় ভাবনা হয় আমার।

ঃ তোমার ছেলেরা তো বলেন ওর বিয়েই দেব না। তুমি ভাবছো কেন মা ওঁরা বলে, মাধুকে নিয়ে আমরা চার ভাই, মাধু আমাদের বাড়িতেই থাকবে বিয়ে ওর দেব না।

তা কি হয় মা? মেয়ে হয়ে জন্মেছে, বিয়ে তো দিতেই হবে। তবে যতটা সম্ভব দেখে শুনে দিতে হবে, তারপর অদৃষ্ট। আর কেউ কিছু বললো না কেমন যেন গুরু গম্ভীর হয়ে উঠলো আসরটা। তারপর উমেশবাবু বললেন, অতীন কি বেরিয়ে গেছে বৌমা?

ঃ হ্যাঁ বাবা, কিসের যেন কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন, ভোরেই বেরিয়েছেন। মেজ ঠাকুরপো যাবেন বোম্বাই ওদের খেলা আছে।

ঃ মেজবৌমা যাবেন নাকি, গিন্নি প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ যাবার যোগাড়ই তো করতে দেখলাম, এয়ারে যাবে শুনেছি।

ঃ এয়ারে। বড্ড আমার ভয় করে মা, এয়ারে কেন? ট্রেনে গেলেই পারতো।

ঃ ভয় করে আর লাভ নাই মা, সবাই এ যুগে এয়ারে চলে, বাকী রইলাম আমি তুমি আর বাবা, বলে হাসলো বড়বৌ। বাবা চলুন আমরা একবার এয়ারে ঘুরে আসি, আমার ভারী ইচ্ছে হয় বাবা।

ঃ তুই যা অতীনের সঙ্গে। আমাদের আর এ বয়সে এয়ারে পোষায় না মা, বলেন উমেশবাবু। তারপরই বললেন, মাধু শুনলেই বায়না নেবে আর আমাকে উড়িয়ে ছাড়বে। ওকে কিছু বলিস না, বুঝলি?

ঃ ওকেই বলতে হবে বাবা তাহলে আপনারা যাবেন আপনাকে একবার এয়ারে নিয়ে যাবার বড় সাধ, হাসলো বড়বৌ।

ঃ কেন মা হেসে শুধালেন উমেশবাবু। আমাকে উড়াবি কেন?

ঃ বাবা, আপনি আমাদের জন্যে এতসব করেছেন, সারাজীবন খেটেছেন অথচ যুগের যে সুখ সুবিধে, তা কিছু আপনি ভোগ করছেন না। সেই ভাতে ভাত খাবেন ফরাসে বসে, গুড়গুটি টানবেন, আর সেই হাত কাটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে শীত কাটাবেন আর আমরা সব নবাবী করে বেড়াবো, এ আমার ভালো লাগে না বাবা। বড়বৌ মাথায় হাত দিয়ে বুলাতে বুলাতে বললো।

ঃ অনেকদিন সে এসেছে এ বাড়িতে। কন্যার মত বড় হয়েছে উমেশবাবুর ক্রোড়ে। শুধু বধু নয়। আত্মজা দুহিতার মতো ওর আবদার বড় মিষ্টি লাগে উমেশবাবুর। আর বড়বৌ সত্যি বড় ভালো মেয়ে, এযুগে এরকম বধু দুর্লভ।

ঃ ছেলেমেয়েদের জন্যই মা বাপ যা কিছু করে মা, আমার কি নবাবী করার বয়স আছে? এখন হরিনামের মালা ঘোরাব, শেষ কাজ মাধুরীর বিয়ে, তাপর আর কি, তোরা ভাল থাকলেই আনন্দ রে। আমায় এককাপ কফি দে রে, বলে বৃদ্ধ সস্নেহে বড় বধূর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

বড়বৌ কফি তৈরি করছে শ্বশুরের জন্য, ওদিকে মাধুরীর কল হাসি শোনা গেল। ওদের গল্প বলছে নিশ্চয় এবং সে গল্প হাসির উপাদান আছে। কফির কাপটা এগিয়ে দিয়ে বড়বৌ একবার ভিতরে গেল দেখতে, মহেন্দ্র আর মাধুরী কিসের গল্প করছে—

ঃ শীত বুড়ি এ গ্রাম উ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরলো, ওম্ মা তাকে কে চায়, বেরো—। শীত বুড়ীকে কেহ আশ্রয় দিল না, ঘুরে ঘুরে বুড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়লো। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে শীতে তো গলা শুকায় জানো—

ঃ হু, তারপর? মাধুরী হাসিমুখে বললো।

ঃ জল খাবার জন্যে বুড়ি গেল নদীতে। নদী ওকে দেখে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল যা বেরো কে তাকে জল দেবে? শীত বুড়ি নিরাশ হয়ে পুকুরের কাছে গেলো। পুকুরও তাকে তাড়িয়ে দিল দূর দূর করে। কেউ জল দিতে চায় না। শীত বুড়ির চোখ ফেটে জল আসছে, পিপাসায়.....

ঃ তারপর?

ঐখানে ছিল একটা পুরানো পাতকুয়া, সে এসে বললো, বুড়ি, কেউতো তোকে জল দিল না, আমি দেব আয়। আমার জল খা। বুড়ি যেন হাতে স্বর্গ পেল। আকণ্ঠ জল পান করে আশীর্বাদ করলো পাতকুয়াকে, শীত কালে আমার রাজত্বে সব জল ঠান্ডা হয়ে যাবে কিন্তু বাছা পাতকুয়ো, তোর জল থাকবে উষ্ণ, সুখসেব্য। হ্যাঁ, সত্যি? পাতকুয়োর জল গরম থাকে শীতকালে? মাধুরী শুধলো, গরম নয়, উষ্ণ থাকে। তাপর শীত বুড়ি বসলো গাছতলায়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, শীত পড়েছে দারুণ, শীতে বুড়ি কাঁপছে। রাস্তা দিয়ে যে যায়, শীত বুড়ি বলে, বড় জড়ি একটি কম্বল দাও না গো কেউ। কিন্তু কে দেবে? সবাই ভয়ে পালাল। শীত বুড়িকে কম্বল দিয়ে কে আর তোয়াজ করবে বলো?

ঃ হুঁ, তারপর?

ঃ শেষে একটি গাঁয়ের বউ ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরছিল, শীত বুড়ি তাকে বললো জারে বড় কষ্ট পাচ্ছি মা, কিছু দিতে পারো। বউটির দেবার কিছু নাই, বললো, আমি তো আঁচল গায়ে দিয়ে আছি মা, এরই একখানি নাও। বলে সে তার আঁচলের খানিকটা ছিড়ে দিল। বুড়ি গায়ে দিয়ে বাঁচলো, বললো, বৌমা, আমার রাজত্বে যে যতই দামী জামাকাপড় পরুক আমি তাকে শীতে কষ্ট দেবই, কিন্তু খালি গায়ে আঁচল গায়ে দিয়ে কেউ শীত পাবে না, বৌরা আঁচল ঢেকে তাদের খোকাখুকীকে শীত থেকে রক্ষা করতে পারবে। সেই থেকে পাতকুয়োর জল আর শাড়ির আঁচল বাংলার বধূদের সম্বল। এই দারুণ শীতে দামী জামাকাপড় বৌদের দরকার হয় না মাধুরী।

ঃ শুধু আঁচল গায়ে? এতো শীতে? বিস্ময়ে— চোখ কপালে উঠলো।

ঃ হ্যাঁ শুধু আঁচলে, তাও ছেড়া, উঠতে হয় ভোর পাঁচটায়, ঘর নিকানো কত কি কাজ ঐ ভোরেই বাংলা পল্লীবধুর এই স্বরূপ, আজও।

ঃ পাতকুয়োর জলে হাত কনকন করে না।

ঃ না, মাধুরী পাতকুয়োর বর রয়েছে জল উষ্ণ, আমার লাগে হাত দিতে।

ঃ ওখানকার সব বাড়িতেই এই রকম?

হ্যাঁ কারণ সবাই গৃহস্থ প্রায়, কলের জলতো নেই, জামা—কাপড়ও কম।

ঃ এই তোমাদের গল্প, বলে বড়বৌ হেসে ঢুকলো ভেতরে। মাধুরী বলল গল্প খুব সুন্দর বৌদি, গাঁয়ের মেয়েদের সত্যি রূপটি ফুটে উঠেছে গল্পে।

উমেশবাবু একটি বাগান বাড়ি খরিদ করলেন দমদমে। বিরাট বিস্তীর্ণ উদ্যান কৃত্রিম ঝর্ণা। পুকুর এবং তার সঙ্গে একখানি বাড়ি। কে জানে কবে কোন এক সৌখিন ধনী। এই সুন্দর উদ্যান তৈরি করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছরের প্রাচীন এর জীবনে। ইতিহাস, হয়তো সেসময় বাঈজী বিশাল এই সুরম্যকানন অপবিত্র হোত কিন্তু আজ তার কোন চিহ্ন নাই বরং বাড়ির বহু ভগ্ন, বাগান যে মেরামতে কদর্য মূল্যবান প্রস্তর মূর্তির অনেকগুলো.স্থান ভ্রষ্ট তথাপি বাগানটা এখনও সুন্দর।

বর্তমানকালে কেউ আর বাগানবাড়ি কিনে না। উমেশবাবুও কিনতেন না, কিন্তু বাগানটার মালিক আর্থিক দুর্দাশায় পড়েছেন, তাই উমেশবাবুকে তিনি ধরে পড়লেন। অন্তঃপর বাগানটা নিয়ে কি করা যায় উমেশবাবু ভাবছিলেন। অকস্মাৎ মেজ ছেলে যতীন বললে, আমরা ঐ বাগানটায় পিকনিক করতে যাবে একদিন।

বেশ তো, যেয়ো। উমেশবাবু আনন্দিত হয়ে উঠলেন। এতগুলো তার ছেলে মেয়ে, বাগান বাড়ি তো দরকারই বাগানটা কিনে ভালো করেছেন। তারপর কলকাতা শহর যেমন বাড়তে আরম্ভ করেছে কে জানে কবে ঐ বাগানে ঠেকবে আর তখন ঐ জমি হাজার টাকায় বিক্রী হবে। একটা সম্পত্তি হয়ে রইল।

মনে মনে এসব হিসাব করছিলেন উমেশবাবু হিসাব করা তাঁর অভ্যাস, হিসেবী না হলে এতবড় সম্পদের মালিক তিনি হতে পারতেন না। বড় ছেলে এসে ঢুকলো। উমেশবাবু তার পানে প্রশ্ন সূচক দৃষ্টিতে তাকালেন।

ঃ মহেন্দ্রকে টাইপ করার কাজটা শিখতে বললাম বাবা।

ঃ বেশ তো, আর শর্টহ্যান্ডও। উমেশবাবু সানন্দে বললেন।

ঃ না বাবা, ইংরাজী খুব কম জানে, শর্টহ্যান্ড পড়বে না।

ঃ কে? সেই ছোকরাটার কথা বলছেন? বলতে বলতে কুমার এসে দাঁড়ালে। হাতে টেনিস র‍্যাকেট, পরণে খেলোয়াড়ের সাজ, মুখে উপেক্ষার হাসি। বললো, শর্টহ্যান্ড না শিখলে টাইপ শেখার কোনো মানেই হয় না, ওতে কি হবে। ত্রিশ টাকা।

ঃ হবে ওতেই হয়ে যাবে। টেনিস ক্রিকেট না দেখলে, বিলেতী ঢঙে না চললে ওতেই দুবেলা দুমুঠো হতে পারে। বলে মাধুরী এসে দাঁড়ালো বাপের পিছনে। বাবাকে বললো, আজ আমি একটা ঘরোয়া সাহিত্য আসর বসাব বাবা, তোমাকেও থাকতে হবে।

সাহিত্য আসর! উমেশবাবু বুদ্ধিহারা হয়ে উঠলেন, কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করেছিস?

বাংলার খ্যাতনামা কয়েকজন সাহিত্যিক আসবেন, বর্তমান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হবে।

ব্যাপারটা এতই অভিনব আর এ বাড়িতে এমনই আকস্মিক যে উমেশবাবু এবং অতীন ও কুমার বিস্মিত হয়ে গেলো বিশেষ রকম। কিন্তু কুমার কোনো ব্যাপারে নিজেকে ছোট মনে করে না, আধ মিনিট ভেবে বললো, সুন্দর প্রস্তাব। আমাদের খেলাটা আজ না হয় মূলতবী থাক......।

আপনারা নিশ্চিন্তে খেলা করুনগে, ওখানে আপনাদের কোনো কাজ নেই।

তোমাকে তাহলে নিমন্ত্রণ করা হলো বাবা, বলে মৃদু হেসে চলে গেল মাধুরী।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ বেশ ক্ষুণ্ণ হলো বোঝা গেল, কিন্তু উপায় নেই। মাধুরীর কথাই ঐ ধরনের। তথাপি ঐ তরুণীর প্রতি আকর্ষণ দুর্বার, দুঃসহ অজয়কে জয় করবার সাধনাই করেছে সে। মাধুরীর অন্তর তাকে লাভ করতেই হবে কিন্তু আপাততঃ কিছু করবার নেই। ওদিকে লন—এ খেলোয়াড়গণ এসে জুটল। কুমার র‍্যাকেটখানা ঘুরাতে ঘুরাতে বাইরে গেল—অতীন বললো—

ঃ মাধু কুমারকে মোটেই সইতে পারবে না বাবা—

ঃ তার আর কি করা যাবে? যাকে সইতে পারবে তাকেই আনবি।

ঃ সে তো নিশ্চয়ই। যতদিন ওর মত না হবে, তত দিন বিয়ের কথা থাক বাবা। ও এখন সাহিত্য, সঙ্গীত এই নিয়ে বেশ আছে।

ঃ থাক, তবে বড় হয়ে উঠলো অতীন।

ঃ না বাবা, এমন কিছু বড় হয়নি, বলে চলে গেল। বৃদ্ধ তারপর কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবতে লাগলেন, ছেলে। মাধুরীকে অত্যন্ত স্নেহ করে। তার মৃত্যুর পরেও মাধুরী কোন অসুবিধা হবার নয়, তথাপি কিছু নগদ টাকা আর দম—দমের ঐ বাগানখানা তিনি মাধুরীকে দিয়ে যাবেন। মাধুরীর বিয়ে যদি এর মধ্যে হয় ভাল না হলেও খুব বেশি আটকাবে না। তবে কি হবে, না হবার কারণ কিছু নাই, কুমারকে না চায়, অনেক কুমার মাধুরীর জন্য পাওয়া যেতে পারে।

ওদিকে বড় ঘরটায় সাহিত্য আসর পাতা হচ্ছে। তিন চারটি মেয়ে ওরা সকলেই মাধুরীর বান্ধবী, কলেজে পড়ে পাড়ারও আছে। আর রয়েছে মহীন। গান হবে, তারও আয়োজন করা হচ্ছে। এ ঘর থেকে দেখতে পেলেন উমেশবাবু ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল করে তুলেছে মাধুরী। ওদের আলোচ্য বিষয় বর্তমান সাহিত্য কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধে উমেশবাবু কোন খোঁজ খবর রাখেন না। বাড়িতে একটা ছোট লাইব্রেরী আছে, মাসিক পত্রও আসে কয়েকখানা, কিন্তু সে সব মাধুরীর সম্পত্তি। বড় জোর ছোট ছেলে রতীন মধ্যে মধ্যে যায় সেখানে। বড় বৌমাও বই নিয়ে যায়, কিন্তু মাধুরীদের ওতে নজর খুবই কম। প্রায় সব সময় ঘরটা তালাবন্ধ থাকে।

চার পাঁচজন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে মাধুরী ঢুকলো এ ঘরটায়, এঁরাও তাহলে সাহিত্যিক হবেন। আর বসে থাকা চলে না, উমেশবাবুকে উঠতে হোল অভ্যর্থনার জন্যে। গিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন তাদের। গান হোল, মাল্যদান ও হোল, এবার আলোচনাও হবে। উমেশবাবু এক সময় সরে পড়লেন, কিন্তু টেনিস খেলোয়াড়ের দলকে দল এসে ঢুকলো ওখানে। পাঁচ সাত জন লোক, কুমার নৃপেন্দ্র নারায়ণও।

আসনে বসলেন তারা। জনৈক সাহিত্যিক বক্তা বলতে লাগলেন, বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে ধারা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য একটা বলিষ্ট গতি লাভ করেছে। এই যুগের জন সাহিত্য, মানুষের মনের সঙ্গে এর সংযোগ। নিবিড় মানুষের আবেষ্টনীর সঙ্গে অনুরঞ্জন গভীর এবং গাঢ়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

'যে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি,
যে আছে মাটির কাছাকাছি—

মাটির কাছাকাছি থাকা সেই কবিদের আবির্ভাব আজ ঘটছে—

ব্যাপারটা অমনি জটিল অবোধ্য আর অনালোচিত যে কুমারদের দলে বিশেষ সুবিধে পাচ্ছিল না। প্রায় শেষ হয়ে আসছে, আর কেউ কিছু বলবেন কিনা প্রশ্ন

করলেন সভাপতি মশাই। অকস্মাৎ কুমার বলে উঠলো, সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা মহীন বাবুর কাছ থেকে কিছু শুনবার আশা করি।

মহেন্দ্র একধারে চুপচাপ বসেছিল। তার প্রতি এমন একটা আদেশ আসবে, সে মোটেই আশা করেনি, সভাটা ঘরোয়া, কাজেই রুচি বিরুদ্ধতার কথা উঠে না কিন্তু সভাপতি মশাই মহেন্দ্রর পানে তাকালেন। মহেন্দ্র উঠলো—

অকস্মাৎ আমার উপর এই আদেশ আমি আশা করিনি। বিদ্যা আমার অত্যন্ত কম। সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান তার থেকেও কম, তথাপি আমার মত, আমি যথাসাধ্য বলবার চেষ্টা করছিঃ বর্তমান জগৎযুদ্ধের বিপর্যয়ে ব্যাধিগ্রস্ত জগৎ শুধু বলিষ্ঠ আর বিচিত্র সাহিত্যই চাইছে না, বহির্মুখী চিন্তাকে আজ আবার কেন অন্তর্মুখী করবার জন্যে একটা অনুপ্রেরণা জেগেছে মানুষের। নির্জন গৃহকোণের শুদ্ধ ধ্যান মোহনতার যে শান্তি, যে সুরভি, যে সুখাবেশ তাকে মানুষ উপেক্ষা করছে বলিষ্ঠ আর বহির্মুখি বৈচিত্র্য দিয়ে কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবী আজ যেন আবার অন্তরের আত্মচেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চায়। মানুষের মনের এই দাবীকে মিটাতে হলে শুধু বলিষ্ঠ আর বিচিত্র সৃষ্টি হলে হবে না। সে সৃষ্টিকে করতে হবে শান্ত এবং সম্মানিত, সে হবে লোক সাহিত্য শুধু নয়, লোকাত্তর সাহিত্যও, তার আবেদন আজকের শুধু নয়, আগামী শতাব্দীরও। তার আনন্দ আধুনিক নয়, অনন্তকালের। আমার মনে হয়, মাটির কাছাকাছি আছেন যে কবিগণ তাঁরা অন্তরকে উদঘাটিত করে অন্তরকে নন্দিত করবেন, আনন্দিত করবেন রস পিপাসুদের।

সুন্দর! হাততালি দিল কয়েকজন। বসে পড়ল মহেন্দ্র, কিন্তু মাধুরীর তীক্ষ্ণ চক্ষু কুমারের এই প্রস্তাব, মাধুরীর বুঝতে মুহূর্ত সময় লাগেনি, কিন্তু ঐ ছোট লোকটা জব্দ হয়ে গেল! শান্ত সুন্দর হাসি ফুটলো মাধুরীর মুখে, অতঃপর সভাপতির অভিভাষণের পর জলযোগার ভুরি পরিমাণ আয়োজন। মহেন্দ্র সঙ্গে আলাপ করলেন তাঁরা এবং বললেন, মহেন্দ্রর সংক্ষিপ্ত ভাষণ সুন্দর হয়েছে। মাধুরী তাকালো কুমারের দিকে কিন্তু কুমার তখন কাটলেটখানা কাটতে ব্যস্ত! পাশে বসা ডেইজীকে অনুচ্চস্বরে কি যেন বলছে। ডেইজী ওর বান্ধবী। টেনিস খেলার সঙ্গিনী এবং ওদের পাড়াতেই বাস করে বছর চব্বিশ বয়স এখনও বিয়ে হয়নি। সাহিত্যিকরা আহারাদি করে চলে গেলেন মহেন্দ্র মাধুরী ওদের এগিয়ে দিল।

তারপর মহেন্দ্র গেল নিজের ঘরে, মাধুরী গেল মার পূজার ঘরে? ওখানে টেনিস খেলোয়াড়দের আলোচনা সভায় ওরা আর ফিরে এলো না। কুমারদের দল আশা করেছিলো ওদের ফেরাবার কিন্তু কৈ, অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। অতএব ওরাও উঠলো।

কুমারের অন্তরটা কেমন যেন বিষাদিত হয়ে উঠেছে। ঐ নগন্য একটা যুবক, বিদ্যাহীন, স্বাস্থ্য, সামাজিকতাহীন একটা তুচ্ছ ব্যক্তি কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ কি তার কাছে হেরে যাবে? কিন্তু হারালো কোথায় নিজেকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করতে করতে কুমার গিয়ে গাড়িতে উঠলো, পাশে ডেইজী, গাড়ি চলে যাচ্ছে।

ডেইজী বলল, ছোকরাটা কে? ঐ শেষে বক্তৃতা দিল?

ওদের বাড়ির একটা পরগাছা। চাকরির জন্য বসে আছে?

ছেলেটা বেশ বলতে পারে তো।

হ্যাঁ এবার কংগ্রেস নির্বাচনে ওকে কাজে লাগাব—

আপনি দাঁড়াচ্ছেন নাকি?

দাঁড়াব, ওকে প্রোপাগাণ্ডার জন্য নিযুক্ত করতে হবে।

ভালো হবে, ওর বুদ্ধি আর বলবার ক্ষমতা দুটোই আছে।

তৃতীয়টা নেই, বলে মোড় ফেরালেন গাড়িটাকে কুমার।

সেটা কি?

বল। শারীরিক শক্তি, বলে আপনাদের সবার সুপুষ্ট হাত দিয়ে ষ্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছেন কুমার সাহেব, গাড়িটাকে অনাবশ্যক জোরে চাপিয়ে দিলেন।

সাহিত্য বাসর শেষ হওয়ার পর মহেন্দ্র নিজের ঘরে এসে বসল, ভাবতে লাগলো সে তো বেশ বলতে পারে। অল্পক্ষণের জন্য হলেও কথাগুলো সে খুব মন্দ বলেনি? নিজেকে এতোখানি অসহায় ভাববার কোনো কারণ নেই, তার ভেতর এমন একটা শক্তি রয়েছে যে তাকে সকল সাহায্য করছে। নিজের এই শক্তিটা সম্বন্ধে সে কোন দিন সচেতন ছিল না, এ যেন তার কাছে একটা আবিষ্কার। কিন্তু উৎফুল্ল হতে পারলো না মহেন্দ্র। তার বক্তৃতা মাধুরী ওকে আক্রমণ করবে, অথবা একান্তভাবে এগিয়ে যাবে ও বিশেষ কোন কথাই তুলবে না। মাধুরীর মনের গঠনটা এতটা অদ্ভুত কেন হোল, বুঝতে পারে না মহেন্দ্র। এ বাড়িতে আরো তো অনেক আছেন, কিন্তু মাধুরী এদের মধ্যে থেকেও যেন স্বতন্ত্র, ওর সঙ্গে এদের কারো মেলে না।

মাধুরীর মনে মহেন্দ্রর বক্তৃতা কি কাজ করেছে, ভেবে আবিষ্কার করা সম্ভব নয় মহেন্দ্রের পক্ষে। তার সঙ্গে দেখা হলে তখন বোঝা যাবে, তাই মহেন্দ্র কাব্য পাঠ আরম্ভ করে দিল। এখানে আসার পর থেকে ওর পড়াশোনার সুবিধা হয়েছে প্রচুর, সঙ্গীত চর্চার ও সুযোগ মিলেছে, কিন্তু ওর যেটা সারা মনপ্রাণ দিয়ে চাইছে, সেই চাকরি এখনো পায়নি। টাইপ রাইটিংটা শিখছে মহেন্দ্র, তার সঙ্গে বুক কিপিংও। হয়তো চাকরি তার একটা শিঘ্রী হয়ে যাবে, কিন্তু এ বাড়ির কেউই তার চাকরির জন্য বেশি মাথা ঘামায় না, শুধু মাধুরীই বলে মাঝে মাঝে চটপট কাজ শিখে ফেল চাকরি করতে হবে তোমার——

মহেন্দ্র রবীন্দ্রকাব্য পড়ে প্রতিটি পংক্তির ব্যঞ্জনা রসাপ্লুত করে বিস্মিত বিমুগ্ধ করে তোলে, গড় গড় করে তাই সে পড়ে না ধীরে ধীরে রস আস্বাদন করে পড়ে, এটা ওর বরাবরের স্বভাব, কিন্তু অত ধীরে পড়ায় অপর কাউকে শোনানো যায় না তাই মাধুরী বলে–

আবৃত্তি তোমার দ্বারা হবে না মহিনদা–

না হোক, আবৃত্তির জন্য কাব্য হয়নি, বলে মহেন্দ্র পড়ে চলে।

কি জন্য তবে লেখা হয়েছে? প্রশ্ন করে মাধুরী।

রসপিপাসুর অন্তরকে পরিতৃপ্তি করতে, কাব্য সকলের জন্য নয় মাধুরীর, বিমুগ্ধ জনই কাব্য সম্ভোগ করতে পারে, দেবীর করুণা, কাব্য ব্যতীত অনুভব হয় না।

যথা? মাধুরী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুধোয়। যথা, অন্তর হচ্ছে আহরি বচন, আনন্দ লোক কবি বিচরণ কবির এই যে কথাটায় একটি আনন্দলোক রচিত হয়েছে, পৃথিবীর কটা মানুষ সেখানে পৌঁছাতে পারে বল তো?

আমি তো কোন লোকই খুঁজে পাচ্ছি না, না আনন্দ, না নিরানন্দ, তবে ভাষার তুবড়িবাজী দেখা যাচ্ছে, মাধুরী তর্ক করতে চায় মহেন্দ্রকে রাগিয়ে। ঐ জন্যেই তা অরসিকেষু রহস্য নিবেদন,. করতে মানা বলে মহেন্দ্র পাশ কেটে একেবারে চুপ মেরে যায়, কিন্তু মাধুরী তখনো গুঞ্জন করতে থাকে আপন মনে।

অরসিকের মধ্যে রস না আনতে পারলে কবিতা হোলো না, হোলো কচুপোড়া বেগুন ভোজন করার লোক, আর বেলফুল উপভোগ করার মধ্যে তফাৎ আছে মাধুরী।

অর্থাৎ আমি বেগুন বিলাসী আর তুমি বেলফুল বিলাসী, দুটোরই কিন্তু জন্ম এক জায়গায়, মাটিতে, অতএব এখানে আমরা আত্মীয়, কেমন?

হ্যাঁ, যেন অন্নের সঙ্গে সম্পর্ক কদলী পত্রের, সৌন্দয্যের চপট ভরে না, তার উপর ভাতের কাঁড়ি দরকার। বেলফুলে পেট ভরে না বেগুনও চাই, চাই——ই।

চাকরির চেষ্টা কর, রোজগার কর, তারপর কথা হবে।

এরকম তর্ক হয় ওদের মধ্যে।

আজও সভাভঙ্গের পর মহেন্দ্র নিজের ঘরে এসে পড়তে বসেছে। রবীন্দ্রকাব্য মনটা রক্তাপ্লুত হয়ে উঠেছে, সুতরাং অন্য চিন্তা ভুলে গেছে মহেন্দ্র, বিশ্ব যেন ওর কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, জেগে আছে, এক কবি অন্তরের।

অনাস্বাদিত অনুভূতি আনন্দের জ্যোতির্ময় রূপায়ন, মহেন্দ্র পড়ছে।

নিঃশব্দ চরণে ঊষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে দাঁড়িয়ে একাকী, রক্ত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে।

উষা নয় আমি বড়বৌদি, উষার আসতে দেরী আছে। এই রাত মাত্র দশটা।

ওঃ মহেন্দ্র হাসলো এই বিঘ্ন ওর ভাল লাগেনি, কিন্তু কিছু বলার নেই। এ ওদের আশ্রিত, কিন্তু বড়বৌ বুঝলো, হেসে বললো—

খেতে ডাকতে এলাম ঠাকুরপো, চল, কি এমন মশগুল হয়ে পড়ছিলে? বই ওটা? উষা অনিরুদ্ধ?

না বৌদি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন থেমে গেল মহেন্দ্র।

কি বলেছেন? প্রশ্ন করলো বড়বৌদি হেসে।

কি অপরূপ কথার ব্যঞ্জন। বৌদি বলেছেন রাত শেষ হয়েছে ভোর হল পূবাকাশে লাল হলে উঠছে আলো এতগুলো বলেছেন তিনি—

বেশ তো বলেছেন, তোমার বৌদি এসে ঐ রকম বলবে, খাবে এসো।

শুনুন বৌদি, কি অপরূপ কথার ব্যঞ্জন ওভাবে কথাগুলো তিনি বলেন নি, বলেছেন—

নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের তৃপ্তির দুয়ারে দাঁড়ায় একাকী। রক্ত অগুণ্ঠনের অন্তরালে।

না, বৌদি অবগুণ্ঠন মানে ঘোমটা, ভোরের আকাশকে তিনি অবগুণ্ঠনের সঙ্গে—কিন্তু মহেন্দ্র দেখতে পেল, দরজার প্রান্তে মাধুরী প্রদীপ্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে কথাটা আর শেষ করতে পারলো না। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি বললো থাক বৌদি, চলুন খেতে দেবেন বলে বইটা রেখে উঠে পড়ল।

মাধুরী নিঃশব্দ পদসঞ্চার কখন চলে গেছে, দেখতে পেল না আর। খেয়ে এসে মহেন্দ্র শোবে। দেখলো বিছানার চাদরখানা ঝেড়ে পেতে দিচ্ছে মাধুরী। নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে থাকলো মহেন্দ্র। মাধুরী কাজ শেষ করে বলল।

শোও, যেখানে সেখানে যা তা কথা বলা বন্ধ করো তুমি।

কেন? কি বললাম। ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্র তাকালো ওর পানে।

অত ভয় পাবার কিছু নেই, উলুবনে মুক্তো ছড়িও না। বুঝলে তোমার এই কাব্য ব্যঞ্জনা বড়বৌদি কি বুঝবেন? তিনি মা জাতীয় জীব। তাঁর সমস্ত শরীর মন ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করে জেগে আছে শুধু মাতৃত্ব ওখানে উষার অভিসারের কথা একেবারেই অবান্তর! নিঃশব্দে চরণে উষা আসছে তোমার কাব্য মণিকোঠার দরজা ঠেকতে এ ব্যাপারে ওকে কোনদিন বোঝান যাবে না তোমার পেটের দরজা উনি খুলতে পারে। শোও।

চলে গেল মাধুরী মহেন্দ্র তার পেছনটা দেখলে ওকে তো এখন আর ডাকা যাবে না। ও পতিভক্তিতে সেটা প্রকাশ হচ্ছে কিন্তু মহেন্দ্র কে জিজ্ঞেস করতে তীব্র ইচ্ছা জাগিছিল। উষার এই অভিসারের কথা মাধুরী কতখানি বুঝেছে। কাব্য লিখে আনন্দ পূর্ণ হয় না পড়েও হয় না যদি কোন অনুভূতিশীল শ্রোতার সঙ্গে সে রস বন্টন করে ভোগ করা যায়। মাধুরী কি অপূর্ব রস উপলব্ধি করতে পারে?

পারে তার কথাতেই সেটা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মাধুরীর মনে গভীর জটিলতা অতল বারিধির তলদেশের মতই স্তব্ধ নিথর।

কি ভাবলো নিজের চিন্তাটা নিজেই যেন বুঝতে পারছে না মহেন্দ্র ওর মতে অন্য কেউ যেন চিন্তা করছে ওর সম্বন্ধে সে সর্বশেষ জানে, এবং অনেক বেশি জানে কে সে। মহেন্দ্রর অন্তরাত্মা হয়তো।

ধীরে ধীরে বিছানায় এসে শুলো মহেন্দ্র। ঘুম আসতে হয়তো দেরী হবে, কিন্তু না, অতি অল্প সময়েই মহেন্দ্র ঘুমের মধ্যে কত কি স্বপ্ন দেখে। সে আজ কিন্তু কিছুই দেখলো না কেমন একটা নীবিড় সুশীতল ঘুম, উঠেই দেখল সকাল। সকালেই টাইপ যন্ত্রণা কিছুক্ষণ অভ্যাস করে মহেন্দ্র, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিল তারপর অফিস ঘরে এসে টাইপ করতে বসল। কতক্ষণ কেটেছে কে জানে? অকস্মাৎ মহেন্দ্রের মনে পড়ল, আজ সকাল থেকে এত বেলা অবধি মাধুরীকে একবারও দেখা যায়নি। এমনটি তো হয় না।

প্রতিদিন যার সঙ্গে দেখা হয়, কোনো একদিন তার সঙ্গে দেখা না হলে মনের কোণায় যেমন কাঁটার মত ব্যাথা বোধ হয়, মহেন্দ্রের তেমনি হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় অফিসের মেমসাবটি একবার মহেন্দ্রকে দেখে প্রশ্ন করলো— তুমি কতটা শিখলে বাবু, চোখ বুজে টাইপ করতে পার? ভাষাটা ইংরেজি? না বলে মহেন্দ্র আবার বললো চোখ বুজে টাইপ করতে অনেক দিন লাগবে। নাও, তোমার কাজ কর, বলে মহেন্দ্র যন্ত্রটা ছেড়ে উঠলো। মনের মধ্যে এমন একটা উদাস ভাব জেগে রয়েছে, যেন কিছুই আর করবার নেই। এখানেই খবরের কাগজ রয়েছে, মহেন্দ্রের চোখ দিতেও ইচ্ছা করল না, বুককিপিং শিখবার জন্য কিছু পড়া দরকার, সেদিকেও মন গেল না, করবে কি সে এখন? কেন মনটার অবস্থা এতো করুণ হয়ে উঠলো ভাবতে গিয়ে মহেন্দ্র বুঝতে পারল আজ দুইদিন দাদা বৌদির চিঠি পায়নি, খোকনের কোন খবর পাওয়া যায়নি। এতোগুলো দিন পার হয়ে গেল খোকনের কথা ভাবেনি মহেন্দ্র এর থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার ওর জীবনে কিছু হতে পারে না। নিজেই সে আশ্চর্য হয়ে গেল, কি এমন রাজকার্যে ব্যস্ত ছিল যে তার একান্ত স্নেহ—পুত্তলীর কথা সে ভুলে গেছে? আর চিঠিই বা আসলো না কেন!

ভেবে দেখলো এই ক'দিন সকাল বিকাল টাইপ করার অভ্যাস করছে আর সন্ধ্যায় থিয়েটারে, সিনেমা, নাচ, গান শুনে কাটিয়েছে। রাত্রে ফিরে পড়েছে কাব্য না হয় উপন্যাস। গভীর রাত্রে সঙ্গীত সাধনাটাও ক'দিন হয়নি, কারণ ঘুমিয়ে গেছে। এভাবে জীবন কাটলে তো তার চলবে না তাকে খাটতে হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বড় লোকের বাড়িতে আগাছা পরগাছা হয়ে পরমানন্দে দিনযাপন করতে মহেন্দ্র কলকাতায় আসেনি। নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মহেন্দ্র উঠে এসে খবরের কাগজের ওয়ানটেড কলাম দেখতে লাগলো। খুঁজে খুঁজে কয়েকটা চাকরীর জিজ্ঞাপন বের করলো, তারপর গোটা পাঁচেক দরখাস্ত বিভিন্ন জায়গায় পার করে দিল ডাকে, অবশ্য ওই সঙ্গে দাদাকেও একটা চিঠি লিখলো খোকার খবরের জন্য। সব শেষ করে সে যখন স্নান করে এলো, তখন বেলা দেড়টা। বড় বৌদি বলল—ব্যাপার কি ঠাকুরপো, আজ কি এমন দরকার ছিল?

এমন দরকার ছিল—ছিল বৌদি, দরখাস্ত লিখলাম চাকরীর জন্য।

চাকরী—বলে বৌদি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো, খানিক পর বললো তা বেশ তো।

মাসখানেক অতীত হয়ে গেছে, মহেন্দ্র আবার পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছে কিন্তু এ টাকাও তার রোজগারের টানা না, উমেশবাবুর দান। দেবেন্দ্র নিঃশব্দে সই করে নিয়েছেন টাকাগুলো নিরুপায় হয়ে। কিন্তু দারিদ্রের অসম্মান আহত হয়েছে বার বার। শ্বশুরের ভ্রাতৃপ্রতীম কোন বন্ধু অসময়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করেছে, এতে তার মনঃপীড়া হবার কিছু সে খুঁজে পায়না, কিন্তু স্বামীকে সে চেনে দেবেন্দ্র যে এই সাহায্য নিতে চাইছেন না, এটা ভালোই জানা আছে আপনার। তবু নিয়তির কাছে মানুষ এতোই নিরুপায় যে এই সাহায্য হাত পেতে নিতে হচ্ছে, এবং মহেন্দ্রকে চিঠি লিখে জানানো যাচ্ছে না এরকম সাহায্য যেন সে না দেয়, কারণ সে চিঠি উমেশবাবুর হাতে পড়তে পারে। তথাপি দেবেন্দ্র ঠিক করলেন মহেন্দ্রকে তিনি লিখে জানাবেন, চাকুরী যদি সে না পায় তো অবিলম্বে বাড়ি ফিরে আসুক। কিন্তু নিজে লেখা সম্ভব নয়, দয়ালকে দিয়ে, লিখতে হবে। খোকনকে ডেকে বললেন, তোর দয়াল দাদাকে ডেকে আনতো খোকন বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই জন পাঁচ ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন বাড়িতে। গ্রামেরই লোক, দেবেন্দ্র স্বাগত আহ্বান জানালেন। এখন আর চিঠি লেখানো হবে না। তাই দয়ালকে ডাকতে নিষেধ করলেন দেবেন্দ্র। খোক বেঁচে গেল। কাকু চার পাঁচদিন পরে আসবে বলে আজও এলোনা। মর্মান্তিক দুঃখ ভুলতে পাচ্ছিল না ছেলেটা। বাবার কাছে থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকে, শুধু গান শিখবার সময় বাবার কাছে যায়, মুখে মুখে গান ভালই শিখেছে সে।

ভদ্রলোক কয়েকজন এসে প্রস্তব করলেন এই গ্রামে তারা একটা চতুষ্পাঠি খুলতে চান। আপাততঃ গ্রামের লোকই চাঁদা দিয়ে সেটা তারা চালাবে এবং সরকার থেকে

বৃত্তি পাবার চেষ্টা করবে। আর চতুষ্পাঠি চালাতে হলে যোগ্যতম ব্যক্তি দেবেন্দ্র। পাঁচটি ছাত্র পাওয়া গেছে গ্রামের পাঁচজনের বাড়িতে তারা খাবে এবং দেবেন্দ্রর ভিটার পশ্চিমদিকে যে বড় কুঠুরীটা আছে, ওই খানে থাকবে আর পড়বে। এই ঘরটাতেই এই বংশের মৃদঙ্গ সেতার তানপুরা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে।

প্রস্তাবটা সুন্দর, উদার এই মানুষটির হৃদয় উচ্চ, এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু দেবেন্দ্রর মনটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এই বাড়িতেই টোল ছিল, ছাত্ররা এই বাড়িতেই অন্ন এবং বিদ্যালাভ করতো, আজ সেটা চালাবে গ্রামের লোক উপরন্তু চাঁদা করে মাইনেও দেয়া হবে দেবেন্দ্রকে। তাঁর দৃষ্টি হীন চক্ষু থেকে জল বেরুতে চাইছে, কিন্তু সামলে নিলেন, বললেন প্রস্তাবটা খুবই ভাল নরেশ এতো বড় গ্রামের যোগ্য প্রস্তাব কিন্তু—কিন্তু কি বলুন? নরেশ শুধাল না।

আমার কি আর অত খাটবার সমর্থ হবে ভাই?

সে কি। আপনি এমন কিছু বুড়ো হয়ে যাননি।

না, না, পারবো কি করে চোখ যার নেই, পড়ানো কি তার পক্ষে সম্ভব?

হ্যাঁ সে কথা আমরা ভেবেছি, কিন্তু আপনাকে সাহয্য করতে মাধুবী থাকবে ও তো ব্যাকরণতীর্থ। আর সন্ধ্যেবেলা ঐ ঘরে সঙ্গীত চর্চা হবে, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, আমরা আজই ওই তবলা মৃদঙ্গ সেতারগুলো সারিয়ে আনছি, আপনি আপত্তি করবেন না দেবু দা আমরা অনেক আশা নিয়ে এসেছি।

আপত্তি করবার মত মনের জোর খুছে পাচ্ছে না দেবেন্দ্র। আজ যদি খবর পেতেন মহীন ত্রিশ টাকার কোন কাজে ঢুকেছে, মাসে দশটা টাকা দিতে পারবে তাহলে তিনি গ্রামের চাঁদায় নিজের পেট চালাবার কাজে সম্মতি দিতেন না। কিন্তু এখন ওসব ভেবে লাভ নেই, মহীনকে তিনি বাড়ি ফিরতে চিঠি লিখে দেবেন। বড় লোকের বাড়ির রাজভোগ খেয়ে ছেলেটি বয়ে যাচ্ছে হয়তো।

নরেশের দল পাশের ঘরে গিয়ে সেতার তানপুরাগুলো তুলে নিল তারপর হৈ হৈ করে চলে গেল বাজারে। ওদের উৎসাহ বিপুল, উদ্যম অসাধারণ। কিন্তু দেবেন্দ্রর মন ক্ষুণ্ন হয়েই রইল তার পিতৃপুরুষের পবিত্র বস্তুগুলিতে অপরের সংস্পর্শ তিনি ঘটাতে চাননি তাই কিন্তু ঘটলো। ঘটুক বিধাতার ইচ্ছা। তিনি যেন আত্মসমর্পণ করলেন ভাগ্যের কাছে, ভাবলেন মানুষের শক্তি কত ক্ষুদ্র কত অসহায়তার অধীন। কিন্তু খোকনের আনন্দ ধরছে না। বাড়িতে গানের আসর হবে, নিত্য গান বাজনা চলবে কত কি আলাপ হবে, রাগ রাগিনী শিখতে পারবে। আঃ কাকু যদি বাড়ি থাকতো। কিন্তু ওই সঙ্গে একটা টোলও নাকি হবে। সেটা কি বস্তু, খোকনের জানা নেই। সেখানে নাকি ছাত্ররা পড়তে আসবে, খুব বড় বই পড়ানো হবে নিশ্চয়। ভাবতে ভাবতে খোকন ভেতরে এলো। ওর মা রান্নাঘরে, কিন্তু সেও শুনেছে। বাইরের আলোচনার কথা খোকনকে বললো।

এবার গান শিখবার খুব সুবিধা পাবি, বুঝলি।

হ্যাঁ মা, কিন্তু ওই যে টোল নাকি খুলেছে, ওটা কি?

ওটা পাঠশালা, তোকে ওখানে পড়তে হবে না।

ওটা কি জন্য হবে তাহলে?

সরকারী বৃত্তি পেলে কিছু হবে বাবা।

খোকন অতকিছু বুঝল না নিঃশব্দে চলে গেল পুকুর পাড়ের দিকে। কাকু যে কেন এতো দেরী করছে কে জানে? ওর বটের বেদীটা ভেঙ্গে গেছে, আবার তৈরি করতে আরম্ভ করলো আর একটু বড় করে।

অর্পণা রান্নাঘরেই ছিল স্বামীর কাছে কি একটা দরকারে আসছে কিন্তু দরজার কাছে এসেই দেখলো দেবেন্দ্র দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে বসে দৃষ্টিহীন চোখ থেকে জলধারা গড়াচ্ছে। অর্পণা বিস্মিত হয়ে থেমে গেল। কি হোল কেন উনি কাঁদছেন।

কে? অর্পণা। দেবেন্দ্র সামান্য সাড়া আন্দাজ করেই বুঝতে পারেন।

হ্যাঁ, কি হলো? কাঁদছো।

না। চোখ মুছছেন দেবেন্দ্র ও কিছু না? একটু থেমে আবার বললেন, এই পরিবারের উপর একটা অভিশাপ রয়েছে অর্পণা।

ও মা কেন? কার অভিশাপ।

সঙ্গীতের ইষ্টদেবীর। এই বংশের রাগসিদ্ধ হয়ে এতো অহংকারী হয়েছিলেন সে এক দরিদ্র সঙ্গীত শিল্পীকে সামান্য ভুলের অপমান করে তাড়িয়ে দেন। চোখের জলে তিনি অভিশাপ দিয়ে যান, ওই সিদ্ধ যন্ত্র কলঙ্কিত হবে। তারপর থেকে এই বংশের অকালমৃত্যু আকস্মিক মৃত্যু অন্ধতা কিছু না কিছু লেগে আছে।

না ছিঃ ওসব রূপকথার গল্প অভিশাপ কেন থাকবে। ওসব কেন যে তুমি ভাবো।

নানা জায়গায় দরখাস্ত করেছে মহেন্দ্র কিন্তু কই কোন জবাব তো এলো না। অবশ্য আসবার সময় পার হয়ে যায় নি। ইতিমধ্যেই টাইপ করাটা আরো ভাল করে রপ্ত করে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অফিসের অন্যান্য কাজও করছে।

চাকরিতে ঢুকবার আগেই দাদাকে সে টাকা পাঠাতে পারছে, এটা ওর পক্ষে খুবই আনন্দের ব্যাপার হতো, কিন্তু দাদাকে সে চেনে। ওই টাকা কয়টা দান যে গভীর দুঃখের সঙ্গে হাত পেতে নিতে বাধ্য হন, মহেন্দ্রের তা অজানা নয় উপায় কি? ছেলেটা না খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিল আর এই আশ্বিন কার্তিক মাসে রাজার ভান্ডারও খালি হয়ে যায়, নতুন ধান না উঠা পর্যন্ত ঘরে হাঁড়ি চড়ার কোনো উপায় নাই যদি বাজার থেকে চাল না কেনা হয়। শহরে অবশ্য সর্বত্র রেশন, কিন্তু পল্লীতে চাল কিনতে গেলে মহেন্দ্র অনেক ভেবে উমেশবাবুর এই দান গ্রহণ করেছিল।

প্রায় মাসখানেক ওর কাটলো এ বাড়িতে। কলকাতায় অনেক কিছু শিখে ফেলেছে মহেন্দ্র। রেষ্টুরেন্টে বসে কাঁটা চামচেতে খাওয়া, সেলুনে গিয়ে চুল ছাটাই করে আসে আর চলতি ট্রামে লাফিয়ে উঠা শিখতে দেরী লাগলো কারণ মন প্রাণ দিয়ে এসব ও পছন্দ করে না।

ঘোড়া দৌড় ক্রিকেট খেলা এবং এ জাতীয় ব্যাপারগুলো দুর্বোধ মহেন্দ্রের কাছে। কিন্তু সে দেখতে পায় এ বাড়িতে সবাই খেলাধুলা নিয়ে খুবই মাতামাতি করে। এমন কি খবরের কাগজের খেলার রিপোর্ট নিয়েও ওদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। রেডিও খুলে সবাই বসে থাকে, কোথায় কি খেলা হচ্ছে তার খবর শোনার জন্য।

যুদ্ধ কবে শেষ হয়েছে, এখানো দেশের লোকের হাতে টাকা কিছু রয়েছে—যাকে বলে ইনফ্লমেশন—কিন্তু সে আর কদিন? কিন্তু এতো কথা লোকে ভাবছে না। জিনিষ পত্রের দাম অনেক চড়া কিন্তু বিক্রি কম হয় না, কারণ হাতে পয়সা রয়েছে। মানুষ হন্যে হয়ে খেলার মাঠে টিকেট কেনে, সিনেমায় যায়, মদ খায় এবং আরো কত কি করে টাকার গরম এমনিই মহেন্দ্র এসব দেখে শুধু লিখে রাখে তার দিনলিপিতে। এই আর্থিক উদ্বায়ী বৃত্তি, এই আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের ব্যধি এই আত্মকেন্দ্রিকতার ভয়াবহ পরিণাম মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। কিন্তু ওর এসব ভেবে লাভ কি? তবু মহেন্দ্র ভাবে। ওর চিরন্তনশীল মন না ভেবে পারে না। গভীর রাত্রে ওর ভাবনাগুলি লিখে রাখে দিনলিপির পাতায় অত্যন্ত গোপনে সে লিখে এই দিনলিপি, মাধুরীও জানে না এই লেখার কথা। ও আজ লিখছে কিছুতেই সে ধনী পরিবারের সাথে নিজেকে মেলাইতে পারছে না। ও যেন বাতাসে উড়ে আসা একটা ঘুড়ি, এই বাড়ির ছাদের কার্নিশে তার সুতোটা আটকে গেছে, তাই ও এখানে উড়ছে কিন্তু জানে ঐ ক্ষীণ সূত্রটুকু ছিঁড়ে যাবে আর মহেন্দ্র গিয়ে পড়বে কোন সুদূর আকাশে। সেখান থেকে হয়তো এ বাড়ির চিলে কোঠাটা নজরে পড়বে না কিন্তু সত্যি কি তাই, এ বাড়ির সব স্মৃতিই কি সে ভুলতে পারবে? না দীর্ঘ দিনের দেখা আবছা স্বপ্নের মত মনে থেকে যাবে একথা—এ স্মৃতি এর মায়া। কিন্তু মহেন্দ্র এই মায়ার শৃঙ্খল অবিলম্বে কাটাতে চায়। কেন? জানে না মহেন্দ্র ওর চিত্তে যেন অহরহ তাগিদ দিচ্ছে সারা, সরে যাও মহেন্দ্র এতখানা অসামঞ্জস্যের মধ্যে থাকলে মানুষ্যত্বের মহিমা খর্ব হয়, ক্ষুণ্ন হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু এবাড়িতে মহেন্দ্র কয়েকটা বিশেষ সুবিধে পেয়েছে যা অন্যত্র দুর্লভ। পড়বার জন্য প্রচুর পুস্তক আর গানবাজনা শিখবার জন্য বহু রকমের যন্ত্র এবং অখন্ড অবসর

ঘন্টা দুই তিন টাইপ শেখা, আর অফিসের কাজ শেখা ছাড়া তার আর কর্ম নেই। বিকালে মাধুরীর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, কিন্তু তাও হয় কোনো সঙ্গীতের আসরে না হয় সাহিত্য আসরে অথবা শিল্পকলা কেন্দ্র বা ঐরকম কিছু একটা দেখতে। অকারণে মাধুরী তাকে কোথায় নিয়ে যায়।

সেদিন ঘরোয়া সাহিত্য আসরে যে কয়েকজন সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁদেরই একজন আজ লেখা চাইলেন মহেন্দ্রর কাছে। মাধুরী সেখানে ছিল না, থাকলে মহেন্দ্র লজ্জায় মরে যেত কারণ সেদিন সেই আলোচনার পর মাধুরীর সঙ্গে আর কোন কথা হয়নি এ সম্বন্ধে মতটা মাধুরী কিভাবে নিল আজো জানে না মহেন্দ্র। এই ভদ্রলোক তার সাপ্তাহিক কাগজের জন্য লেখা চাইলেন অতিশয় সঙ্কোচের সঙ্গে মহেন্দ্র একটা ছোট গল্প এগিয়ে দিল, বলল কে জানে চলবে কিনা। আপনার যদি ভাল না লাগে তো ছাপাবেন না, খারাপ জিনিস আমি ছাপতে চাই না। আচ্ছা আচ্ছা, সে ভার আমার। আপনার লেখা খারাপ হবে আমি বিশ্বাস করি না। না না, আমি নিতান্তই অব্যাপারী, থাক, সেদিন আপনার বানীতেই বুঝেছি কি আপনি, আর কেমন আপনি। আমার কাগজটা সাপ্তাহিক সিনেমার কাগজ কিন্তু তাতেও আমি চাই আপনার মত স্বাস্থ্যকর চিন্তাধারা পরিবেশন করতে। আপনি আগে পড়ে দেখবেন বলে সলজ্জে মহেন্দ্র নমস্কার জানালো। মাধুরী ব্যাপার কিছু জানলো না, মহেন্দ্র জানাল না তাকে। সে জানে মাধুরী ওসব পছন্দ করবে কিনা। হয়তো চোখ পাকিয়ে বলবে—রবীন্দ্র, বঙ্কিম, শরতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সাহস কম নয় বলবে লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় হল কি সব ছাই পাশ লিখতে শুরু করলে—মাধুরী ভাল বলবে এ রকম আশা করে মহেন্দ্র হয় খারাপ বলে, না হয় কিছুই বলে না। একেই তো মহেন্দ্র নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়ে থাকে এখন। তার ওপর প্রতি কাজে খুৎ ধরলে ও টেকে কি করে? অবশ্য আর কেউ কিছু ওকে বলে না—না ভাল না মন্দ? এমন কি অফিস ঘরে ওর যতক্ষণ ইচ্ছে থাকে, যখন খুশী চলে আসে কোন কৈফিয়ৎ নাই।

মহেন্দ্রের অসাহায়তার দিকে মাধুরীর সতর্ক দৃষ্টি অগাধ অপার্থিব করুণ আকর্ষণ করে দুর্বারভাবে এ যেন তার মাতৃমূর্তি কিন্তু মহেন্দ্রের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিতে মাধুরীর শাসন যেন রাজদণ্ড। সেখানে মাধুরী ক্ষমাহীন হয়তো হৃদয়হীনও। এই বিচিত্র অতলস্পর্শ শহরে পরে মহেন্দ্র নিজেকে যেন সামলাতে পারছে না।

কিন্তু চাকরীও একটা জুটছে না আর চাকরী জোগাড় করে নেবার জন্যেও কারুর মাথাব্যাথা দেখা যাচ্ছে না বাড়িতে। মহেন্দ্র আছে থাক বাড়ির একটা লোক যে সে? বাইরের কেউ এখন আর ধরতেই পারবে না যে মহেন্দ্র এ বাড়ির কেহ নয়। কিন্তু মহেন্দ্র নিজে সেই সত্যটা অনুক্ষণ অনুভব করে আত্মপরীক্ষা করে আত্ম—বিশ্লেষণ করে আপনাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে বলে তুমি এ বাড়ির কেউ নও মহেন্দ্র তুমি নিতান্ত গরীবের ছেলে তোমার পিত্র প্রতীম দাদা অন্ধ তোমার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র নাবালক তাকে মানুষ করতে হবে। পরের দানে নয় নিজের রোজগারের টাকায়।

কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ আরো দু'একদিন এসেছে মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখাও হয়েছে—

প্রশ্ন করেছে সে মহেন্দ্রকে কি করবে বা কি করতে চায় সে সম্বন্ধে। কুমার বেশি আসে না কারণ মেজদাই সস্ত্রীকে ওখানে যায়, টেনিস খেলতে বা ক্লাবে বেড়াতে কিন্তু আজ নাকি কুমার বাহাদুর এখানে আসবে তার আয়োজন চলছে।

এ পাড়াটা কলকাতায় বনেদী বাসিন্দাদের পাড়া। টেনিস খেলা বালীগঞ্জী ব্যাপার এখানে টেনিসকোড বসিয়েছে। বাড়ির কারো ওতে সম্মতি নেই, কিন্তু কিছু বললে গাছে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে, তাই সবাই চুপ করে আছে। মাধুরী বলে।

শ্যামবাজার শ্যামসুন্দরে ক্রীড়া ভূমি— এখানে গোচারণ হয় টেনিসে কেন? গরুচরবার জায়গা নষ্ট করে দিলে তুমি মেজদা।

কি করি বল—তোর মেজ বৌদির ঘুম হয় না— মেজদা বলে।

হবে কেন? ও তো আর গোপী নন গোপী গরবিনী রাধা ভাগ্যি কোথায় ওর? ও হোল সেই, মাধুরী থেমে যায়।

কি? কিরে ছোটদি—তাহলে কি? প্রশ্ন করে মেজো বৌ হাসে।
তুমি? মেজবৌদি গোপীনও। গোবরচনা নও। তুমি একেবারে গোবর—
ভালই তো, তোদের বাড়ি পবিত্র হোল ঘর নিকুষি।
হ্যাঁ—সে আর হতে দিলে কই। ঘুঁটো হয়ে উনুন জলছো যে! বলেই চলে যায় মাধুরী।
কিন্তু এসব তর্ক বিতর্ক, বাকবিতণ্ডায় ওদের অন্তরের স্নেহরস, কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। মাধুরী সকলের স্নেহপাত্রী, দাদারা ওর দোষ দেখে না বৌদিরাও দেখে না। ওকে ভালবেসেই যেন আনন্দ। ওর কথায় যেন সুরের ঝঙ্কার পায় ওরা, মেজবৌদি স্বামীকে বলল—
কথায় ওকে যে হারাবে, তার সঙ্গে ওর বিয়ে দেব।
এমন ছেলে আছে নাকি? আমি তো দেখিনি মেজদা বলে।
তাহলে বুদ্ধিতে যে হারাবে।
তেমনই বা কৈ?
কেন কুমার বাহাদুর।
তুমি ভুল করছো গোপী! কুমারের বুদ্ধিটা বৈষয়িক বুদ্ধি মাধুরী তার কাছ দিয়ে যায় না। ওর আদর্শবাদী মন কোথায় বাঁধা পড়বে কে জানে?
কুমার কিন্তু খুব আশা করে ওর সম্বন্ধে।
আমরা এক ফোঁটা করি না আর ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই আমরা করবো না।
বিয়ে দেবে না?
ওর ইচ্ছে হয় তো করবে আমরা এতগুলো ভাই ঐ এক ফোঁটা একটা বোন যা ইচ্ছে ওর করবে ও আমাদের বাড়িতে আনন্দ প্রতীমা।
বৌরা জানে দাদাদের এই মত। মা বাপের মত যাই হোক। দাদারা মাধুরীকে কোনদিন কিছু বলবে না। না হলে মহেন্দ্রের মত কোথাকার এক অশিক্ষিত ছেলেকে নিয়ে মাধুরী এতো মাতামাতি করছে কারও কি চোখে পড়ে না। আশ্চর্য।
কিন্তু এসব কথা বলতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়, মেজবৌ সেই দিন বাড়ির সকলের চক্ষুশূল হয়ে উঠবে। মাধুরীর মনে আঘাত দেবে বাবা বা তার দাদার কল্পনাতীত। দরকার নাই, পাঠা সে লেজ দিয়েই কাটুক, অতএব বৈকালিক অর্ভ্যথনার আয়োজন করতে লাগলো মেজবৌরাণী।
কুমার সাহেব আসবেন এবং আরেকজন কে বিশেষ ব্যক্তি আসবেন তার সঙ্গে অতএব আয়োজনও বিশেষ হওয়া দরকার। চায়ের টেবিলগুলো সাজাচ্ছে মেজবৌ, হঠাৎ মাধুরী অভিভুত হয়ে বললো—
বাঃ। মন্দ নয়। বড়দা বড়বৌদি হবে কর্তাগিন্নী ঘর সামলাচ্ছে তোমরা হলে খেলোয়াড় খেলোয়াড়নী, বাহির সামলাচ্ছ এরপর ছোটবৌদি যদি লক্ষ্ণৌ ঠুংরী হয়ে এসে সংগীতের আসরটা সামলান তো এ বাড়ি আর দেখতে হবে মানবলোক, দানবলোক, দেহলোক সব হয়ে যাবে ...।
তুই সাহিত্যের আসরটা সামলাবি তাহলে আরো কিছু হবে মেজবৌ রসিকতা করল। আর কি হবে। আর কিছু হবার নেই ঐ তিন লোকই সব—তিন লোকের তিন উপসর্গ অপবিদ্যা-অপবিদ্যাটা কে?
তুমি মেয়ে হয়ে খোলোয়াড় হচ্ছো এরপর গোঁফ গজাবে।
দুর মুখপুড়ি। মেজবৌ হেসে উঠলো—কিন্তু তুইও তো ভাল খেলতে পারিস ছোটদি। তোর গোঁফ গজাবে তাহলে।
না—আমি শুধু শিখে রেখেছি তোমার মতন বাতিকগ্রস্থ নই আমি যে এক দিন খেলা না হলে ঘুম হবে না। যাক আজ কোন মহাপুরুষ আসছেন? সে কুমাণ্ড তো? কুমাণ্ড কি করে? কুমার বাহাদুর আর মদ্রাজের আদিলিংগমঃ ভারত বিখ্যাত যাক। তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হোন, কিছু যায় আসে না, বর্তমান যুগটা উড়োখ্যাতির যুগ।
তার মানে? উড়োখ্যাতি কি?

মানে খ্যাতিটা আকাশে উড়ছে যে পার ধরে না, খেয়ালে খ্যাতি, খাওয়ায় খ্যাতি, স্নানে, সাঁতারে খ্যাতি, সৌন্দর্য খ্যাতি তাই সবাই এক এক দিক খ্যাতিমান। শুধু বীরত্বে, মনুষ্যত্বে করে কতটা খ্যাতি তাই জানা গেল না যাক আমারও গানের আসর আছে আজ! পিয়ানোটা একটু বাজিও বুঝলে, তোমাদের খেলা চুকলে আমার আসর।

মহেন্দ্র কোথায়? মহেন্দ্র ঠাকুরপো বলে গেছে, সে গেছে কোন অফিসের চাকুরি খুঁজতে।

ও। বলে মাধুরী আধমিনিট চেয়ে রইল। মেজবৌদির পানে তারপর বললে তোমার জানানোটা বাইরের ঢাকঢোল মেজবৌদি, মন্দিরের ভেতরের মৃদু ঘন্টাধ্বনি নয়, হলে তুমি মহেন্দ্র বলতে না মহীন বলতে। মা যা বলে বড় বৌদি যা বলে আদুরে নাম অধরকে স্নেহরসে সিক্ত করে, যার মধুর সৌরভ লুকানো যায় না, যাকগে। মহীনদা চাকরি পেলেই চলে যাবে তোমাদের আতঙ্কের কোনো কারণ নেই, তোমার কুমার বন্ধুরাই নাচবে এখানে।

চলে গেল মাধুরী। মেজবৌ নিমেশে চেয়ে রইল ওর দিকে অনেকক্ষণ। মহেন্দ্র সম্বন্ধে অতি অল্পতেই মাধুরী যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে যায় কেন?

কি এমন ঐ অজ পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ছেলের? রূপে এমন কিছু রাজপুত্র নয় যদিও দেখতে ভালই। বিদ্যা তো একেবারে মাধুরীর থেকেও কম গলাটা ভাল গাইতে পারে। কিন্তু তাইবা কি এমন শিখেছে? স্বাস্থ্য তো নাই—ই। কিন্তু ও আশ্রিত। মাধুরীর স্নেহসজল নারী মন মায়ের মত ওকে ঘিরে আছে সত্যি। তো মাধুরী নায়িকা শ্রেণীর মেয়ে নয়। ওর মাতৃরূপটাই সব সময় জল জল করে। বাড়ির দারোয়ান পর্যন্ত এ সংবাদ জানে। মেজবৌ নিজের কাজে মন দিল।

উর্বশী কাগজের অফিসে গিয়ে মহেন্দ্র শুনলো তার গল্পটা ছাপা হয়েছে অর্ধেকখানা বাকিটুকু এই সপ্তাহে বেরুবে আশাতীত আনন্দের সঙ্গে। আশাতীত সৌভাগ্য মহেন্দ্রের। সম্পাদক ওকে দক্ষিণা বাবৎ পনরটি টাকা দিয়ে বললেন কিছু মনে করবেন না, দুসংখ্যার জন্যই দক্ষিনা আর বেশি পারা যায় না, বাংলাদেশের পত্রিকা চালানো যে কঠিন ব্যাপার—

মহেন্দ্রের কিছুই বলবার ছিল না, টাকা পাবার আশায় সে করেনি। অত্যাধিক আনন্দটা কোনো রকমে অন্তরে চাপা দিয়ে মহেন্দ্র ধন্যবাদ জানালো এবং আর বেশি বিলম্ব না করে ঐ সংখ্যার দুখানা কাগজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সটান পোষ্ট অফিসের দিকে।

এ টাকা ওর নিজের রোজগারের টাকা এই ওর জীবনে প্রথম উপার্জন। স্বোপার্জিত এবং সুদুপায়ে অর্জিত এই অর্থ সে দাদার হাতে দেবে এর একটি পয়সা ও মহেন্দ্র নিজে খরচ করবে না।

মহেন্দ্র জানে উমেশবাবুর দয়ার দান দাদা কত কষ্টে গ্রহণ করেন। তিনি বাধ্য হচ্ছেন মনঃপীড়া ভোগ করছেন। কিন্তু মহেন্দ্রের অর্জিত এই অর্থ তো যতই সামান্য হোক তাকে অসীম আনন্দ দেবে।

পোষ্ট অফিসে গিয়ে একখানা কমল চেয়ে মহেন্দ্র চৌদ্দ টাকার মনিঅর্ডার লিখলো বাকি টাকার কয়েক আনা মনিঅর্ডার কমিশন। এই অর্থে সে আর কারো দানের ছোঁয়া লাগাতে চায় না কিন্তু এতটা শূচিব্যয়ুগ্রস্ত মহেন্দ্র না হলেও পারতো। হলো কিন্তু মহেন্দ্র!

টাকাটা পরশু গিয়ে পৌঁছাবে শনিবার দিন। দাদার অন্ধ নয়ন অশ্রুভরা হয়ে উঠবে টাকাটা পেয়ে। ভাবতে গিয়ে মহেন্দ্রের নিজের চোখ দুটো জল ভরা হয়ে উঠলো। একজন বয়স্ক ভদ্রলাক ওর মুখ পানে চেয়ে বলে উঠলেন কি হলো মশাই কাঁদছেন।

আজ্ঞে না, কিছু না বলেই সলজ্জে চোখ মুছে মহেন্দ্র রাস্তায় নামলো। নিজের মনে বলল মানুষের জীবনে, মর্মান্তিক দুঃখ যেমন আছে মর্মান্তিক সুখও তার চেয়ে কম নেই।

কিন্তু মহেন্দ্র ঘরে ফিরলো না শেষ টাকাটার বাকি কয়গণ্ডা পয়সা ওর পকেটে তাই

দিয়ে ও কিছু কিনবে খোকনের জন্য লাটিম না হয় বল না বাঁশি। মহেন্দ্র ফুটপাতের দোকানগুলোয় চোখ বুলিয়ে ফিরতে লাগলো।

আর একটা গল্প লিখতে হবে অনুরোধ ককরেছে সম্পাদক। কি লিখবে। ভাবতে মহেন্দ্র ঐ রকম ঘুরতে ঘুরতে বেশ বড় একটা প্লট যদি মাথায় এসে যায় তো—না না না। বড় প্লট বড় লোকের জন্য। দুনিয়ায় অধিকাংশ লোকেই গরীব মহেন্দ্র তাদের জন্য ছোট গল্প লিখবে। তার মতন এমনি কত দুর্ভাগ্য পীড়িত বাবা কাকা সোনার শিশুর জন্য দু'পয়সার তালপাতা ভেপু খুঁজে ফিরছে দিনান্তের মুখের একটু ফোঁটা হাসি দেখবার আশায় হয়তো সেই হতভাগ্য পিতা কোন ধনীর মূল্যবান মোটরের তলায়—

আহ হা। চার পাঁচজন লোক ছুটে এল অন্যমনস্ক মহেন্দ্র কলার খোসায় পা পিছলে ফুটপাতে পড়ে গেছে। দামী কোটখানায় কাদা লেগে গেল। একজন ধরে তুলে বলল খুব লেগেছে মশাই?

না তেমন কিছু না ধন্যবাদ উঠে দাঁড়ালো। লেগেছে বেশই কিন্তু তার জন্য মহেন্দ্রের তিলমাত্র আফসোস নেই। ওর তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল অন্তর আচ্ছন্ন করে খোকনের মধুর হাসি ভেসে উঠলো। হাত ধরা বরাবরের বলটাও ছাড়েনি, পড়ে গেলেও হয়তো ছাড়বে না। মহেন্দ্র উঠেই চলে গেল।

আঃ এই পরম তৃপ্তির কথা সে পাঠককে জানাবে। তার অতি ক্ষুদ্র জীবনের অতি তুচ্ছ অনুভূতির অপরূপ সুষমা সে কি সঞ্চারিত করতে পারবে না পাঠকের অন্তরে? দরিদ্র কেরানী পিতা মাসের শেষে মাইনে পেয়ে দু'পয়সার লজেন্স কিনে নিয়ে তার ছোট খুকুটার জন্য সে কি জীবন নয়, তাতে কি মাধুর্য নেই তার কি অমৃতস্বাদ অনুভব করবার মত অন্তর সৃষ্টি করে নেবে মহেন্দ্র শিল্পীর দরদ দিয়ে?

মহেন্দ্র স্টান শ্যামবাজারে ফিরে ঘরে ঢুকলো লিখবে কিন্তু লেখার এটা সময় নয় শীতের বিকাল এক্ষুনি হয়তো ডাক পড়বে চা খেতে কিংবা বেড়াতে যেতে। থাক রাত্রে লেখা যাবে।

মহেন্দ্র মেজদা ওর ঘরে ঢুকে ডাক দিল। এরকম খুব কমই হয়।

আজ্ঞো। মহেন্দ্র জবাব দিয়ে তাকালো ওর পানে। মেজদা বলল—

আজ কুমার আর তাঁর এক বন্ধু আসবেন বাড়িতে থেকো বেরিও না। তিনি একটা কাজ জোগাড় করে দিবেন বলছেন, বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে মহেন্দ্র কিযে ভাবছে। মেজদা চলে গেল।

মহেন্দ্র ভাবছে তো ভাবছেই। কি যে ভাবছে ঠিক নেই। ওদিকে এক এক করে কয়েকখানা গাড়ি ঢুকলো টেনিস লনে, কুমার ইত্যাদি বসলেন, বেতের চেয়ারে। একটা চাকর এসে মহেন্দ্রকে আসতে বললো ওখানে। কাদা মাখা জামাটা খুলে রেখেছে মহেন্দ্র, অন্য একটা পরেছে, এগিয়ে নমস্কার জানালো সকলকে। কুমার ওর পানে দৃষ্টিপাত করে প্রশ্ন করলো টাইপ শেখা হলো তোমার? আজ্ঞে হ্যাঁ এখন চোখ বুঁজে টাইপ করতে পারি তবে স্পিড কম—আরো দিনকতক অভ্যাস করলে ঠিক হয়ে যাবে।

এবার কাজের মাথায় অভ্যাস করবে—পরশু সোমবার আমার ওখানে যাবে দশটার সময়, সাদার্ণ পার্কে কেমন।

যে আজ্ঞে। বললো মহেন্দ। আনন্দই হচ্ছে ওর একটা কাজ এতদিন পর হোল। কিন্তু এখানেই মাধুরী চা পরিবেশন করছে অতিথিদের হঠাৎ কুমারকে সে প্রশ্ন করলো—

কাপটা কি? টাইপ না কি বাজার সরকারী।

—দরকার হলে সবই করতে হবে বললো কুমার গম্ভীর স্বরে।

না ও যাবে না। আপনার জুতো বুরুশ করার মতো শিল্প জ্ঞান নেই ওর। —সে কি মাধুরী। বুরুশ করবার কথা কি?

—এই তো বললেন সবই করতে হবে তার মধ্যে জুতো বুরুশও পড়ে।

—না না, আমি বলছি, বাড়ির ছেলের মত থাকবে যখন যা দরকার—

—আজ্ঞে না। এ ক্ষেত্র মুখুয্যেরই বাড়ির ছেলে আর কারো বাড়ির ছেলে হয়ে কাজ নেই। মহীনদা তুমি বলে দাও, আমি তোমাকে যেতে দেব না বলেই মাধুরী বাকি চারজনকে চা পরিবেশন করলো, ধীরে ধীরে, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল।

ব্যাপারটা এমন দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়ালো যে কুমার আর বললো না। মেজদা যেন গম্ভীর আর মেজবৌদির চোখে জ্বলন্ত একটা অগ্নি যেন ধিকধিক করছে কিন্তু মহেন্দ্রর অবস্থা আরো শোচনীয়। সে নিরুপায়ভাবে একখানা চেয়ারে বসে।

চল, আরম্ভ করা যাক। কুমারই বললো কথাটা। খেলোয়াড়দের এখন খেলার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে ওরা গুমোট ভাবটা কাটাতে চায়, কিন্তু খেলার একজন সঙ্গী কম হচ্ছে অতিথি যিনি আসার কথা তিনি এখনো আসেননি।

এসো। মহীন ততক্ষণ তোমাকে নিয়েই আরম্ভ করা যাক বলে কুমার অকস্মাৎ মহীনকে হাতে ধরে টেনে দাঁড় করে দিল। মহীন এর আগে দু'একদিন খেলেছে মাধুরীর সঙ্গে কিন্তু শুধু খেলা শিখবার জন্য ওর মোটে অভ্যাস নেই। আমি। আমিতো ভাল খেলতে পারি না।

—খুব পারবে এসো। বলে তাকে টেনে নিয়ে এল, হাতে গুঁজে দিল টেনিস র‍্যাকেটটা। নিরুপায় মহেন্দ্র দাঁড়ালো খেলতে।

পড়ে গিয়ে ওর কোমরে ব্যথা হয়েছে, তারপর খেলার তেমন অভ্যাস নাই। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মহেন্দ্র কাবু হয়ে পড়লো, অবস্থাটা এমন যে অন্যান্য খেলোয়াড়রা হাসছে। কিন্তু কুমার পরম অভিজাত ব্যক্তি মহেন্দ্রর মত নগন্য ব্যক্তিকে কেন খেলার সাথী করলো কেউ ভেবে দেখলো না।

অকস্মাৎ মাধুরীর আবির্ভাব ঘটলো, এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখলো অবস্থাটা তারপর মহেন্দ্রের হাত থেকে র‍্যাকেটখানা কেড়ে নিয়ে বললো—আসুন কে কত পারেন দেখা যাক বলেই মহেন্দ্রকে বললো, যাও তুমি আমার গানের আসরটা ঠিক করগে।

অপঃপর মাধুরী খেলতে আরম্ভ করলো যেন, দশভূজা। এত ভালোখেলা ও হয়তো জীবনে খেলেনি কী এক আশ্চর্য উত্তেজনা ওকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। র‍্যাকেটখানায় যাদু লেগেছে যেন। মুগ্ধ হয়ে দেখছে ওকে।

খেলাটা শেষ করে র‍্যাকেটখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আঁচলে মুখ মুছলো, বললো, দুর্বলকে জয় করতে যাওয়ার কোনো মহিমা নেই সপ্তরথী ঘিরে অভিমুন্যকে হত্যার কলঙ্ক শুধু মহা ভারতের কলঙ্ক নয় আপনাদেরও।

চলে গেল মাধুরী। কে কি বললো, জানবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ নেই ওর। ইতিমধ্যে সেই আহুত খোলোয়াড়টি এসে পড়েছে। তিনিও দেখছিলেন খেলা মাধুরী তাকে নমস্কার পর্যন্ত করলে না, ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টিকটু, খেলোয়াড়টি সত্যি স্পোর্টম্যান হেসে বললেন—

ঃ চমৎকার খেলেন। উনি তো খুব ভাল খেলোয়াড় হবেন।

ঃ ও কিছু হবে না একটা জলন্ত তল্পা, আগুন জলতে জলতে ও নিজেই পুড়ে যাবে কথাটা বললো যতীন তারপর এসে করমর্দন করলো অতিথির সঙ্গে।

ঃ কেন একথা বলছেন? মেয়েটি কে আপনার? শুধালেন ভদ্রলোক?

আমার বোন, অনেক দুঃখেই কথাটা বলছি, মিঃ আদিলিঙ্গম। ও আমাদের ঘরের প্রদীপ। লেখায়, সঙ্গীতে, শিল্পে ওর বিচিত্র প্রতিভা বিস্ময় জাগায়। কিন্তু ঐ হোমকুণ্ডে আহুতি দেবার মত ঋত্বিক আমরা খুঁজে পাচ্ছিনে হয়তো ও ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ছিঃ ছিঃ ! এরকম কথা কেন ভাবছেন নিতান্ত ছেলে মানুষ এখনো। বলে মিঃ আদিলিঙ্গম সস্নেহ দৃষ্টি একবার তাকালেন বাড়িটার পানে। যেন মাধুরীকে আর একবার দেখতে চাইছেন। মেজবৌ ব্যাপারটা বুঝে চাকরকে বললো ডাকতো ছোটদিকে।

কিন্তু ডাকতে হলো না, মাধুরী নিজেই এলো এবং সুষ্ঠু ভঙ্গীতে নমস্কার করে বললো শুরুতেই মার্জনা চাইছি; আপনার কাছে অপরাধী হয়ে গেলাম।

— না না, কিছু না ওতে আর কি হয়েছে? আপনার খেলা দেখে খুশী হয়েছে আমি। আপনি ভালো খেলোয়াড় হতে পারবেন।

আপনার আশীর্বাদ মাথা পেতে নিলাম কিন্তু খেলোয়াড় হবার ইচ্ছে নেই।

কেন? মিঃ আদিলিঙ্গম সস্নেহে প্রশ্ন করলেন।

কারণ, খেলার আগ্রহ খেয়াল থেকে জন্মায় বাস্তবের রূঢ়তা ও সইতে পারে না।

তাহলে তো শিল্প সাহিত্য সবই খেয়ালের সৃষ্টি সবই বাদ দিতে হয়।

না. মহীনদা বলেন, শিল্প, সাহিত্য আর সঙ্গীতের মধ্যে আছে অন্য একটা গতি, অন্তর্মূখী গতি যে পথে মানুষ নিজ আত্মাকে খুঁজে পায় আর, অতিমানসকে ধরতে পারে। খেলাটা পুরোপুরি বহির্মূখী। খেলাকে আমি নিন্দে করছি না, ওটা আমার স্বভাবের পরিপন্থী।

মিঃ আদিলিঙ্গম আর কিছু বললেন না, চা খেতে লাগলেন পরে শুধুলেন আপনার মহীনদা বুঝি আপনার গুরু? কে তিনি? কোথায় থাকেন?

গুরু নন, গুরু থাকেন উঁচুতে, মহীনদা আমাদের খুব কাছাকাছি এই মাটিতেই থাকেন। খেলা শেষ হলে আমাদের গানের মজলিসে মহীনদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব যাবেন তো?

—হ্যাঁ নিশ্চয় যাব বললেন, আদিলিঙ্গম সস্নেহে।

অতঃপর মাধুরী নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। ওদের খেলা আরম্ভ হল। মিঃ আদিলিঙ্গম ভালো খেলোয়াড়, এক একটি বলের এমন চমৎকার মার তিনি দিতে লাগলেন যে বিপক্ষ দলের আনন্দ হয়। গেম শেষ হতে দেরী হবে।

ওদিকে মহেন্দ্র গানের আসরটা সাজিয়ে ভাবছে কোথায় মাধুরী? কিন্তু মাধুরী আসবার আগে এলো ছোটদা রতীন্দ্র। বেহালাটা নিয়া সুর বাঁধতে লাগলো এই ফাঁকে প্রশ্ন—মহেন্দ্র। বাজাতে পারে কিনা।

না, বললো মহেন্দ্র। রতীন্দ্র অবাক হয়ে তার মুখ পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তাহলে কোন যন্ত্র বাজাও তুমি। বেহালার মতন সুরের যন্ত্র আর কিছু আছে নাকি;

—কি জানি। ধীর কণ্ঠে বললো মহেন্দ্র আমাদের বাড়িতে বেহালা নেই। আছে মৃদঙ্গ, তানপুরা, তবলা, ডুকি, মাদলা, মন্দিরা।

ব্যাস ওতেই গান বাজনা চলে?

হ্যাঁ এখন আর চলে না, আগে চলতো। মানে আমার বাবার আমলে।

—হারমোনিয়াম নেই?

ঃ না ও আমরা বাজাই না. আমাদের তিন পুরুষের যন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে। ছেলেটাকে যে কি করে শিখাবো। এসো বলে রতীন অভ্যর্থনা জানালো। সংগীতের আসর হল ওদের। কিন্তু কোথায় মাধুরী? আশ্চর্য তো! যার আসর সেই উপস্থিত নেই। খেলা শেষ হলেই মিঃ আদিলঙ্গম কুমার এবং মেজবৌদি ঢুকলো।

মেজবৌদি বললো, এই মহীন ঠাকুরপো, আর ইনি মিঃ আদিলিঙ্গম।

সবিনয়ে নমস্কার জানালো মহীন। ওরা বসার পর একজন একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেন অন্যজন একটা ভজন। রতীন বেহালা বাজালো মাধুরী এখনো আসছে না এর পরে কে গাইবে? মেজবৌদি বললো মহীন ঠাকুরপো গান একখানা। মহীন সেতার বাজাচ্ছিল সেটা বাজাতে লাগলো। বাজাচ্ছেই সুর ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে ঘরখানাকে, সারা বাড়িটাকে, ধীরে মধুর রাগিনী একি গুঞ্জন। একি অন্তর্বেদনার নিগঢ় অভিব্যক্তি একি বাষ্পাকুল ব্যাথা বিলাস। দিকে দিকে ক্রন্দসী যেন হেমন্তের শিশির ঝরা আকাশে আবিল করে দিল অশ্রু পঙ্কিল করে তুললো। অন্তত প্রাণের আকুল দেবতা যেন আর্তহাহাকারে মুর্ছিত হয়ে পড়েছে কোন এক নিষ্ঠুর দেবতার চরণমুলে 'ওগো যন্ত্রী' অসহনীয় আনন্দ আর ধরতে পারিনি থামাও তোমার মুরলী।

নিস্তব্ধ হয়ে গেছে বাড়িটা। মাধুরী কখন এসে একধারে নীরবে দাঁড়িয়েছে কেউ দেখেনি। শেষ হবার পর প্রায় আধ মিনিট ঘরখানায় যেন রেশ রয়েছে। মিঃ আদিলিঙ্গম রসজ্ঞ শ্রোতা এতক্ষণে তিনি বললেন, উঠতে উঠতে এসো তোমাকে আলিঙ্গন করে ধন্য হই।

মহীনের দুই গণ্ডা অশ্রুপ্লাবিত, মানুষ যে বাজাতে বাজাতে এমন করে কাঁদে এ ওরা

এর আগে কখনও দেখেনি। মিঃ আদিলিঙ্গম মহীনকে বুকে জড়িয়ে বললেন এই অন্তর্মুখিনতটা ভারতের নিজস্ব সাধনা এঁকে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দাও বন্ধু মানুষের আত্মা আবার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হোক।

মহেন্দ্র মাথা নুইয়ে এই বয়োঃবৃদ্ধ খেলোয়াড়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করলো।

বয়সে তুমি ঢের ছোট, কিন্তু যেখানে তুমি বড় বিরাট, সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা অগাধ, অকুণ্ঠ হয়ে রইল।

মহীনের চোখ ছাপিয়ে আবার জল এল—কিছু সে বলতে পারলো না উত্তরে।

বাগান বাড়িটা কেনা হয়েছে, কিন্তু মাধুরী এখনো ওটা দেখেনি, আজ সকালে মহেন্দ্রকে বললো চলতো দমদমার বাগানটা দেখে আসি।

ঃ আমার একটু কাজ ছিল মাধুরী। মহেন্দ্র সভয়ে বলল। জানি। ও গল্প উর্বশীতে না পাঠিয়ে। উত্তরায়ণে পাঠাতে ওদের অফিস দশটার পর খোলে। উর্বশী সিনেমার কাগজ। উত্তরায়ণ মাসিক কাগজ ভালো কাগজ।

তুমি কি করে জানলে আমার গল্পের ব্যাপার মাধুরী?

—জানলাম, না জেনে আমার চলে না যে। চৌদ্দ টাকা মনি অর্ডারের কথা জেনেছি রসিদ দেখে।

লজ্জায় মহেন্দ্র হয়তো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইতো, কিন্তু মাধুরীই তাকে রক্ষা করলো বলল ভালো করছো, নিজের উপার্জনের টাকা যত কমই হোক, তার মূল্য হিসেবে হয় না এসো, উঠে পড়ো গাড়িতে।

মহেন্দ্র আর কিছু বলবার অবকাশ পেল না, কোটখানা গায়ে চড়াতে চড়াতে গাড়িতে উঠলো গিয়ে। মাধুরী তার আগেই উঠে বসে আছে, বললো গান গাওয়া আমি ছেড়ে দিলাম মহীনদা।

ঃ কেন? মহীন অতি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো।

ঃ এতাকাল আমার ধারণা ছিল যে গান শুধু গলার ব্যাপার। মিষ্টি গলা আর তাকে খেলিয়ে সুর বের করতে পারলেই গান হয় কাল জানলাম, তা নয়।

—কেন? ব্যাপারটা তো মূলতঃ ঐ গলারই কারসাজি। গলার অবশ্য শেষ শ্রুতি পর্যন্ত পৌঁছানো যায় না, তার জন্য দরকার যন্ত্রের, কিন্তু গলার মূল্য কম নয়।

—না' গলায় কারসাজিকে গলাবাজি বলা যায় তাতে গান হয় সংগীত হয় না, গীত তো নয়ই ওর জন্য দরকার সে দুঃখানুভূতির যেটা গলাতে না মহীনদা; সে থাকে অন্তরে। সেখান থেকে সুর আহরণ করে যে অমৃতময় পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়, গলা তাকে পরিবেশন করে মাত্র।

—বেশ তো, অন্তর থেকেই সুর আহরণ করো। মহেন্দ্র হেসে বলল কথাটা।

— না আমার ক্ষমতা নাই। অতটা অনতর্মুখী নই আমি। গান তো আমি ভালোই গাইতে পারি মহীনদা, বিস্তর প্রশংসা পেয়েছি, কিন্তু ওগুলো গান নয়।

—তাহলে? মহেন্দ্র আবার হাসলো। কি তা জানি না তবে গান নয় গীতামৃত ওর থেকে উৎসারিত হয় না কিন্তু যাক ওগুলো মানুষকে চমক লাগানো ফুলঝুরি। না আছে আগুন না হয় আলো ওর দীপ্তি এতোই ক্ষণিকের যে ওর ক্ষীণ আয়ুর জন্য ওর নিজেরই লজ্জা হওয়া উচিত।

মাধুরী কোনদিন মহেন্দ্রর সঙ্গে এতো কথা একসঙ্গে বলে না, এমন দীনভাবে তো নয়ই তার সতেজ সগর্ব বাক্যস্রোত যেন আজ রুদ্ধ হয়ে গেছে, এ যেন অন্য মাধুরী মহেন্দ্র আধ মিনিট ওর দিনে তাকিয়ে বলল, তোমার এই দীনতা আমার ভালো লাগছে না মাধুরী, আমাকেই তুমি একদিন বলেছিলে অমৃতের সন্তান দীন কেন হবে? আজ তুমি কেন এভাবে কথা বলছো?

—আমি মোটেই দীন নই মহীনদা। মাধুরী হেসে উঠলো। দীনতাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি, আমি ধনীকন্যা এবং স্বয়ং ধনী কিন্তু ওই সম্পূর্ণ পার্থিব। অপার্থিব ধনকে সম্ভোগ করার সৌভাগ্য আমার কম হয়েছে যে সৌভাগ্যবান তাকে নমস্কার জানাই।

মহেন্দ্র নীরব হয়ে রইল, মাধুরীর এই শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে আরো কি আছে কিনা

খুঁজে দেখবার মত অবস্থা ওর নয়, হতদরিদ্র এক গ্রাম্য আরো কি আছে কিনা খুঁজে দেখবার মত অবস্থা ওর নয়, হতদরিদ্র এক গ্রাম্য যুবক রূপে গুণে শিক্ষায় আভিজাত্যে মহেন্দ্র এতোই খাটো যে আপনাকে কোন সময়ই সে বুইক গাড়িতে চড়ে বেড়াবার যোগ্য মনে করে না। প্রশংসা শুনলে লজ্জায় তার মাথা নীচ হয়ে পড়ে নিন্দা শুনলে ভাবে এটাই তার প্রাপ্য। মাধুরীর প্রশংসা ওকে আনন্দিত করলো যা এ পর্যন্ত মাধুরীরর কাছ থেকে পায়নি তা পেল আজ কিন্তু ওতেই তার হোত ওর বেশি সে আশা করে না, ওর থেকে ক, খ পেলেও সে সুখী হতো। না পেলেও কিছুই মনে করতো না।

—আমি ধনী তাই আমার গান পাঁচজনে শোনে, বাহবা দেয়, তুমি নির্ধন তাই তোমার গানের শ্রোতা খুব কম মহীনদা এটা কিন্তু সত্যি।

কেন?

কারণ, সোনা যতক্ষণ খনিতে থাকে, তাকে খুঁজতে যায় কম লোক আবার সে যখন গিনি হয়ে গহনা হয়ে মণিকারের শো—কেসে বসে তখন রাস্তার পথচারীও তাকে দেখতে দাঁড়িয়ে যায়—তাতে খনির সোনার দাম কমে না মাধুরী।

—দাম কথাটা আপেক্ষিক মহীনদা মানুষের চাহিদা হিসাবে ওর মূল্য, কুকুরের কাছে হীরের দাম কতটুকু!

তোমার শ্রদ্ধাটা অশ্রদ্ধায় পরিণত হচ্ছে যে মাধুরী বলে মহিন হেসে উঠলো। না মহীনদা মাধুরীরর হাসিতে গাম্ভীর্য শ্রদ্ধার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই, এটা হচ্ছে জাগতিক পরিবেশের প্রয়োজনীয় পদার্থ জগতে নরম সোনা ইস্পাত না হলে চলে না।

সোনার মূল্যটা কোথায় থাকে? মহেন্দ্র প্রশ্ন করলো। অন্তরের অন্তঃপুরে, ওকে হাটে কিনতে যাওয়া মুর্খতা ছাড়া কিছু নয় মাধুরী। উত্তরটা দেবার সময় মুখখানি গাড়ির বাইরে নিয়ে গেল মহীন কিছু দেখতে পেলো না।

পীচঢালা পথে গাড়ি চলছে দ্রুত। সরে যাচ্ছে দুপাশের বৃক্ষলতা প্রসাদ কুটির। গাড়িটা বাঁক ফিরলো, একটা ছোট পল্লী, কোণার একটা দোকানে এক জন শীর্ণদেহী নারী, বুকে একটা শিশু—

ঃ দু'পয়সার এরারুট দাও তো?

ঃ দু'পয়সার হয় না যুদ্ধের বাজারে অত সস্তায় এরারুট নেই।

গাড়িটা শ্লথগতি হয়েছে বাক ফেরার জন্য কথাগুলো শুনতে পাওয়া গেল। মহীন গলা বাড়িয়ে দেখলো মেয়েটিকে ওর কোলের কাছে আরেকটি শিশু শীর্ণ দুর্বল। মেয়েটা এরারুট না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরছে।

ঃ থামো তো বলে মহীন গাড়ি থামতে বললো।

ঃ দু'পয়সার এরারুট পেলে না মা? মহীন প্রশ্ন করলো মেয়েটিকে।

ঃ না বাবা, হাতে আর পয়সা নেই বলে ছলছলে চোখে দাঁড়ালো সে গাড়ির কাছে।

ঃ একে দুটো টাকা দাও মাধুরী।

ঃ কেন? মাধুরী সাহাস্যে প্রশ্ন করলো মহেন্দ্রকে। টাকা কেন দিতে হবে।

ঃ ওকে কিছু দিয়ে তুমি ধন্য হও।

ঃ ধন্য হব। মানিব্যাগটা খালি হয়ে যাবে না।

ঃ হোক অন্তরের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হবে মাধুরী একে দান মনে করো না।

ঃ মনে করো সেবা।

মূর্তিগুলিতে সে রকম কিছু নেই, অধিকাংশ বাঘ, সিংহ বা অন্যান্য জন্তুর মূর্তি মানুষের মূর্তিও আছে। সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক গ্রীক মূর্তি এবং কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর ক্ষোদিত নারী মূর্তিও ভাঙা অবস্থাতেও। বাগানটা যথেষ্ট সুন্দর। মহেন্দ্র আর মাধুরী ঘুরে ঘুরে দেখছিল, অকস্মাৎ ঝিলটার নামবার একটা বাঁধা ঘাটে মহেন্দ্র একটা মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে গেল।

ঃ কি দেখছো মহীনদা।

ঃ না বলে মহীন সামনের মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল।

বাঃ! বেশ তো?

হ্যাঁ খোকনটাকে নিয়ে বৌদি খিড়কী ঘাটে দাঁড়ালে ঠিক এক রকম দেখতো মাধুরী।

ঃ বৌদির চেহারা বুঝি খুব সুন্দর এমনি সুন্দর। মাধুরীরর প্রশ্নে বিদ্রুপের ব্যঞ্জনা।

ঃ ওর জন্য সুন্দর চেহারা তো দরকার নাই মাধুরী, বিশ্বের যেখানে যত মা আছে, সবারই এই এক রকম যে ছেঁড়া শাড়ি পরা মেয়েটিকে টাকা দিয়ে এলে ওরও?

বিদ্রুপ ব্যঞ্জনার কাছ দিয়ে গেল না মহীন, নির্বাক মাধুরীর অন্তর জুড়ে তখন একটা কথাই গুঞ্জিত হচ্ছে অশিক্ষিত এই পল্লি যুবকের অন্তরটা কতখানি গভীর অতলস্পর্শ মাধুরীকে তা খুঁজে বের করতে হবে। হেসে বললো, এসো ওই ভাঙা নৌকাটায় বসা যাক মাধুরী কথা কাটিয়ে নৌকায় গিয়ে উঠলো।

মহেন্দ্র এলো, বসলো একধারে। নৌকাটা টলমল করছে ওদের ভারে কিন্তু পরে স্থির হলো। কোথায় একটি পাখি 'বৌ কথা কও' ডাকছে। মাধুরী বললো তোমার খালি গলার গানও ভাল লাগে মহীনদা গাওনা একটা। গলা কোন সময়ই খালি নয় মাধুরী বিশ্ব জুড়ো অবিরাম যে শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে ঋষি তাকে বলছেন ওঙ্কার নাদব্রহ্ম। ঐ গাছের পাখি শুধু নয়, এই বাতস এই বনমর্মর এই জলকল্লোল, সবই সেই বিরাট সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র শোন—

ওম, ও ওম্ ও ও ও ম...

সুরের গভীর ধ্বনি, যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে আকাশে গিয়ে লয় হচ্ছে সেই ওঙ্কার নাদ অপূর্ব আশ্চর্য, কিন্তু অকস্মাৎ মহীন কেমন নীল হয়ে গেল। গানটা থামাতে ওর দেরী হচ্ছে কোন রকমে গান বন্ধ করে শ্বাস নিল।

— কি হল মহীনদা?

ঃ কিছু না, দাদা ছোটবেলা শেখাতেন, অনেকদিন অভ্যাস নাই, বলে মহীন কয়েক আযলা জল তুলে মুখে দিল। সুস্থ হতে যেন সময় লাগছে ওর। মাধুরী বলল তোমার মাতৃত্বের রূপটা এতা প্রকট, মাধুরী আমি অবাক হয়ে যাই অনেক সময়। কি রকম? মাধুরী প্রশ্ন করলো।

—মেয়েরা মূলত ঃ দুই জাতের। এক প্রণয়িনী স্বভাবা আর এক মাতৃরূপী, তুমি শেষেরটা?

ঃ মোটেই না, আমি দারুণ প্রণয়িনী স্বভাবা, আমাকে ঘিরে সোসাইটতে অবিশ্রাম জলতরঙ্গ বাজে জানো তো কচু!

ওটা তোমার বাইরের খোলস অন্তরে তুমি মা! চল, ওঠো। মহীন উঠলো।

ঃ হবে।

মাধুরী যেন নিবে গেছে, এতোটুকু প্রতিবাদ করলো না। নেমে লিচু গাছের তলায় মহীনের অঙ্গ ধরে বললো আচ্ছা, দুটোর মধ্যে কোনটা ভালো, মাতৃস্বভাবা নাকি প্রণয়িনী স্বভাবা?

ঃ প্রেম যদি সত্য হয়, তাহলে তার থেকে বড় কিছু নাই মাধুরী সে অন্তরের লীলা বিলাসের চারণভূমি, সে তোমার ক্ষেত্র কিন্তু সে প্রেম সুদুর্লভ সে প্রেম সুপ্ত সে প্রেম খনির সোনা তাকে হাটে বাজারে পাওয়া যায় না। আর মাতৃরূপ পৃথিবীতে বড় দরকার, যেমন—

ঃ ইস্পাত হেসে ব্যঙ্গ করলো মাধুরী। না ইস্পাত আমি বেলতে চাই না। যেমন আকাশের বৃষ্টি মাটির শস্য মায়ের জন্য।

ঃ তাহলেও বড় কিন্তু প্রেমিকাই—তোমার মতে?

হ্যাঁ কিন্তু প্রেম অপার্থিব সে প্রেম অন্তরের সেখানে দেহ বিলাসে কোন প্রশ্ন নাই চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে। মাধুরী যেন গভীর হয়ে কত কি ভাবতে লাগলো। মহীনের অন্তরঃস্থল খুঁজবার ব্যথা সে ভেবেছিল একটু আগে, এই চেষ্টা করে কি ফল হবে তার? একি অসীম একটা অনুভূতিময় প্রাণ মাধুরী যেন কুল পাচ্ছে না। এই পর্যন্ত এই ধরণের কথা কারো মুখে শোনেনি কথার ফুলঝুরি খেলে ওর দাদার বন্ধুগণ রাজনীতি,

অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ সুর তরুণ পাশ্চাত্য উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের আইডিয়ায় ভরপুর, অশ্লীল আর অসুন্দর শিল্পের বিকৃত পুজকদের দল আসে।

যার আপনাকে প্রকাশ করার সহস্র ভঙ্গিমায় আবেদন জানায় যেন ভিক্ষুক। আর মহীনদা যেন অটল গম্ভীর হিমাচল, ওর প্রতি বন্দনে ঝঙ্কার ধ্বনি স্পন্দিত হচ্ছে।

—ওর আত্ম প্রকাশের প্রচেস্টা নেই, ও স্বতঃ প্রকাশমান সূর্য।

—এই যে, রাস্তা ভুল করছো? মহেন্দ্র ডাক দিল?

ঃ না মহীনদা, এই ফুলটা তুললাম বোটা ছেড়া একটি ফুল মাধুরী এগিয়ে এলো দেখতো কি ফুল। আমি তো চিনি না—

ঃ আমিও না কিন্তু নামের কি দরকার। ও নিজেই ওর পরিচয়।

ঃ তা কি হয়। দেখতে সুন্দর, গন্ধাটাও বেশ মিষ্টি একটি নাম হলে—

ঃ নামের মিষ্টিটা ততক্ষণ ওকে চেননি নাম না জানা ফুল আরো বেশী মিষ্টি মাধুরী ওর রহস্যতেই ওকে থাকতে দাও—

ঃ তাহলে মালীকে শুধোব নামটা।

ঃ নাই বা শুধোলে ওর নাম জবা, কবরী অথবা ডালিয়া, ডায়স্থাস গোছের কিছু একটা হবে সেইটাকে অতবড় করে দেখছো কেন?

ঃ এররূপ রস গন্ধের সঙ্গে নামটিও যোগ করতে চাইনি।

ঃ না ওর রহস্যকে অবগুণ্ঠিত করো না, হাজার ফুলের নাম তো জান ওর নাম নাই বা জানলে।

তাহলে এর নাম রইল নাম না ও শুধু রইল আমাদের আজকের বেড়ানোর সাক্ষী হয়ে আচ্ছা তাই বলে হাসলো মাধুরী।

উমেশবাবু স্বয়ং কোনো কাজ করেন না, বড় ছেলেই সব দেখে শোনে, তবে ছেলে এমন যে বাবার মত ছাড়া এক পা চলে না। বর্তমান যুগেও পিতা হিসেবে উমেশবাবুর গর্ব করার মতো তাঁর ছেলেরা। গিন্নিও নিজের পূজা পার্বণ নিয়ে থাকেন ওদিকে বড়বৌ সব দেখাশোনা করে কিন্তু মাধুরীর বিয়ের কথাটা উমেশবাবুকে আর গিন্নিকে ভাবতে হয়।

মেয়ে বড় হয়েছে, এবার যোগ্যপাত্রে তাকে সম্প্রদান করা দরকার। কুমার নৃপেন্দ্র নারায়ণ অবশ্য বাড়িতে আসেন পাত্র হিসাবে যতেষ্ট যোগ্যতা তাঁর। কিন্তু মাধুরী তাঁর কাছে ঘেঁষে না অতএব উমেশবাবু ও কথা ভাববেন না। হঠাৎ সেদিন অন্য একটি ছেলে এল ছেলেটি যতীনের বন্ধু নাম সুশীল বড় লোকের ছেলে এম. এ. পাস. ভালো গাইতে পারে। মাঝে মাঝে আসে এখানে গান গায় বৃজ খেলে। হঠাৎ এলো সে বিকাল বেলা। কুশলাদি প্রশ্নের পর রতীন তাকে নিয়ে বসলো নিজের গান বাজনার ঘরটায়। মহেন্দ্র বাড়ি নাই, কোথায় গেছে কে জানে, অতএব মেজবৌদি, মেজদা রতীন আর সুশীল ব্রীজ খেলতে বসলো সন্ধ্যার পর গান হবে। খেলা চলছে, অকস্মাৎ মাধুরী এসে ঢুকলো বৈকালিক প্রসাধন সেরে! চা দেবে সকলকে। সুশীল তাকে দেখে নমস্কার জানিয়ে বলল........

ঃ তাস আর খেলা চলে না, এবার মাধুরী দেবী একটা গান শোনান।

ফরমাস করলেই আমি গাইতে পারি নে, অত সস্তা গলা নেই আমার, চা খাবেন তো আসুন সবাই এই বারান্দায় বলে সে ওদিকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল চায়ের সরঞ্জাম সমেত চাকরটাকে নিয়ে।

বেশ, চা খেতে খেতে গানের মুড আসবে তো? বলতে বলতে ওরা এলো বারান্দায়।

ঃ আমার গান হুড চাপা আছে ও এখন খুলবে না এখানে হুড মানে হড়পী, যাতে সাপ থাকে ওকে তুবড়ী বাজিয়ে খুলতে হয়, আসুন, চা খান। এখানে আছে গোখরা সাপ বলে চা ঢেলে চলে যাচ্ছে, বড়দা এসে ঢুকলো বললো—

আমায় এক কাপ দে ছোটদি।

ঃ দিই মাধুরী কোমল হয়ে উঠল। বড়দাকে সে অত্যন্ত ভক্তি করে, বললো আজ

দমদমার বাগানটা দেখে এলাম বড়দা, ওখানে একটা গোশালা করলে হয় না? আমি না হয় দেখবো?

ঃ গো শালা? কেন রে?

ঃ দেশে বিস্তর গরু, রাখবার জায়গা নেই আমি কতকগুলো রাখতাম।

ঃ বিস্তর গরু কোথায়? গরুরই অভাব বাংলাদেশে।

না বড়দা গরু অনেক আছে, তবে সেগুলো দুধ দেয় না ওদের খোয়াড়ে পুড়ে ভালো করে খাওয়াতে হবে!

চা দিয়ে গেল মাধুরী। ওর কথা কেউ ধর্তেব্যের মধ্যে আনে না তাই রক্ষে নইলে সুশীল হয়তো অপমান বোধ করতো তথাপি সে লাল হয়ে উঠলো মাধুরীর ছেলে মানুষ রসিকতায়। কিন্তু কিছু করবার নেই। মাধুরীর কথা বরাবরই এমনি কাউকে সে খাতির করে না।

মেজবৌদি উঠে গেল ভেতরে, মাধুরীকে ধরলো এসে মাঝ পথে বললো শোন ছোটদি, সুশীলকে গরু বানিয়ে ছাড়লি তুই।

ঃ গরু খুব দামী জানোয়ার ওর অহঙ্কার হওয়া উচিত ওকে তো সম্মান করলাম।

ঃ হ্যাঁ গাধা বলিসনি, এই ঢের।

মেজবৌদির পিছনে মেঝদা মাধুরীর কথাটা শুনতে পেলো কঠিন ভাবে বললো মানুষকে অত হতশ্রদ্ধা কেন করিস মাধুরী।

ঃ ও মা, হতশ্রদ্ধা কই করলুম। গরু আমাদের পূজোর দেবতা, যজ্ঞের বলি, ওর গোবর অবধি মাথায় রাখি।

কথাগুলো এমন গভীর ভাবে বললো মাধুরী মেজদা, মেজবৌদি দুইজনেই হেসে ফেললো। অতঃপর হাসি সামলে মেজদা বললো—

ঃ বাড়িতে অতিথি এলে তাকে সম্মান করতে হবে বোনটি, এখন বড় হয়েছিস। উনি অতিথি নাকি? আমি ভেবেছিলাম আপনার লোক। তাহলে মাফ চাইছি গিয়ে বলে সটান ফিরে এসে সুশীলকে বললো।

ঃ শুনুন সুশীলবাবু, আমি আপনার সঙ্গে রসিকতা করছিলাম আপনার লোক মনে করে, কিন্তু মেজদা বললেন, আপনি শুধু অতিথি, তাই ক্ষমা চাইতে এলাম, কিছু মনে করবেন না, বলেই চলে গেল।

ঃ অবস্থাটা কিভাবে এনে কোথায় ঘোরাল, ভালো করে কেউ অনুভব করবার পূর্বেই সুশীল বললো, ওতো ঐ রকমই বলে, আপনি আবার ওকে ধমকাতে গেলেন কেন মেজদা হাসি ফুটল সুশীলের মুখে, অর্থাৎ মাধুরী তাকে আপনার লোক ভেবে রসিকতা করেছে এটা সে বুঝে আনন্দ পাচ্ছে, বড়দা চা খেতে খেতে শুনলো সব, উঠে গেল ভেতরে। মাধুরী মার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

বড়দা এসে ওর পিঠে হাত দিয়ে বললো—

লক্ষ্মী দিদি সুশীলকে তোর কি রকম লাগে বল তো?

উনি অতিশয় ভাল ছেলে।

ঃ অতিশয় কথাটা কেন বললি?

ঃ মানে রূপে, গুণে, কুলে শীলে, আভিজাত্যে অহঙ্কারে আর—

আর কি কি?

ঃ আর মাধুরী আমতা আমতা করে আর তোমার এই বোনটিকে ক্যাপটিভিট করবার ক্যাঙালপনায়, বলেই বড়দার কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো। তুমি আমাকে একটা অপদার্থ ধনীর ঘরের পুতুল সাজাতে ছাইছ বড়দা, বাপের টাকার সুট পরে ব্রীজ খেলতে এলেই মানুষ মহাপুরুষ হয় না, এম. এ. পাস করলেও চতুর্ভুজ হয় না। ওই তুলতুলে ননীর শরীর দিয়ে কুটোটি কাটবার যার শক্তি নেই, তাকে বিয়ে করে খাঁচায় পুরে রাখবার মত খাঁচা আমি পাই কোথা বড়দা, তুমি আমাকে ও কথা বল না।

ঃ না না, তোর যাকে ইচ্ছে বিয়ে করবি, না হয় না করবি। বড়দা ওর মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে লাগলো।

বড়বৌদি বললো বিয়ে তোকে এবার করতেই হবে মাধু সুশীল হোক আর দুঃশাসন হোক।

আমায় তোমরা তাড়াতে চাও বৌদি। মাধুরী অভিমান ভরে বললো কথাগুলো।

ঃ আর না বড়দা বললে করবে না ও বিয়ে কি তার বয়ে যাবে? একটা মাত্র বোন ওর যা খুশি করবে কারো কিছু বলবার নেই তোমাদের। বলে বড়দা ওকে আরো কাছে টেনে আদর করে বললে, যেমন ইচ্ছে থাক, যখন খুশি যাকে খুশি বিয়ে করবি বলে বড়দা চলে গেল।

ঃ কেমন হল। মাধুরী বড়বৌদির পানে চেয়ে বিদ্রুপ করলো।

ঃ আচ্ছা দেখা যাবে বিয়ে না করে ক'দিন থাকতে পারিস। দাদাদের আদুরে বোন হয়ে চিরকাল চলে নারে ছোটদী, মেয়েদের দরকার সবল আশ্রয়।

ঃ সেটা তোমার মত লতার জন্যে।

আ তুই কি বনস্পতি শালবৃক্ষ নাকি।

ঃ শাল না হতে পারি কোন আশ্রয় দরকার হবে না, আমি শালও নই, শৈবালও নই আমি শ্মাশানবাসিনী শ্যামা, বুঝলে?

বেশ তো, বৌদি হেসে বললো শিবঠাকুরটি এলেই তো হয়।

ঃ আমার শিবঠাকুর আসেন না তিনি নেশা করে শ্মাশানে পড়ে থাকেন তাঁকে পেতে হলে সাধনা করতে হয়।

আচ্ছা দেখা যাবে তুই কি রকম সাধনা করিস।

দেখবে দেখিয়ে দেব।

হাসি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল মাধুরীর মুখে। কিন্তু এখানে আর দাঁড়ানো চলে না কেমন যেন লজ্জা করছে। চলে এল রায় বাড়িতে। সন্ধ্যায় গানের আসর বসবার আয়োজন করছে ছোটদা, মাধুরী তফাৎ থেকে দেখেই সরে পড়লো সুশীলবাবুর দিকে সে আর যেতে চায় না, লন এ মেজবৌদি খেলা আরম্ভ করেছে, অতএব ওখানে যেতে ইচ্ছে নেই, বড়দার অফিসে এল। টাইপে বসা মেমসাহেব ওকে দেখে গুড আফটারনুন জানিয়ে বাংলাতেই বললো আজকাল ছোটদির দেখা পাওয়া যায় না খুব ব্যস্ত আছেন বুঝি?

ঃ না, ব্যস্ত কিসের, মাধুরী বললো জবাবে আজকাল তুমি মহীনদের সঙ্গে গল্প কর কিনা, তাই আমি আসি না তোমাদের গল্পে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনা।

ঃ মহীনদা। না, উনি গল্পতো করেন না। নিদারুণ কাজের লোক বলে একটু হাসলেন মেমসাহেব বয়সের তুলনায় বড়ো। নো রোমান্স ইন হিম।

ঃ তুমি মেমসাহেব একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাধা, প্রথম হলেও কথা ছিল।

ঃ কেন? মেমসাহেবের চোখে হাসি ফুটে উঠলো।

মহীনদাকে তুমি কি বুঝবে। আমাকেই সাতঘাটের পানি খেতে হয়। ওর রোমান্স শাড়ি ব্লাউজ সেণ্ডেলের কাছে ঘেঁষে যায় না হাইহিল রুজ লিপস্টিকেও না, ওর প্রেম অন্তরের গভীরে ঝঙ্কার তোলে যে আঁধার পাথরতলে রাজকন্যা রূপোর কাঠির ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে আছে?

বুঝতে পারলাম না ছোটদি বলে মেমসাহেব হাসলো।

ঃ থাকগে ও তোমার না বুঝলেও চলবে আচ্ছা, চললাম।

মাধুরী চলে এলো ওখান থেকে। মহীন এখানো ফেরেনি। গেল কোথা? গল্পটা দিতে গেছে হয়তো, কিম্বা নতুন কোন প্লট খুঁজতে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। কোথায় কোন বাবা কাকা তার শিশুর জন্য লাটিম খুঁজে ফিরছে তার গল্প কিন্তু এতো করুণ এতো অপরূপ! এই অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাল সাহিত্য সৃষ্টি হয়? আশ্চর্য মাধুরী আপন মনে গুঞ্জন করলো।

তুমি কেমন করে কর হে গুণী।
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।

আসেন মহেন্দ্র মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল। জুতোটা খুলতে খুলতে মাধুরী বললো ব্যাপার কি? অত খুশি খুশি।

ঃ আন্দাজ করো।
ঃ নতুন গল্প বেরিয়েছে?
ঃ না।
ঃ নতুন প্লট?
ঃ না।
ঃ তাহলে কোথাও কিছু টাকা পেয়ে খোকনের জন্য কিছু কিনেছ?
ঃ তা নয় চাকর বনে এলেম।
ঃ মানে চাকুরি পেয়েছো। কোথায়? কি চাকুরি?
ঃ চাকরি পেলাম একটা সওদাগরী অফিসে। ওদের সাপ্লাই এর কাজ মাইনে ষাট টাকা।
ঃ মাত্র ষাট। ওতে কি হবে?
ঃ হয়ে যাবে। মাগগি ভাতা ইত্যাদি শ'খানেক চালিয়ে দেব কোন রকমে। এককাপ চা দাও মাধু, দাদাকে একখানা চিঠি লিখে দেই সুসংবাদ দিয়ে।
ঃ এইটা নাকি সুসংবাদ। এতো আত্মহত্যার সামিল। মাধুরীর কণ্ঠে রুদ্ধ ক্রন্দন যেন।
ঃ না এটা আত্মাকে আবিষ্কার করার সাধনা। আপনাকে খুঁজে পাওয়ার যোগাসন যেখানে আমি সত্যিকার সেখানেই আমায় যেতে দাও মাধুরী।
ঃ যাবে। মাধুরীর কণ্ঠ মলিন। ঐ সাধনা পীঠে সমাধি যেন না হয়।
ঃ হবে না তো কি হবে।
ঃ না। তীক্ষ্ণ তীব্র প্রতিবাদে মাধুরী, ও তোমার যাওয়া নয় বদরীকা যাবার পথে ওটা চটি মাত্র এ আমি জানি, জানি——
চলে গেল মাধুরী, মহেন্দ্র পোস্টকার্ড আর কলম নিয়ে বসেই রইল অনেকক্ষণ। চাকর দিয়ে চা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে মাধুরী নিজে সে এল না। ও ঘরে ছোট দার গানের আসর চলছে, হয়তো মাধুরী সেখানে আছে মহেন্দ্র চিঠি লিখে ডাকে দেবার ব্যবস্থা করে চাকুরি পাওয়ার খবরটা উমেশবাবুকে দিল গিয়ে! বৃদ্ধ খুব খুশি হলেন না, কিন্তু মহীন বললো আপাততঃ এইটা ধরা যাক, মেসও সে একটা ঠিক করে এসেছে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে চিলেকোঠার একটি ঘর। সকালেই সেখানে চলে যাবে। বড়দা এবং বড়বৌদিও কথাটা শুনলো। বড়দা হয়তো কিছু বলতো কিন্তু বড়বৌদি চোখ ইসারা করে তাকে থামিয়ে দিল।
নিজের ঘরে এসে মহীন লিখতে বসলো একটা গল্প। মাধুরীরর সঙ্গে ওর আর দেখা হয়নি কে জানে, কোথায় আছে। কিন্তু গল্পটা আর ভাল হচ্ছে না। ভাব ভাষা সব কেমন আড়ষ্ট বোধ হচ্ছে চাকরি পাওয়ার আনন্দটা নাকি। হবে, সাহিত্য দুঃখের আনন্দময় প্রকাশ, বেদনার অনুভূতি মুর্ত না হলে সাক্ষাৎ মেলেনা, মহেন্দ্র কাগজ কলম গুটিয়ে পড়তে বসলো রবীন্দ্রনাথ। বড়দৌদি এসে ঢুকলো, বললো, এখানকার ভাত বিস্বাদ লাগছে ঠাকুরপো। এত তাড়াতাড়ি নাই মেসে গেলে। অফিসটা এখান থেকে করলে কি ক্ষতি ছিল?
এখানে থেকে অভ্যাসটা আর খারাপ করতে চাই না বৌদি। যেতেই যখন হবে—
ঃ যেতেই হবে, এমন কথা ভাবছো ঠাকুরপো?
ঃ মানুষকে ধোঁয়া ভরে আকাশে তোলা যায় বৌদি, কিন্তু তার ঠাঁই আকাশে নয়, মানুষের বুদ্ধি থাকলে সে আকাশে উড়তো না?
ঃ মানুষ আকশে উঠে আমাদের কিছু আনন্দ তো দেয় ঠাকুরপো।
ঃ হ্যাঁ দেয়, কিন্তু তার নিজের সর্বনাশ করে, অঙ্গ জলে যায় আগুনে, বৌদি যার যেখানে ঠাঁই তাকে সেখানেই যেতে দিন।
ঃ আমি জানি ঠাকুরপো কেন তুমি যেতে চাও, তোমার মতন বুদ্ধিমান ছেলে আমি জীবনে দেখিনি, কিন্তু আগুন যখন লাগে তখন পালিয়ে যেতে নেই, জল ঢেলে তাকে নিভাতে হয়।

ঃ হ্যাঁ বৌদি। কিন্তু আগুন না হয়ে ভূমিকম্প হলে পালিয়ে যাওয়াই বিধি।

ঃ কথায় আমি পারবো না ঠাকুরপো। আমার অত বিদ্যে বুদ্ধি নেই, কিন্তু তোমার এ বাড়ি ছেড়ে না গেলেই ভাল হত।

ঃ কেন বৌদি? মহেন্দ্র সাগ্রহে প্রশ্ন করলো।

বৌদি চলে গেল। মহেন্দ্র ওপরে গিয়ে খেয়ে এল। মাধুরী ছিল না ওখানে। ওর কলেজ খুলেছে পড়াশুনা করছে হয়তো। খেয়ে এসে মহেন্দ্র শুলো। সকালে উঠে চা খেয়ে যাবার আয়োজন করতে গিয়ে দেখলো মাধুরী কোত্থেকে একসেট বিছানা বালিশ একটা সুটকেস একটিন মাখন যোগাড় করে মহেন্দ্রের জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। সে যেতেই বললো, তোমার মেসের নম্বরটা কত? আমার মাঝে মাঝে তো যেতে হবে সেখানে।

ঃ যাবে বৈকি। বলে মহেন্দ্র নম্বরটা বলে দিল।

ঃ শনি রবিবার এখানে আসবে তো?

ঃ হ্যাঁ তা তো আসবোই।

সব গোছগাছ করে মাধুরী ক্লান্ত মুখ মুছে বললো, মাখন একটু করে খাবে দু'বেলা। কিসে যাবে ট্যাক্সিতে?

ঃ না রিক্সাতে।

আচ্ছা, ওরে কেষ্ট একটা রিক্সা ডাক।

মহেন্দ্র ইতিমধ্যে উমেশবাবু এবং গিন্নীকে প্রণাম করে এল। এসে দেখলো রিকসায় তার বিছানাপত্র তুলে মাধুরী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বললো ওদের অফিসে ফোন আছে?

হ্যাঁ, বলে মহীন রিক্সাতে উঠলো।

আচ্ছা এসো তাহলে। মাধুরী একটা প্রণাম পর্যন্ত করলো না মহেন্দ্রকে।

উঠতে দেরী হয়েছে খোকনের আজ। কাল অনেক রাত পর্যন্ত গান শিখে ছিল। আজকাল বাড়িতেই গানের আসর হয়, শেখবার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু বাবা নিজে শেখাচ্ছেন না, যদু কাকা শেখায় এতে খোকনের মন ভরে না। যন্ত্রগুলো প্রায় সব সারানো হয়েছে, বাকি আছে শুধু খোল আর অতি পুরাতন এককানা সেতার ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দি হয়ে একধারে পড়ে আছে সেটা। খোলটা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলে সারায়নি, আজও সেতার খান দেননি দেবেন্দ্র সারাতে। ঐ সেতারটি ওর বাবা ক্ষেত্রনাথ বাজাতেন, দেবেন্দ্র বাজিয়েছেন এবং মহেন্দ্রও ওতেই শিখেছে। ওতে পরের দানের স্পর্শ দেবেন্দ্র ঘটাবেন না বলে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা একটা হারমোনিয়াম এনেছে, বেহালা আর দুটো ফুট বাঁশি যে ক'দিন এখানে গান বাজনা চলেছে তার মধ্যে দেবেন্দ্র কোন যন্ত্র কোনদিন স্পর্শ করেন নি, যতটুকু সম্ভব মুখে বলেন, কিম্বা চুপ করে বসে শোনেন তাদের সঙ্গীত চর্চা।

দুপুরে টোল বসে, খোকন তখন স্কুলে যায়, আজ তার উঠতে দেরী হয়েছে ভাল করে পড়া করা হোল না। ভাত খেয়ে স্কুলে চলে গেল, গিয়েই শুনলো কি একটি কারণে আজ ছুটি থাকবে। ওর জামা জুতো সোয়েটার, গত মাসে এসেছে সেই সব পরে স্কুলে যায়, বড় লোকের ছেলের মতোই দেখায় ওকে আজকাল, কিন্তু বাবা ঐ জামা জুতোগুলো পছন্দ করছে না। বাড়ি ফিরে খোকন এগুলো খুলতে খুলতে মাকে বললো, আজ পড়াটা আগে করে নিবি তারপর গান শিখবি। হয়নি মা। ভাগ্যিস, ছুটি হয়ে গেল, না হলে বকুনী খেতাম।

ঃ গানটা ওতো পড়ার মধ্যে মা, বাবা বলে গানের থেকে বড় বিদ্যে নেই।

ঃ জ্যাঠামি রাখ, পড়া না শিখে যে গান শিখতে যায়, সে গাঁজা খায় তার পলাতে গাধাতে গান গায়, লোকে তার পিঠে দুমাদুম কাঁপড় কাঁচে। দে ওগুলো।

খোকনের ছাতা জামাজুতো গুছিয়ে রাখতে রাখতে অর্পণা আবার বলল, ভাল না হলে কাকু বককে এসে।

ঃ হ্যাঁ মা পড়া তো ভালোই হচ্ছে, জাড় লাগছে, একটা গেঞ্জী টেঞ্জী দাও।

ঃ দিই, অর্পনা একটা ছেঁড়া গেঞ্জী পরিয়ে দিচ্ছে খোকনকে। খোকন বলল, এটা ছেঁড়া মা। ঐটাই দাও না, বাবা তো আর দেখতে পাবেন না।

—ছিঃ খোকন। বাবা মার সঙ্গে লুকোচুরি করবি। মুখে সে বললো, কিন্তু অন্তর জুড়ে একটা বেদনার বাষ্প উঠেছে। বললো—

ঃ আর এমন কথা বলিস না কখনো।

ঃ না মা, আর কখনো বলবো না মা, মা তুমি রাখ না, ওগুলো রেখে দাও, ও জামা, আমি পরবোই না, আর কাকু জামা আনলে পরবো মা—

ঃ হ্যাঁ, কাকুর রোজগারের টাকাতে জামা কিনে দেব, কেমন?

হ্যাঁ মা, হ্যাঁ এ টাকা বুঝি, কাকু চেয়ে পাঠায়?

অর্পণার আহত দারিদ্র আবার আহত হোল, অসাধারণ সহ্যশক্তি তার। কিন্তু দুধের বালাক কিছুটা বোঝে না, বার বার সে তাই আঘাত করছে মায়ের অন্তরকে। অর্পনা একটু কঠোর স্বরে বললো—

ঃ এ বংশের মানুষ না খেয়ে মরে তবু কারো কিছু চায় না, এই সত্যিটা শিখে রাখ, এমন কথা বলিসনে আর।

ঃ না মা, আর বলবো না।

খোকন খালি গায়েই চলে গেল বাইরে, ছেঁড়া গেঞ্জীটা হাতে অর্পণা নিঃশব্দে বসে রইল খানিকক্ষণ, চোখে জল। ঠিক সেই সময় দেবেন্দ্রের বহু দিন না শোনা আনন্দময় কণ্ঠের আহ্বান এলো।

ঃ অর্পণা ছুটে এসে, মহীন টাকা পাঠিয়েছে তার নিজের রোজগারের টাকা অর্পণা ছেঁড়া গেঞ্জীটা হাতেই বাইরের ঘরে এসে দেখল সাগর পিওন চৌদ্দটা টাকা দিচ্ছে দেবেন্দ্রের হাতে। কুপনটা সাগর পড়েছে, তুমি আর একবার পড়তো অর্পণা। অর্পণা কুপনটা হাতে নিয়ে পড়লো?

শ্রীচরণেষু দাদা, আপনার চরণমুলে এই আমার প্রথম অর্ঘ্য এই টাকা কয়টি আপনার মহীনের রোজগারের। অনন্ত প্রণাম গ্রহণ করবেন। মহীনের টাকাগুলো পরম আদরে বুকে চেপে অন্ধ দেবেন্দ্র অশ্রুপ্লাবিত চোখে ডাকলেন এই নাও, অর্পণা, দুহাত পেতে নাও বুকে করে নিয়ে লক্ষ্মীর হাঁড়িতে তোল। অর্পণার দু'চোখে জল, হাত পেতে টাকা নিয়ে নিঃশব্দে উঠে গেল। সাগর পিওন প্রতি মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা এই বাড়ি দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনোদিন এতটুকু আনন্দের স্ফুরণ দেখেনি, আজ বিস্মিত হয়ে অন্ধ দেবেন্দ্রর অশ্রুসজল মুখখানা দেখতে দেখতে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল দেবেন্দ্র ডাকলেন, খোকন।

ঃ যাই বাবা, খোকন খালি গায়ে এসে দাঁড়ালো।

ঃ তোর দয়াল দাদাকে ডাক, বল বাবার সেতারটা সারিয়ে আনতে হবে, আর তোর একখানা মোটা জামা, যা ডেকে আনতো বাবা।

খোকন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল, দেবেন্দ্রের চোখে জল, মুখে হাসি। ঘরটায় পায়চারী করতে লাগলেন, আপন মনে গাইছেন—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি
তাই যোগ্য ধ্যান ধরণে হয়ে গিরিগুহাবাসী
অনন্ত আঁধার কোলে মহা নির্বাণ হিল্লোল,
চিরশান্তি পরিমল অবিরত যায় ভাসি—

দয়াল নিঃশব্দে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনেছে গানটা। সুরের অসাধারণত্ব ঘরের আকাশকে যেন স্নিগ্ধ করে তুলেছে দু'হাত জোড় করে দয়াল নমস্কার জানালো এই আত্মভোলা সুর সাধককে।

মেসে ঠাঁই পাওয়া খুবই শক্ত আজকাল, কিন্তু মহীনের সৌভাগ্য ওদের অফিসের বড়বাবু একটা মেসের মালিক। তিনিই মহীনকে জায়গা দিলেন, চিলেকোঠার পাশের ঘরটায়। ঘর নয়, একটা গুদাম তবে খোলা, আলো হাওয়া প্রচুর, মস্ত ছাদটা পড়ে রয়েছে। লেখবার সুবিধা হবে মহীনের। মেস বলতে যে নোংরা অন্ধকার আবাস

বুঝায় এখানে উঠে এলে তা মনে হয় না। কিন্তু ঘরখানা অত্যন্ত ছোট মাত্র একটা জানালা, ছাদটা টালীর। ওতেই মাধুরির দেয়া তোষক, চাদর—বালিশ বিছিয়ে ফেললো মহেন্দ্র। বইগুলো একপাশে রাখলো খবরের কাগজ পেতে, অতঃপর তালা চাবি দিয়ে অফিসে গেল।

বড় অফিস, বহুলোক কাজ করে ভারতের নানাস্থানে এদের শাখা অফিস আছে। কাজের ক্ষমাতা দেখাতে পারলে মহেন্দ্র যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবে। এখানে কাজটি শুধু টাইপ করা, তার জন্য ওদের আরো লেডী টাইপিষ্ট আছে, মহেন্দ্রকে টাইপ তো করতেই হবে চিঠিপত্রের ব্যাপারে বড়বাবুকে সাহায্যও করতে হবে।

পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করলো মহেন্দ্র, শরীরটা কেমন যেন ক্লান্ত বোধ হচ্ছে হয়তো এক নাগাড়ে এতখানি খাটা অভ্যাস নেই অভ্যাস হয়ে যাবে ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরলো। ছাঁদের ঐ ঘরটায় আলো ছিল না, মিস্ত্রি ডেকে লাইন করিয়ে নিতে হবে, কিন্তু আজ আর হয়ে উঠলো না মহেন্দ্র এক কাপ চা মাত্র খেয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

শীতে রাত সাড়ে নটার পূর্বে মেসে খাওয়া হবে না ততক্ষণ মহেন্দ্র শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো অন্ধকার ঘরে। আলো থাকলে কিন্তু লিখতো বা পড়তো। ভাবছে খোকনকে এই ঘরে এনে রাখবে তার কাছে, কাছের কোন স্কুলে ভর্তি করে দেবে। সকাল সন্ধ্যা নিজে পড়াবে আর গান শেখাবে। কিন্তু গান শেখাবে কি? যন্ত্র নেই। কিন্তু কেন? মহেন্দ্র কিনে নেবে একটা যাহোক কিছু যন্ত্র অথবা বাড়ি থেকে একটা এনে সারিয়ে দেবে। অপরের দেয়া যন্ত্রে কেন সে গান শেখাতে যাবে খোকনকে?

খিদে পেয়েছে, এতক্ষণ রান্না হল হয়তো, মহেন্দ্র উঠে এলো। আকাশ ভর্তি জ্যোৎস্না সুন্দর হয়ে উঠেছে, একটা বাঁশি পেলে বাজাতো মহেন্দ্র কিন্তু থাক সিঁড়ি দিয়ে নীচে এসে দেখলো বাবুরা খেতে বসেছে, ঘরে আর জায়গা নেই। নিরুপায় মহেন্দ্র পাশের ঘরে একজনের খাটে বসে রইল দ্বিতীয় ব্যাচ বসবার অপেক্ষায়। অতঃপর খেল, মেসের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করলো এবং বড়বাবুকে জানালো যে, আলোটা আজও হয়নি। তারপর উপরে এসে শুলো। ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ ভেঙ্গে পড়ছে। এই গুদামটায় আগে যে সমস্ত জীব বাস করত তারা এতক্ষণ কোথায় ছিল, এসে উপদ্রপ আরম্ভ করেছে, এরা সংখ্যায় বহু ইদুর এবং আরশোলা তো আছেই, একটা বিছাও দেখলো মহেন্দ্র মোমবাতির আলোতে। সর্বনাশ এ ঘরে কি করে শোয়া যায়। কিন্তু ওর অভ্যাস আছে। ওদের প্রাচীন বাড়ীতে বিছা ইঁদুর আরশোলা প্রচুর। মহেন্দ্র মশারীটা ভাল করে গুজে শুয়ে পড়লো ঘুমিয়ে গেল।

সকালে বড়বাবু ওর ঘরে আলো ঠিক করে সারিয়ে দিলেন এবং ঘরখানা ধুয়ে দিলেন। লেডি হিসাবে এটা কর্তব্য। তবে কোন শিল্পী নাকি এই ঘরে থাকতেন তিনি ক্লে মডডিং অর্থাৎ মাটির মূর্তি গড়তেন, ঘরের এক কুলঙ্গীতে তাঁর হাতের তৈরি একটি হরগৌরীর মূর্তি রয়েছে। চমৎকার মূর্তিটি শিবের বিশাল বক্ষে আশ্রিতা উমা যেন বিরাট আকাশের কোলে বনানীর বিরস্নিগ্ধ হরিদ্রাভা। মহেন্দ্র মূর্তিটি সযত্নে রেখে দিল। মেসের বাবুর সঙ্গে আলাপ এবং কয়েকজন সমবয়সীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হোল মহেন্দ্রের। অতঃপর ভালই চলেছে এবং চলতো কিন্তু তৃতীয় দিনে অফিসের টেলিফোনে ডাক পড়লো মাধুরী কথা বলছে, অন্য কোন কথা না বলে হুকুম করলো,

ঃ আজ সন্ধ্যায় এখানে আসতে হবে।

ঃ আমার ছুটি হতেই ছয়টা বেজে যায় মাধুরী, কখন যাব।

ঃ আচ্ছা, আমি ছয়টার পর মেসে গাড়ী পাঠাব রাত্রে এখানেই খাবে।

ফোন ছেড়ে দিল মাধুরী যেন সম্রাজ্ঞীর আদেশ। কিন্তু মহেন্দ্র কেন জানিনা যেতে চায় না, যথেষ্ট সাহায্য এই আড়াই মাস ওদের কাছ থেকে নিয়েছে সে, আর নয়। কিন্তু কোন সাহায্য সে নিচ্ছে না এ শুধু নিমন্ত্রণ। হয়তো বিশেষ কোন ব্যাপার আছে আজ ওখানে তাই যেতে হবে। মহেন্দ্র কয়েক মিনিট আগেই মেসে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হচ্ছে। মেসের গলিতে গাড়ী এসে দাঁড়াল। নামলো স্বয়ং মাধুরী। নেমেই

সামনে যে বাবুটিকে পেল। তাকেই শুধলো—মহীনদা কোন ঘরে থাকেন, মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

—যে বাবুটি নুতন এসেছেন?

—হ্যাঁ নিশ্চয় তাকে চেনেন আপনি। যেন না চিনলে ওর অপরাধ হবে হ্যাঁ চিনি বৈকি। আপনি দাঁড়ান আমি ডেকে দিচ্ছি তিনি থাকেন ছাদে।

ঃ ছাদে, মাধুরী চোখ কপালে তুললো। ছাদে কি করে মানুষ থাকে মশাই?

ঃ ছাদে, মানে ছাদের ঘর, ঘর তো নয় পায়রার খোপ।

ঃ ও আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ডাকতে হবে না যাচ্ছি বলে মাধুরী তর তর বেগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। মেসের চার পাঁচজন বাবু দেখলো ঐ গতিশীল উল্কাকে। বাইরে তাকিয়ে দেখলো বিরাট গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে।

মলীন ধুতিখানা পরে গায়ে গেঞ্জী চড়াচ্ছে মাধুরী উঠে এসে বললো বাঃ পায়রার খোপ নয়তো চড়াইয়ের বাসা?

মহেন্দ্র মহাব্যতীব্যস্ত হয়ে শুধলো মেসে কেন এলে তুমি মাধুরী।

কেন? মেসে তুমি থাকতে পার আর আমি আসতে পারি না?

কেন। বলে মাধুরী, ঘরখানা ভাল করে দেখতে লাগলো দীর্ঘক্ষণ ধরে। মহেন্দ্র জামা গায়ে দিয়ে বললো, চলো কোথায় যেতে হবে?

হ্যাঁ, চলো। ঐ মূর্তিটি কার?

—কোন এক শিল্পী এখানে থাকতেন তাঁরই ছিল। এখন আমার, তুমি ইচ্ছে করলে নিতে পার?

না, এই অন্ধকার বাড়িটায় ঐ ছোট্ট প্রদীপটুকু জ্বলে থাক। জানলে ওর জন্যে ফুলের মালা আনতাম।

মহেন্দ্র মৃদু হাসলো কথাটা শুনে, ঘরের দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে বেরুলো দুজনে। কিন্তু মাধুরী বাড়িখানা ভাল করে দেখলো। স্নানাগার, শৌচাগার সবই সে ঘুরে দেখলো, অবশেষে রান্না ঘরে এসে দেখলো, শীত কালে কলকাতায় যখন প্রচুর তরকারী, কপি, মটরশুটি, মাংস তখন এই মেসে রান্না হচ্ছে বেগুন আলু আর টমেটোর চাটনী। কিছু বললেন না, কিন্তু কত যে বলছে তার চোখ সেই জানে। নিঃশব্দে মহীনকে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো, তখনো মেসের বাবুরা এই জলন্ত অগ্নিশিখাবৎ মেয়েটাকে দেখছে নানা জায়গা থেকে। গাড়ী ছাড়তেই মাধুরী বললো, আচ্ছা মহীনদা, এই কাঙ্গাল মেসে থেকে তুমিও কাঙ্গাল হয়ে যাবে না তো?

সবাই খেটে খায় মাধুরী। কাঙ্গাল কেন হবে ওরা?

টাকার কাঙ্গাল নয়, রূপের কাঙ্গাল, আমাকে দেখবার কি নিদারুণ ওদের চেষ্টা, অর্থাৎ তুমি যে রূপসী জানতে চাইছো, কথাটা বললো মহীন হাল্কা ভাবেই।

—মহীনদা, মাধুরী যেন গর্জন করে উঠলো, এই তিন দিনেই তুমি ভিখারী হয়ে গেছ। ছিঃ। আমি যদি তোমার কাছে আসতাম তো ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াতো।

—মাধুরী! আমার নিদারুণ ভুল হয়ে গেছে মাধুরী, মহীনের চোখে মার্জনা ভিক্ষার আকুতি।

— আচ্ছা, এ রকম আর বলো না, মাধুরী হেসে দিল।

—তোমাকে না বুঝেতে পারি তো ক্ষতি হবে মাধুরী, কিন্তু ভুল যেন না বুঝি আকশকে বুঝা যায় না তাতে আকাশের মর্যাদা কমে না।

—অত বাড়িও না মহীনদা, আমার বিদ্যেটুকু সব তোমার দান, তুমি আসার আগে কেউ ওভাবে আমার রূপের প্রশংসা করলে আমিই খুশী হতাম।

—ওটা কি রকম কথা হোল মাধুরী?

—আমি যেন নীল শান্ত আকাশ তা জানতাম না, আমার ঝরা মেঘটা তুমি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে—

চাকুরে বাবু হয়ে এই মহেন্দ্র এল এ বাড়িতে, এখানে ও কোনদিন অসম্মানিত হয়নি, কিন্তু ওর যে এখানে বিশেষ একটা সম্মান আছে, তা যেন আজই বুঝতে পারলো।

বিশেষত্ব কোন নিকট আত্মীয় যেন দীর্ঘকাল পরে এসেছে, এই রকম ভাব সকলের, চাকরগুলো পর্যন্ত বারংবার নমস্কার জানাল ওকে। ব্যাপারটা আর কিছু নয় ছোটদাকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন লক্ষ্ণৌ থেকে সেই ব্যবসাদার ভদ্রলোক, ইনি সঙ্গীতে বিশেষ অনুরক্ত এবং রতীনের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আপনার একমাত্র কন্যাকে দান করতে চান তার হাতে। মেয়েটিও খুব সঙ্গীত অনুরাগিনী। ওঁকে গান শোনাবার জন্য একটা আসর বসাতে বলেছেন উমেশবাবু এবং এই জন্য মহেন্দ্রকে আনলো মাধুরী।

অনেকগুলি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক। অনেকেই কিছুনা কিছু গাইলেন, মাধুরীও একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইল। অতঃপর মহীনের পালা। মহীন অতুল প্রসাদের একটা গান ধরলো ঃ—

ওগো সাথী, মম সাথী আমি সেই পথে যার সাথে
যে পথে বন্ধুত্ব দেশ বন্ধুত্ব সাথে।
যে পথে কাননে পাশে ফুলদল, যে পথে কুসুমের পরিমল,
যে পথে উষার হয় অভিসার অরুণ কিরণ, মাঝে—

গানের ভাষা এবং ভাব এমনই অপরূপ যে শ্রোতারা মুহ্যমান হয়ে শুনেছে নির্বাক নিষ্পন্দ। মাধুর হাতে সেতারখানা যেন কথা কইছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাইলে মহেন্দ্র, ও নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেছে তসুরের ভাবে মুর্ছনায়, সঙ্গীতে সমাধিস্থ হয়ে গেছে যেন।

গান শেষ হল লক্ষ্ণৌ এর ভদ্রলোক শুধু বললেন, সার্থক সাধনা তোমার। মহেন্দ্র ওকে প্রণাম করলো। তিনি অল্পক্ষণ ওর পানে তাকিয়ে হেসে বললেন তুমি আমার ওখানে দিনকয়েক থাকবে বাবা শরীরটা সারিয়ে দেব, ওখানকার জল হাওয়া খুব ভাল।

ঃ আমি চাকরী করি ছুটি পাব না তো এখন।

ঃ ও আচ্ছা ছুটি পেলে, যেও আমার ওখানে একবার।

মহেন্দ্র মাথা নামালো মাত্র, অতঃপর গানের আসর আর জমলো না। প্রচুর সুখাদ্য খেয়ে মহীন যখন মেসে ফিরছে মাধুরীকে খুঁজে পেল না।

বড়বৌদি বললো—এবার তোর একটা আর মাধুরীর একটা—

—কি বৌদি, মহীন বোকার মত প্রশ্ন করলো—

বি—য়ে বড়বৌদি টান করে বললো—বুঝেছ?

না বৌদি মেট্রিকেই আটকে গেলাম, বি. এ আর হলো কৈ। মহীন সংক্ষেপে জানালো।

ঃ বিদ্যালয়ের বি. এ. নয় এটা অবিদ্যালয়ের বিয়ে, বুঝলে মুর্খ্য। বৌদি হাসল আবার এস শীগগীর।

সঙ্গীতের আসরে যে ক'জন ছিল, তার মধ্যে মাধুরীর বিশেষ বান্ধবী মেনকা অন্যতমা। সুন্দরী, তরুণী ধনী কন্যা এবং সঙ্গীত ও নৃত্যে পটু। পরদিন কলেজে দেখা হতেই মেনকা বললো তোর মহীনদাকে দেখলাম মাধু অমন রোমান্টিক ছেলে অত দরদ দিয়ে গান গাইল কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে ও যেন বড্ড ভাল।

—তোর মত মুখ আর দেখিনি, মাধুরী বললো মহীনদা সামাধিস্থ শিব। তাঁর ধ্যান ভাঙতে মদন ভস্ম—অত সাজসজ্জা করে নাইবা যেতিস।

—সবাই যেমন যায় তেমনি গিয়েছিলাম তাই বলে মেনকা একটু থেমে বললো উনি বুঝি ওসব পছন্ন করেন না?

ওর কিছু এসে যায় না একে যে চাইবে তাকে কঙ্কবাসা উমা হতে হবে, তপস্যা করতে হবে কন্যাকুমারিকায়—

—ওরে বাবা ঐ কেরানীটার জন্যে?

—শিবকে চাইলে শ্মশান মেনে নিতে হয়। সম্পদ চাইলে ইন্দ্র, চন্দ্র আছেন অনেক—

—শিব বুঝি আর নেই।

—না, মাধুরী যেন ধমক দিল। তিনি এক মেধাদ্বিতীয়ম।

— চলে গেল মাধুরী। মেনকা ওর নির্বুদ্ধিতায় হাসলো আপন মনে বললো, সৃষ্টি ছাড়া মেয়ে একটা।

কে রে? গীতা এসে দাঁড়ালো।

—ঐ মাধুরী অত বড় লোকের মেয়ে ধনমান কুল শীল রূপ যৌবন কিছুই অভাব নেই, কিন্তু ও ভালবাসছে একজন কেরানীকে।

যাঃ। ওর সেই মহীনদা তো? ভালবাসে না করুণা করে, ওদের আশ্রিত জীব একটা পোষা কুকুর যার যেমন মায়াও তাই।

—তুই জানিস কচু। ছেলেটাকে কাল দেখলাম, সে মোটে কুকুর নয়, বাঘ।

—পুষতে চাস তো দেখ না? হাসলো গীতা।

—ও পোষা যায় না। একদম জঙ্গলের ব্যাপার মাধুকেই ভাল।

দু'জনেই খুব হাসলো নিজেদের রসিকতায়। কলেজ ছুটি হয়েছে বারান্দা থেকে দেখলো গাড়ীতে উঠে মাধুরী বাড়ি চলে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে মাধুরী কলেজের বেশ ত্যাগ করলো, তারপর বাবার কাছে গেল বারান্দায় একধারে তিনি একা বসে চা খাচ্ছিলেন, মাধুরী গিয়ে বসলো, তারপর বললো, বড়দাকে এ মাসেও আমি পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিলাম বাবা কিন্তু আসছে মাস থেকে আর পাঠাব না?

—কেন মা কেন? উমেশবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

—তুমি এতোকাল তোমার বন্ধুর ছেলের খোঁজ নাওনি বাবা, সে ভুল আর শোধরানো যাবে না। কাটা কাপড় জোড়া দেওয়া যায়, কি শেলাইয়ের দাগ থাকে বড়দার আত্মমর্যাদা বোধ হয়তো আমরা ক্ষুণ্ন করছিলাম বাবা, এই টাকা পাঠিয়ে।

—সে কি মা? বৃদ্ধ যেন অতি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি বুঝলে?

হ্যাঁ বাবা, নিরুপায় হয়ে তিনি এই টাকা গ্রহণ করেন। মহীনদাকে লেখা তাঁর চিঠিতে বিশেষ কিছু বোঝা না গেলেও আমি আন্দাজ করতে পেরেছি, তাঁর দৈন্যের আগুনে এ টাকায় জল ঢালা হচ্ছে না, ঘি তেল দেয়া হচ্ছে। তাকে দুঃখ দিয়ে তো আমাদের লাভ নেই।

উমেশবাবু নির্বাক বসে রইলেন কথাটা শুনে। মাধুরী আবার চা দিয়ে বললো, তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য আমি কথাটা বলছি না বাবা, অন্ধ অসহায় আমাদের এক নিকট আত্মীয়কে দুঃখ দেব না এই বললাম।

এ রকম কেন যে ভাবছ মা? উমেশবাবু ধীরে ধীর বললেন!

ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে বাবা, দীর্ঘ ষোল বছর তুমি তাদের খবর নাওনি। মহীনদা এখানে না এলে হয়তো কোনদিন নিতে না। তোমাকে একান্ত আপনার বলে স্বীকার করতে আজ তার মন চাইবে কেন বাবা? তোমার বন্ধুর ঐ পরিবারটি বাইরে যতই দীন হোন, অন্তরে রাজাধিরাজ।

এ ভুল শোধরানো যাবে না মাধুরী?

না শোধরানোর চেষ্টা করাই ভাল বাবা, স্বার্থন্বেষী সাধারণ কোন মানুষ হলে তোমার এই দানকে দাবী বলে মনে করতো। চেষ্টা করতো আরও বেশী আদায় করবার, এরা কিন্তু পাথরের মূর্তি বাবা, তোমার টাকার মুঠো ওঁর গায়ে গেলে দাগ কেটে দেয়, স্নেহের ধারা দিতে তুমি ষোল বছর দেরী করেছো বাবা, সে আর দেয়া যায় না—

মাধুরীর গভীর কালো চোখের পানে চাইলেন উমেশবাবু, চকচক করছে জল যেন কিন্তু মুখে হাসি এনে মাধুরী বললো, তুমি ভেবো না বাবা, এবার থেকে মহীনদা তার রোজগারের টাকা পাঠাবেন।

—সে কি কিছু বাঁচাতে পারবে মাধুরী।

হ্যাঁ বিশ পঁচিশ টাকা বাঁচবে এ কথা আর কাউকে জানিও না বাবা। তুমি আর আমি বাপ—বেটিতে জানলাম যা হোক।

—হ্যাঁ মা আমার এই ষোল বছরের ভুলটা মহীনও ক্ষমা করতে পারে না।

—ক্ষমার কথা উঠে না এটা ভুল নয় অকর্তব্য। তোমার কর্তব্যের যে ত্রুটি তার জন্য তোমাকে দুঃখ পেতে হলো বাবা, কিন্তু গৌরব বোধ করতে পারবে।

—কেন মা? কিসের গৌরব আর।

—তোমার বন্ধুর ছেলের চরিত্র মহিমার জন্য। মানুষ কত কঠিন আর কত কোমল হতে পারে, দেবেন্দ্রনাথ তার প্রমাণ।

ক্ষেত্রর কাছে আমি ঋণী হয়ে গেলাম মাধুরী।

— না বাবা, ঋণ দেবে না ওরা। সেবা করেন প্রতিদানের আশা না রেখে। শুধু ভালবাসার জন্য তোমার প্রতি তাঁর ভালবাসাটাকে ঋণ ভেবে খাটো করো না বাবা।

মাধুরী ওর মাথার চুলে হাত বুলাচ্ছিল, আরো কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। পিতাপুত্রীর এই কথোপকধন কেউ শুনলো না, কেউ জানলো না এমন অনেক গভীর গোপন কথা উমেশবাবুর সঙ্গে হয় মাধুরীর।

অতঃপর মাধুরী এসে ঢুকলো মহীনের পরিত্যক্ত ঘরটায়, ঘরখানা তালাবদ্ধ ছিল। খুলে ভেতরে এসে মাধুরী দেখলো। সেই পুথি দু'খানা মহেন্দ্র নিয়ে যেতে ভুলেছে নিজের মনে খানিকটা উলটালো। কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ পড়ে আছে দেখলো তারপর জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তাকালো পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত দেখা যায় না। দেখা যায় একটি ছোট পরিবার, এক তরুণী বধু তার স্বামী আর বছর খানেকের এক খুকী। একখানা মাত্র ঘর নিয়ে ওরা থাকে ভাগের কল ভাগের পায়খানা। বধুটি উনুনে রুটি সেকছে, স্বামীর বৈকালিক জলখাবার নিশ্চয়, আলু ভেজে রেখেছে একটু গুড়ও আছে দেখতে পেল বাচ্ছা মেয়েটা হানা দিয়ে এসে সেই গরম আলু ভাজা মুখে পুরে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার। তার মাও সঙ্গে সঙ্গে দুটো চাপড় দিল ওর পিঠে কারণ আলুভাজার বাটিটা উলটে সব ছড়িয়ে গেল। গরম আলুভাজা মুখে মেয়েটার শাস্তি তারপর মার খেয়ে সজোরে কান্না জুড়ে দিল মাধুরী বলতে চাইল মারল কেন? কিন্তু কিছুই বলতে হল না। ওর মাই মেয়েকে কোলে নিয়ে মাই দিতে লাগলো। মাধুরী হেসে ফেললো মহীনের কথাটা মনে পড়ে গের, বিশ্বে যেখানে যত মা আছে সবারই চেহারা একই সত্যি তাই।

ইতিমধ্যে ওর স্বামী এল, এসেই মেয়েটাকে নিল ওর কোলে আর বধুর গালে আস্তে একটা টোকা দিল। হাসিমুখে বধুটি তাড়াতাড়ি রুটি ক'খানা সেঁকে ওকে জল খেতে দেবার ব্যবস্থা করছে। নিত্যান্ত অভাবের সংসার তবু কত সুখের নীড় ওরা রচনা করেছে ভাবছে মাধুরী, বিরাট প্রাসাদে গগনচুম্বি বিলাস দ্রব্য ওখানে নাই রইল, ওখানে আছে অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাধুরী মুরলীর মূর্তিমতি শান্তিসুধা। মাধুরীর মুখে অপরূপ একটা তৃপ্তির হাসি ফুঠে উঠলো। শুক্রবারের দিন মাধুরী ফোন করে মহেন্দ্রকে তার অফিসে জানালো যে আগামীকাল শনিবার সে শঙ্করের নৃত্য দেখতে যাবে, মহেন্দ্র যেন ছুটির পরই মেসে ফেরে। অব্যাহতি নাই মহেন্দ্র জানে তা সম্মতি দিল, মাধুরী শনিবার দিন দুটোর আগেই কতগুলো জিনিস নিয়ে এসে উঠলো মহেন্দ্রের মেসে। মহেন্দ্র তখনো ফেরেনি, অনেক বাবুই ফেরেননি। মাধুরী সোজা উঠো এলো উপরে মেসের চাকরটা এল ওর সঙ্গে। মহেন্দ্রের ঘর তালা বন্ধ। মাধুরী চাকরটাকে বললো।

তালা ভেঙ্গে দাও—

সে কি! বাবু বকবেন। চাকরটা বিপন্ন বোধ করছে খুবই।

—না আমি বলছি, তুমি ভাঙো—

—আজ্ঞে না বাবু—

মাধুরী ওকে আর কিছু বললো না, ড্রাইভার অনুপ সিং জিনিসগুলো নিয়ে ওর পেছনে এসেছে। মাধুরী ইঙ্গিত করলো তালা ভাঙতে। অনুপ সিং পকেট থেকে একটা লম্বা প্লাস বের করে তালাটা মোচর দিল, কম দামী তালা আধ মিনিটের মধ্যে ভেঙে গেল। ঘরে ঢুকলো মাধুরী অনুপ সিং। জিনিসগুলো ঘরে নামাতেই মাধুরী তাকে একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললো, ভাল একটা তালা আন দুটো চাবি যেন থাকে।

অনুপ সিং চলে গেলে মাধুরী চাকরটাকে বললো, ঝাটা আন। ঘরে একটা চৌকি আনা হয়েছে কোথা থেকে কিন্তু বই রাখবার শেলফ ছিল না। মাধুরী একটা সেলফ এনেছে, একখানা টিপয়, দুটো ভাজা চেয়ার আর একখানা ক্যাম্বিসের ইজি চেয়ার, ওর লোক দুতিন বারে সেগুলো বয়ে আনলো নীচে থেকে। চাকরটা ঘর ঝাট দিতে লাগলো মাধুরী ঘরের প্রত্যেকটি কোন পরিষ্কার করিয়ে নিচ্ছে, চাকরটা পারছে না কেড়ে নিল মাধুরী ঝাঁটা তার হাত থেকে বললো—ছাড়ো অকর্মা। নিজেই একোন—ওকোন পরিষ্কার করলো, তারপর বিছানাটা ঝেড়ে পেতে দিল। ঝালর দেয়া নতুন বালিশ দিয়ে পার দিকে রাখলো পুরুইটালিয়ান ব্যাগ। লেপ আছে একখানা, চেয়ারগুলো ভাঁজ খুলে বসালো, একধারে ইজিচেয়ার, পাশে টিপয়টার ওপর কভার ঢেকে একটা ফুলদানীতে একগুচ্ছ ফুল সাজিয়ে দিল এরপর মাথার দিকের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দিল একটা বড় ছবি রবীন্দ্রনাথের। ওর তলায় ছোট একটি ধুপদানী কয়েকটা ধুপকাঠি গুজে ধরিয়ে দিল। সে ঘর এখন আর চেনা যায় না। মাধুরী দেখছে নিজের সাজানো ঘরখানা নিজেই। মহেন্দ্র অফিস থেকে ফিরে উপরে এল দেখলো মাধুরীকে তদবস্থায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো—

ঃ এসব কি হচ্ছে মাধুরী?

ঃ সেবা। হেসে জবাব দেয় মাধুরী।

ঃ একে সেবা বলে না মাধুরী, মহেন্দ্র করুণ কণ্ঠে বললো।

ঃ কি বলে তাহলে? প্রশ্নটা হাস্যদ্বারা রঞ্জিত।

ঃ পূজা। শান্ত জবাব মহেন্দ্রের কণ্ঠ থেকে।

ঃ পেশ পূজাই, যাও, হাতমুখ ধোও বেরুতে হবে।

ঃ আমাদের পুরোনো এমন অনেক পূজার গল্প আছে মাধুরী, যার তন্ত্রঃ প্রভাব ইষ্ট দেবতা সইতে অক্ষম হয়েছেন—

ঃ তুমি খুব ছোটলোক হয়ে যাচ্ছো মহীনদা, মাধুরী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো, আমার এ পূজা তো নয়ই সেবাও নয়, আমার পিতৃবন্ধুর পুত্রের প্রতি কর্তব্য যাও কাপড় ছাড়—

ঃ কর্তব্য, Stem daughter of the voice of God মাধুরী সে শুষ্ক এতো সরস তো হয় না।

ঃ আমি নারী, কর্তব্যকে সরস করিতে পারি, যাও—

ঃ ওর চোখের কারুণ্য দেখতে পেলো না মাধুরী। মহেন্দ্র নিঃশব্দে কোণার কলে গিয়ে মুখ হাত পা ধুলো তারপর ঘরে ঢুকে ধূতী পাঞ্জাবী বদলে ফেললো।

মাধুরী ততক্ষণে বইগুলো সেলফে গুছিয়ে রাখছে, পোষাক পরে মহেন্দ্র তৈরী হয়ে বললো এবার কি করতে হবে?

ঃ তুমি বাইরে দাঁড়াও আমি আসছি।

মহেন্দ্র বাইরে ছাদে এসে দাঁড়াল। এখানে মেসের বাবুদের কয়েকজন ইতিমধ্যে উঁকি দিচ্ছে মাধুরীকে দেখার জন্য, মেসের বাবুরা এ সুযোগ কম পায়। কে ঐ মেয়েটি কোত্থেকে আসে মহেন্দ্রের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি, এই নিয়ে ওকে দেখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ওরা করেছে, কিন্তু অতিশয় সাবধান, সরাসরি মহেন্দ্রকে প্রশ্ন করে জেনো নেয়া যায়, কিন্তু মহেন্দ্র এখনো নতুন, তবু আজ একজন জিজ্ঞেস করলো।

উনি কে আপনার? বিশেষ কেউ নিশ্চয়। হাসলো ছোকরা!

হ্যাঁ, বলে মহেন্দ্র আর কিছু বললো না। মুখে সামান্য হাসি।

রোমন্সের সুযোগ মেলে কম, ভাগ্যবান মহেন্দ্রের সে সুযোগ পেয়েছে, অতএব তাকে ঘিরে অল্পবয়সী থেকে অধিক বয়সী মেম্বারগণ পর্যন্ত বেশ একটি রোমান্টিক গল্প খাড়া করে নিলেন মনে মনে, কিন্তু মাধুরী তার পূর্বে ঘরে তালা দিয়ে মহেন্দ্রকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

গাড়ীতে চড়ে সটান এলো চৌরঙ্গতে। সেখানে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে বসলো মহেন্দ্রকে নিয়ে। ভাল ভাল কয়েকটা খাবার আনতে আদেশ করলো। মহেন্দ্র আস্তে বললো অত কি হবে।

—খেতে হবে, হেসে বললো মাধুরী ক'দিন যা খাচ্ছ তা বোঝা যাচ্ছে চেহারা খানা দেখেই, নাও খাও, মানুষকে বাঁচতে হবে মহীনদা।

ঃ হ্যাঁ, কিন্তু লক্ষ লোক রেস্তোরাঁয় না খেয়েও বাঁচে মাধুরী ভাল ভাবেই বেঁচে থাকে।

তর্ক করো না মহীনদা, সতর্ক করে দিই তোমায়। আমার ইচ্ছে সপ্তাহে একটা দিন অন্ততঃ দুজন এক জায়গায় বসে খাব।

—মানে আমাকে খাওয়াবে, এই তো!!

হ্যাঁ তাই। মাধুরী রেগে শুধালো, তোমাকে খাওয়াবার আমার অধিকার আছে, বলো নেই।

—আছে; নিশ্চয়ই আছে বলে মহেন্দ্র কথাটাকে জোরালে করলো এবং নিঃশব্দে খেতে লাগলো। ওর মুখের হাসিটা লক্ষ্য করছে মাধুরী। গম্ভীর হয়ে বললো, হাসছো যে।

মানুষ যখন নিজেকে অপরের চোখে দেখে মাধুরী, তখন তার হাসিটা হার মানার হাসি?

ধন্যবাদ। হার মানলে তাহলে। বলে মাধুরীও হাসলো।

এরপর খাওয়া শেষ করে ওরা গেল নিউ এম্পায়ারে শঙ্করের নৃত্য দেখতে, সামনের আসনে বসলো দু'জনে। নৃত্য আরম্ভ হোল। অপূর্ব বাজনা! অনস্বাদিত এক সৌন্দর্য রসের পরিবেশন, কিন্তু কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি লেগে রয়েছে মহেন্দ্রের অন্তরে। মাধুরী শুধালো?

—তোমার ভাল লাগলো না মহীনদা?

—সে কি। একি ভালো না লাগবার বিষয়?

—তবে মুখখানা অত গম্ভীর কেন?

কারণটা ঠিক বুঝাতে পারবো না মাধুরী। কোথায় যেন একটু অতৃপ্তি হয়ে গেল, যেন পেলাম না, দেবতা এসেছিলেন, আলো জ্বেলে দেখা হয়নি।

ঃ কেন মহীনদা এরকম কেন মনে হচ্ছে?

ঃ বোঝানো যাবে না মাধুরী। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় যখন অতীন্দ্রিয়তে আঘাত করে তখন সে থাকে অনুভূতির কোঠায়, ভাষায় তাকে রূপ দেয়া যায় না?

মাধুরী কথাটা বিশেষ বুঝলো না। নিঃশব্দে মেসের দরজায় মহীনকে নামিয়ে দিয়ে ফিরলো। রাত তখন দশটারও বেশী।

মেসের লোকগুলি কেরানী হলেও ভদ্রসন্তান এবং প্রায় সকালেই শিক্ষিত, এই কয়দিনেই মহেন্দ্রকে ওরা ভালবেসে ফেলেছে, তার প্রধান কারণ মাধুরী। মেস জীবনে নারীর স্নেহের স্পর্শ কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু যদি কোন ভাগ্যবান মেম্বারের ভাগ্যে তা ঘটে তাহলে অপর সকলেরও যে কিছু ভাল হয়, অতল সৈকতে বাড়িবিন্দুর মত, ঈর্ষার সুযোগ এখানেই নেই, অসুয়া এখানে আসে না, অহেতুক অনুরাগ, এ মেসেও তাই ঘটলো। সমবয়সী সকলেই মহন্দ্রেকে নিয়ে বেশ আনন্দের পরিমণ্ডল গড়ে তুললো।

সেদিন মাধুরী এসে ওর ঘরখানাকে সাজিয়েছে চমৎকার করে, আজ আবার শনিবার, সে নিশ্চয়ই আসবে আশা করে মেম্বারগণ যে যতটা সম্ভব শীঘ্র ফিরলে ঐ অপরূপাকে একবার দেখতে পাব।

ঠিক আড়াইটার সময় এলো মাধুরী। হাতে ঘেরাটোপ জড়ানো সেতার। শান্তি নিকেতন ঝোলানো ঝোলানো আরো কতগুলি কি বস্তু। সটান উপরে উঠে গেল একটা চাবি ওর কাছে আছে, ঘর খুললো গিয়ে, জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখবে এবার।

মেসে ছোকরা মেম্বার ক'জন তখন কেউ তেলে ভাজা মুড়ি চিবুচ্ছে, কেউবা দু'পয়সার বিস্কুট আর চা খাচ্ছে, একজন খাচ্ছিল কমলালেবু সে মাধুরীকে দেখাতে চায় যে সেই এখানে কমলালেবু খায়, অতএব সে খোসাটাকে ছুঁড়ে ফেললো মহেন্দ্রের ঘরের সম্মুখে, মাধুরী এসে বলল।

—মেস মানে ভেড়ার গোয়াল নয়, ভদ্রলোকের থাকবার আস্তানা।

—আজ্ঞে মাপ করবেন, ওগুলো আমাদের বদ অভ্যাস, তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিল খোসাটা।

শুধরে নেবে, বলে মাধুরী আবার ঘরে ঢুকে নিজের কাজে মন দিল। মহেন্দ্র এসে পড়লো। ও জানে মাধুরী আসবে কাজেই কিছু মাত্র ব্যস্ত না হয়ে নিঃশব্দে জামা কাপড় খুলছে।

নাও শীঘ্রী কাপড় ছাড়া বেরুতে হবে।

—কোথায়?

এত খোঁজে কাজ কি? যা বললাম কর।

মাধুরী ফুলগুলো সাজিয়ে রাখলো, একটা প্লেটে কিছু লেবু আর পেঁপে কেটে মহেন্দ্রর সামনে রেখে দিল। মহেন্দ্র কোট গায়ে দিতে দিতে বললো

—ওটা কি? সেতার?—হ্যাঁ—

—তোমার নিজের সেতারটাই আনলে মাধুরী?

—নিজেরটাই তো দান করে আনন্দ মহীনদা।

—কিন্তু ওটা তোমার হাতের জিনিস।

ঃ বেশ তো তোমার হাতে বাজবে। মাধুরীর মুখ ফিরালো অন্য দিকে।

ঃ মাধু। মহেন্দ্র গম্ভীরকালো চোখে আনন্দ বিষাদ একসঙ্গে বাষ্পময় হয়ে উঠেছে।

ঃ বলো। মাধুরী হেসে তাকালো ওর পানে।

ঃ না কিছু না, সব কথা বলা যায় না মাধুরী।

ঃ থাক, না বলা কথাটা আমার বেশী ভাল লাগে।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি, ফলের টুকরোগুলো গিলতে আরম্ভ করছে। সন্দেশটা গেলা যাচ্ছে না। মাধুরী হেসে বললো অত তাড়া কেন? আস্তে খাও চাকরী তো আর ছুটে যাবে না।

ঃ না কোথায় যেতে হবে বললে?

ঃ হ্যাঁ, তার দেরী আছে, মাধুরী হাতের ঘড়িটা দেখলো—যাব 'জ্যু' দেখতে।

ঃ 'জ্যু' কেন? মহেন্দ্র বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

ঃ সব কেনোর উত্তর থাকে না মহীনদা চলো। মাধুরী উঠলো। বেরিয়ে গাড়ীতে চড়ে মাধুরী বললো। এ ক'দিন কি লিখলে, শোনাবে এসে আমায়?

তোমাকে শোনাতে আমার ভয় করে মাধুরী?

কেন? কড়া সমালোচনা করি বলে?

হ্যাঁ।

ভালো তো ঢের লোকই বলে থাকে? আমার ভালো না লাগায় কি তোমার বয়ে গেল? মহেন্দ্র একটু চুপ করে রইল, মাধুরীর ভাল না লাগায় কি কার ক্ষতি কি করে বলবে? পরে বলবো—

কে কোথায় ভাল বলে না বলে, আমি তো শুনতে যাইনে, যারা পরিচিত তারা যদি পড়ে ভাল বলে, তবেই না লেখা সার্থক।

ভাল না লাগলেও ভাল বলতে হবে নাকি? আচ্ছা এখন থেকে ঐ রকম খোশামোদের কথাই না হয় বলা যাবে। কিন্তু সে মিছে কথা, এ তোমায় জানিয়ে রাখছি, বলে মাধুরী ওর মুখপানে একটু চেয়ে বললো আবার, শোন তোমার লেখার প্রশংসা বহু লোক করে, নিন্দেও করে অনেক কিছু তোমার কাছে আমার পরিচিত সবাই বলবে, বেশ লিখেছেন, আমাকে কি তুমি সেই দলে ফেলতে চাও। তা যদি চাও তো তোমার কোন লেখা আর আমায় শুনিও না। আমি না শুনেই বলবো চমৎকার ব্যাখ্যা সাহিত্য দ্বিতীয় নাস্তি। আর যদি আমাকে তোমার সাহিত্যিক বন্ধু মনে করো তবে কোনটা ভালো লাগলো, তোমার নাই বা বললাম। কোনটা মন্দ লেগেছে এবং কেন মন্দ লেগেছে তাই শুধু আমি বলব। তোমার ত্রুটি যদি কিছু থাকে তো সেটা ধরিয়ে দেওয়াতেই আমার স্বার্থকতা।

তাই বলো মাধুরী তবে তোমার ভাষাটা বড় তীক্ষ্ণ। মহীন হাসল।

তীক্ষ্ণ না হলে তোমার খেজুরে কবি বুদ্ধির রস ঝরে না। কবি আর খেজুর গাছ একই পদার্থ, শীতকালে যখন সমস্ত প্রকৃতি জড় হয়ে থাকে, সেই সময় খেজুর বুকে ক্ষত করে তার রস ঝরাতে হয়—

মহীন নিঃশব্দে শুনে গেল কথাগুলো। গাড়ীটা সবেগে চলেছে গড়ের মাঠের উপর দিয়ে। সোজা রাস্তা পিচঢালা মাধুরী হেসে বললো—

আমাদের এটা প্রমোদ ভ্রমণ একসঙ্গে মহীনদা।

কেন? প্রয়োজনটা কিসের?

আলোর হাওয়ার, আনন্দের যার অভাবে কেরানি জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে? ঠিক কথা মাধুরী দিনে আলো জ্বেলে অফিসে কাজ করতে হয়, আঠারো ফিট লম্বা ছয়খানা টেবিল, রাশীকৃত কাগজ আর স্তুপাকৃত আবর্জনা। বাড়ি ফিরেও ওদের না আছে আলো না আছে হাওয়া বাংলার মধ্যবিত্ত এই কেরানীগুলো ধ্বংস হতে চলেছে মাধুরী। অশান্তি আর অস্বাস্থ্য ওদের চিরসাথী।

কথাগুলোতে ব্যথা বেদনা যেন মুর্ত হয়ে উঠলো। মাধুরী ওটাকে এড়াবার জন্য বললো, থাক মহীনদা, মানুষের দুঃখের মহাসমুদ্রে তুমি আমি নিতান্ত তুচ্ছ বুদ্ধদ। ওর কোন প্রতিকারই করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

প্রতিরোধ করার চিন্তাটাও করা ভাল মাধুরী, তোমার আমার মধ্যে তাতে কিছু মনুষ্যত্ব জাগবে।

মাধুরী আর কিছু বললো না।

নিজেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মহেন্দ্র আতঙ্কিত হয়ে উঠলো, কোথায় সে এ কোন অমৃতসাগরে কিন্তু ওখানে তার ঠাই নাই। কে যেন ঠেলে ওর মত একটা নগণ্য মানুষকে উর্ধ্ব আকাশে তুলে দিয়েছে, তাই বলে নিজেকে নক্ষত্র মনে করা ওর দারুণ ভুল হবে। গভীর রাত্রে মাধুরীর আনা সেতারখানা বাজাতে বাজাতে ভাবছিল মহেন্দ্র, এই সেতারে যার পেলব আঙুলের পরশ লেগে আছে, তার স্নেহ তার সহানুভুতি ওর জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল, কিন্তু, তারপর?

মহেন্দ্র মধ্যরাত্রে বেহাগ রাগিনী ধরলো—

আমায় কোথায় আনিলি
আনিয়ে তরঙ্গমাঝে তরী ডুবালে—

গানটা শেষ হবার পর মহেন্দ্র বুঝতে পারলো দীর্ঘক্ষণ ধরে ওর চক্ষে জল গড়াচ্ছে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে সেতারখানা রাখলো, তারপর শুয়ে পড়লো। সকালে উঠতে দেরী হয়েছে, আজ রবিবার, তাড়ার কিছুই নাই কিন্তু দেখতে পেল চাকর ওর জন্যে চায়ের জল গরম করে এনেছে। এরকম কোনদিন হয় না। বললো, কি ব্যাপার, না চাইতে চায়ের জল?

আজ্ঞে, কাল দিদিমনি বলে গেছেন, আর বকশিশ দিয়েছেন। বলেছেন আবার দেবেন।

মহেন্দ্র বুঝলো ব্যাপারটা, চা তৈরী করে খাবে, রাম বললো যে আবার জল গরম করে অভালটিন না হয় কোকো করে দিতে বলেছেন, কখন দেব?

নয়টার পর, বললো মহেন্দ্র। চাকরটা চলে গেল।

মাধুরীর এই মাতৃরূপ এই স্নেহশীল অন্তরটায় আবগাহন করতে চাইল মহেন্দ্রঃ একটি দরিদ্র দীনাতিদীন এক পল্লী যুবকের প্রতি অহেতুক করুণায় বিগলিত হৃদয় তরুণীর স্নেহসজল মাতৃত্বের অভিব্যক্তি ভগ্নিত্বের প্রকাশ এর বেশী নয় না, না এ বেশী কিছু নয় আর।

শীতের রোদপোহাতে মেম্বারদের অনেকে ছাদে উঠেছে, বসলো সব রোদে আজ ওদের বেগুন পোড়া মুড়ি খাওয়া হবে আনন্দে চোখে জল আসছে। এতো দুঃখের জীবনকে এমন সুখের করতে পারে এই মেসের লোক না দেখলে বোঝা যায় না। অতি সামান্য কিছুকে ওরা অসামান্য করে গ্রহণ করে না হলে ওরা বাঁচতে পারতো না। তাই মাধুরীর আবির্ভাব ওদের সরল সতেজ করে তুলছে এবং যাকে অবলম্বন করে মাধুরী আসে সেই মহেন্দ্র এক বিশেষ ব্যক্তি ওদের কাছে।

আজ আসবে নাকি! অনিলবাবু প্রশ্ন করলো।

কে? মহেন্দ্র কথাটা বুঝেও যেন বুঝেনি, এইভাবে প্রশ্ন করলো।

ঐ যে, আসে সেই মেয়েটি?

নাও আসতে পারে, বলে মহেন্দ্র কথা কটিয়ে দিতে চায় কিন্তু সতীনাথ বলল, মেসের জীবনের নিরামিশ আমরা, বাঁশপাতা চিবুই, কিন্তু আমাদের মাংসের দর বাজারে দিন দিন চড়েছে। মন্টা পাঁচটাকা সের আজকাল সবাই হাসলো, কিন্তু কথাটার অন্তর্নিহিত রস উপলব্ধি করতে সময় লাগে। সতীনাথ খুব বুদ্ধিমান ছেলে, ওর কথার ধরন কতকটা হেয়ালির মত কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে বলা সেই মহীন ঠিকই বুঝলো— ও সেগুলোকে পোলটি ফার্মে পালন করা হয়, মেসের গোয়ালে নয়। সবাই আরেক চোট হাসলো, এবং এই হাসাহাসির মধ্যে একজন বললো, ওরা কিন্তু জবাই করে।

ক্ষতি কি? গলায় দড়ি নিয়ে মরা আর জলে ডুবে মরার তফাৎ নেই।

বেশী আছে হে, তফাৎ আছে জলে ডুবতে যেতে হয় নদীতে, গলায় দড়িটা আমাদের ঘরেই জুটেছে, বললো সতীনাথ, দড়িটা সিল্কের বড্ড সরু আর শক্ত।

তাতে কি ক্ষতি? বললো একজন।

না, ক্ষতি নাই, লাভ, অনেকগুলো ঘাড় লটকানো যাবে তোমার আমার ওর।

এইসব তরল হাস্য পরিহাসে কিন্তু মহেন্দ্রর ওর মন তখন কোন সুদূর স্বপ্নের রাজ্যের বিচরণশীল। অনুভুতির তীব্র আলোকে অন্তরের কোন গোপন প্রকোষ্ঠ অবলোকন করতে চায়। মহেন্দ্র চুপচাপ বসে রইলো। অথচ ওকে দিয়েই এতগুলি লোক জটলা করছে।

মুড়ি বেগুন—পোড়া এসে গেল, ছুটির দিনের প্রাতঃকালনি জল খাবার। সবাই চিল শকুনীর মত পড়লো, সে যার ভাগে বেশী টানতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য মহেন্দ্র বসে থাকলেও দেখা গেল, সকলেই তার ভাগটা ঠিক করে ওর কাছে এনে দিল, এই যে মহীন বাবু আসুন।

এই সহানুভুতি সোনার কাঠি রয়েছে মাধুরীর চরণধ্বনিতে। এই ধুলি মলিন মেসবাড়ির হাওয়ার আর আলোতে ভরা দিব্য দুতি। মহেন্দ্র হাসলো একটু আপন মনে মুড়ির বাটিটা হাতে করে নিল।

আমি খাবো কাকু আহা কোথায় যেন ক্রন্দনাতুর বালক। না মহেন্দ্র আর খেতে পারবে না। এতোভাল খাদ্য মাধুরী খাওয়ালো কৈ, কেউ তো তার মনে এমন করে গুঞ্জন করেনি খোকন তো এই দু'মাস কিছু বলেনি তাকে—ও খাবারগুলো ওর রুচি নাই বুঝি! না ওগুলো বিদেশী খাদ্য, খোকন খেতে শেখেনি, কিন্তু বেগুন পোড়া মুড়ি একান্ত আপনার, খোকন অত্যন্ত ভালবাসে। মহীন মুড়ির বাটি নামিয়ে রাখলো।

কি হলো? খাবেন না?

না, থাক, আমি কথা আর বলতে পারবো না। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরে ঢুকল মহেন্দ্র কিন্তু মেস মেম্বারগণ অত সহজে ছেড়ে দেবেন না, একজন বললো—

ফারপোহাতে ডিনার খাওয়া অভ্যাস, বেগুন পোড়া রুচবে কেন?

না, না তা নয়, ঐ শ্রীহস্তের পরিবেশন হলে ঠিক করবে!

থাক, থাক অত কথার কি দরকার যুগলবাবু বললেন ওনার রুচি না হয় খাবেন না। তবে অত বড় মানুষী চাল এ মেসে কেন ভাই গ্লান্ডে গেলেই পারতেন।

মহেন্দ্র কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ছবিখানার কাছে দঁড়িয়ে, মহীনকে ওরা অহংকারী ধনীমাত্র ঠাওরেছে কিন্তু মহীনের অন্তর যদি কেউ দেখতে পেত ও মুহূর্তে। ছবিখানার পানে চাইল মহেন্দ্র বললো—

ইচ্ছা হয়েছিল মনে মাঝারে—

ছিলি আমায় পুতুল খেলার প্রভাতে শীবপূজার বেলায়।

তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি!

ঝর ঝর করে জল পড়ছে মহীনের চোখ থেকে। নিঃশব্দে মাধুরী দরজায় দাঁড়িয়ে

দেখেছে ওকে মহীন কিছুই জানতে পারেনি। অকস্মাৎ মাধুরী বললো, মায়ের রূপটা আমার মধ্যে বেশী, না তোমার মধ্যে বেশী মহীনদা।

এসে মহীনের চোখের জলটা মুছে ফেললো।

আমার কথার জবাব দাও।

জানি না মাধুরী।

বিশ্বজোড়া সন্তানদের বেদনার্ত হাহাকার কে জানে কোন পরম জননীর প্রাণকে ব্যথিত করে? কার অন্তরে তিনি বেশী প্রকাশমান কে জানে? কিন্তু তোমার ব্যথাটা খোকনের জন্যই—

না মাধুরী, ওকে অবলম্বন করে পৃথিবীর অগণ্য খোকুখুকুকে দেখি আমি তাদের মা, বাবা কাকার অন্তরকে অনুভব করি, কে কোথায় তার শিশুর মুখে স্বাস্থ্যকর খাদ্য দিয়ে অপরাগ তার বেদনা তুমি বুঝতে পারবে না, মাধুরী।

বুঝতেই পারবো না। বিস্মিত মাধুরী আহত হলো, নাগিনীর মত বেণীটা ঘুরিয়ে বললো, তোমার স্পর্ধ্যা বড় বেশী মহীনদা। পুরুষ হয়ে তুমি বুঝবে আর আমি মেয়ে হয়ে বুঝব না! ভাল বুঝি কিনা একদিন দেখতে পাবে। মাধুরী ঘরের মধ্যে এলো।

বাইরে যারা এতক্ষণ কথা বলছিল, তারা স্তব্ধ হয়ে গেছে, কথাগুলোও শুনেছে, কিন্তু কেউ বিশেষ কিছু বুঝতে পারলো না, মহীন বেরিয়ে এলো। মাধুরী ঘরের মধ্যে কি সব রাখছে সাজিয়ে। মহেন্দ্রের চোখের কোন তখনো ভিজে। প্রকাশবাবু প্রশ্ন করলো অকস্মাৎ—

হলো কি স্যার?

কিছু না, বলে মহেন্দ্র তার ভাগের বাটিটা তুলে নিয়ে আবার ভেতরে গেল। মাধুরী একটা চামচ দিয়ে কতটা তুলে নিয়ে নিজের মুখে নিয়ে বললো খোকনের অকল্যাণ করো না, মহীনদা খাও।

আর কিছু বলতে হলো না, মহীন নিঃশব্দে খেতে লাগলো এবং মাধুরীও দু'চার চামচ খেল ওর সঙ্গে। বাইরে বসা বাবুরা দেখলো ওদের এক বাটিতে খাওয়া এর পর ঝালটা যে কোথায় গিয়ে ছাড়াবে, আন্দাজ করতে পারছি না। কিন্তু কি যায় আসে?

তোমার মেসে আজ ভাল রান্না হচ্ছে দেখে এলাম, মাধুরী বললো—

হ্যাঁ রবিবার কিছু উন্নত খাদ্য হয় উত্তরে বললো মহেন্দ্র।

বেশ আমিও খাবো এখানে, বলে দিও ঠাকুরকে।

তুমি। কেন! তুমি কেন খাবে এখানে মাধুরী।

আমার খুশী খাব! বলে মাধুরী চুপ করে রইলো, একটুক্ষণ পরে বললো তুমি যেখানে খাও সেখানে আমিও খেতে পারি থাকতে পারি এইটুকু জানাতে, মাধুরীর কণ্ঠস্বর গভীর এবং দৃষ্টি বাইরের দিকে।

মাধুরী মহেন্দ্র, কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

বলো—প্রশ্ন করলো মাধুরী।

কিন্তু মহেন্দ্র কিছুই বলতে পারলো না। নিঃশব্দে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলো, মাধুরী ইতিমধ্যে ঘরখানা পরিষ্কার করে সব গোছালো। কয়েকটা নতুন আনা জিনিস রাখলো, বিছানাটা ঝেড়ে পেতে ঠিক করলো। এখানে বাবুদের ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখে খাওয়া যাবে না। মহীনদা আধপেটা থাকতে আমার ইচ্ছে নেই। বাড়ি যাচ্ছি, তুমি বিকালে যেও রাত্রে ওখানে খাবে। মহেন্দ্রকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই মাধুরী তর তর করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। নীচের তলায় দু'তিনজন বাবু তাদের একজন বললো, চলে যাচ্ছেন যে! খাবেন বলেছিলেন—

না, আজ আর হলো না? খাব আর খাওয়াব, আপনারা যেদিন সুবিধে, দিন ঠিক করবেন, নমস্কার মাধুরী গাড়িতে উঠলো গিয়ে।

মেসের বাবুদের সে খাওয়াবে, এ অত্যন্ত সুসংবাদ তাদের কাছে, কথাটা তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হয়ে গেল সকলের কাছেই শুধু মহেন্দ্র জানালো না, কারণ ও নিশ্চয় জানে ভেবে কেউ ওকে জানাতে আসেনি।

মহেন্দ্র বসেই আছে কত দীর্ঘক্ষণ ও জানে না।

ও বাড়ির কেউ চায়নি যে মহেন্দ্র অন্যত্র গিয়ে চাকরি নেবে কিন্তু কার্যত যখন তাই ঘটলো, তখন দেখা গেল যে বাড়ির সকলেই কিছু ক্ষুন্ন হয়েছে অথচ সর্বস্তরে ও করছে, মহেন্দ্রকে নিজের অফিসে চাকরি দিতে ভরসা করছিল না ওরা এবং মহেন্দ্রও কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি সে কথা। বললে অবশ্য ব্যাপারটা কিছু সহজ হতো, কিন্তু মহেন্দ্র যখন নিজেই চাকরি যোগাড় করে চলে গেল তখন ক্ষুন্ন হওয়া ছাড়া আর কিছুই ওদের করবার রইল না। কিন্তু মহেন্দ্র জানে এই ক্ষুন্নতাতেই মানুষের মর্যাদা বাড়ে।

মহেন্দ্র চলে যাওয়ার পর বাড়ির সকলেই দৃষ্টি পড়লো মাধুরীর উপর। এই দুই আড়াই মাসে মাধুরী যেন অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে। যেন সে মাধুরী পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সাগর তরঙ্গিনীর মত অচপল, স্থির সে।

বড়বৌদির, ভাই বরুণ এসছে গত সন্ধ্যায়, জমিদারের ছেলে, বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, ঢাকার বড় অফিসার। সকালেই তার সঙ্গে মাধুরীর দেখা হবার কথা কিন্তু মাধুরী বেরিয়ে গিয়েছিল। কোথায়? ফিরে এলো বেলা এগারোটা নাগাদ এবং এসেই নিজের ঘরে ঢুকলো। বড়বৌদি আন্দাজ করেছে মাধুরী গিয়েছিল মহীনের মেসে, কিন্তু বাড়ি ফিরে সে নিশ্চয়ই বরুণের সঙ্গে আলাপাদি করবে, এই আশা সবাই করছিল। কিন্তু দেখা গেল, মাধুরী বেরুলোই না। নিজের ঘরেই বসে। এরকম কাজ ও কখনো করে না কিন্তু। অবশেষে বড়বৌদি এসে প্রশ্ন করল। তো হোল কিরে ছোড়দি? সারাদিন বেরুসনি?

সকালেই তো আড়াই গ্যালন পেট্রল পুড়িয়ে এলাম বৌদি।

হ্যাঁ—তবে বাড়ির কেউ তোকে দেখেনি আজ।

কেউ মানে থেমে গেল মাধুরী তারপর বললো সন্ধ্যায় একটা আসর করব তখন দেখা হবে। যখন যা তা বেশে কি আর সবার সামনে বেরুনো যায় বৌদি? তাছাড়া তোমার ভাইটি বিলেতী আপেল, দেশী পেয়ারা হলেও বা কথা ছিল হেসে ফেললো মাধুরী। আপেল খুব মূল্যবান ফল জানিস।

নিশ্চয় আমি কি বলছি যে তিনি আম?

আম হলে যখন তখন দেখা করতিস?

অবশ্য কারণ আমের বোল থেকে আটির খেট্ট পর্যন্ত আপন। আপেলের সঙ্গে পরিচয় করতে সময় লাগে বেশি, কিছু মনে করো না ভাই হাসলো মাধুরী। না বোনটি, মনে কি করবো? তুই আপেল আতা, আনারস, আম যা ইচ্ছে নে, তোকে সুখী দেখলেই আমার আনন্দ, বড় বৌদি সস্নেহে ওর মাথায় হাত দিল। তাহলে নিশ্চিত থাক আমি সুখী হবোই।

অতঃপর বড়বৌদি চলে গেল, জেনে গেল যে সন্ধ্যায় মাধুরী গানের আসর বসাবে এবং যেখানে বরুণের সঙ্গে ওর দেখা হবে। বরুণ বড়বৌদির ছোট ভাই। মাধুরী তাকে জীবন সাথী রূপে গ্রহণ করলে খুবই খুশি হয় বড়বৌদি, কিন্তু মাধুরী সে কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলে তবে তো। বিশেষ কোন আশা করে না বড়বৌদি ও সম্বন্ধে—কারণ মাধুরীর মনের গঠন ওর জানা। সেইজন্যে নিজে প্রত্যক্ষভাবে বলেওনি কোন কথা। তবু অন্তরে একটা সুপ্ত আশা জেগে আছে, যদি হয় তো ভাল হয়। মেজবৌদি বোম্বাই থেকে ফিরেছে পরশু, আজ বোধ হয় কুমারও আসবে এখানে অতএব যা হোক একটা কিছু স্থির হতে পারে ভেবে বড়বৌদি নিজের কাজে আত্মনিয়োগ করলো।

সন্ধ্যায় কিন্তু সঙ্গীতের আসর বসালো না মাধুরী সাহিত্যেরও না। ভালো রকম সাজপোশাক করে টয়লেট সেরে দাদাদের কাছে এসে নমস্কার করলো বরুণবাবুকে। কুমার সুশীল এবং মেজবৌদিও ছিল ওখানে। বড়বৌদি ওদের চা দিচ্ছে এই আমাদের ছোড়দি, বললো বরুণ। মাধুরী হাত জোড় করেই ছিল, আবার কপালে ঠেকালো! আজ কি প্রোগ্রামঃ প্রশ্ন করলো কুমার বাহাদুর। চুপ করে থাকার প্রতিযোগিতা মাধুরী জবাব না দিয়ে চুপ করে বসলো।

ঈশ্বর মানুষকে স্বর দিয়েছেন ভাষা দিয়েছেন সে কি চুপ করে থাকার জন্য? না,

তার জন্যই তো প্রতিযোগিতা চালানো হচ্ছে। কে কতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে দেখা যাক আরম্ভ হোল ওয়ান, টু থ্রী।

এক মিনিট এর কি পুরস্কার? বরুণ প্রশ্ন করলো।

এক মাত্র পুরস্কার, যিনি জয়ী হবে, তাঁকে এই মালা দান করবো বলে মাধুরী আঁচল থেকে একরাশ জাপানী চন্দ্র মল্লিকা বের করে টেবিলে রাখলো তারপর সুচ সুতো বের করে একটা ফুল নিয়ে গাঁথতে গাঁথতে বললো, আরম্ভ হোক ওয়ান, টু থ্রী—

মেজবৌদি, হাসছে বড়বৌদিও, কুমার এবং মেজদাও হাসছে কাণ্ড দেখে কিন্তু বরুণবাবু নিতান্তই নবাগত, বিশেষ এখনো কিছু জানে না। মাধুরী সম্বন্ধে। ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল বেচারা। কিন্তু চুপ করে আছে সবাই। একটা ঘরে চার পাঁচজন লোক অথচ কারো মুখে কথা নেই এ যে কী অবস্থা তা বর্ণনাতীত। কিন্তু মাধুরীর মালার প্রতি লোভ ওদের তিনজনেরই সমান অতএব কথাও কেউ কইছে না। মেজবৌ বললো মালাটা গাঁথা শেষ পর্যন্ত তো কমপিটিশান?

মাধুরী জবাব দিল না, শুধু সামনের কাগজে পেন্সিল দিয়ে লিখলো মেজবৌদি আউট। লেখাটা পড়ে মেজবৌ বললো— বাপরে। বাঁচলাম কথা না কয়ে কি মানুষ থাকতে পারে?

যা বলেছ বলে মেজদাও কথা কইল, সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী লিখলো মেজদা আউট। ওরা দেখলো এবং চলে যাচ্ছে দু'জনেই। এখন আছে সুশীল কুমার বরুণ এবং মাধুরী—এই সময় এলো মহেন্দ্র। সে কিছুই জানে না কিন্তু মেজবৌদি জানিয়ে দিল—

কথা বলো না। ঠাকুরপো এখানে চুপ থাকার কমপিটিশন চলছে। যে জয়ী হবে। মাধু তাকে ঐ মালাটা দেবে দেখ যদি পারতো।

ওর উদ্দেশ্য তো ভাল না বৌদি। মহেন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে বললো ও চায় যার গলায় ও মালা দেবে সে চিরদিন চুপ করেই থাকবে তার কিছু বলবার অধিকার থাকবে না এরকম প্রতিযোগিতায় যোগদান আহাম্মকি ছাড়া কি আর—

ঠিক। আমি উইথড্র করছি বলে সুশীল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো।

আমিও। এমন একটা সাংঘাতিক কৌশল ওর মধ্যে আছে, কে জানতো। বরুণ উঠলো। রিয়েলি, এ প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া আহাম্মকি বলে কুমার আসন ত্যাগ করলো।

মাধুরীর মালা গাঁথা প্রায় শেষ হয়েছে। ধীরে ধীরে পেন্সিল দিয়ে সবার সামনে পাশে লিখলো আউট, আউট, তারপর মালার সুতোয় প্যাঁচ দিয়ে বললো আমি জয়ী হয়েছি অতএব আমার মালা আমিই পরলাম, চলে যাচ্ছে মাধুরী। আমরা তো যোগ দিলাম না প্রতিযোগিতায়—বললো বরুণ।

নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন, মহীনদা না বুদ্ধি দিলে দুপুররাত পর্যন্ত আপনাদের বোবা বানিয়ে রাখতাম।

কিন্তু মালা তো গাঁথা শেষ হয়েছিল কুমার বললো।

ও মালা কোনদিন গাঁথা শেষ হতো না সারা জীবন গাঁথাই চলতো— চলে গেল মাধুরী। তিনজন প্রতিযোগিই পরিষ্কার বুঝলো মাধুরী ওদের কারো হবে না।

মহেন্দ্র আজ এখানে বিশেষ একটা স্থান লাভ করল এমন কি কুমারের কাছেও ওর বুদ্ধি এবং বিনয় ব্যবহার সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে কিন্তু কোথায় মাধুরী? রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত গান গল্প খাওয়া সেরে মেসে ফেরার সময় মহেন্দ্র তাকে দেখতে পেল না অবশ্য কাউকে ওর কথা জিজ্ঞাসাও করেনি সে। মেসে ফিরে এলো এবং শুলো।

সোমবার থেকে সমস্ত সপ্তাহ যথারীতি অফিস করলো মহেন্দ্র মাধুরীর কোন খবর এল না। ফোন করে অবশ্য সে খবর জানতে পারতো, কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়। কেন এ সঙ্কোচ মহেন্দ্র নিজেই যেন ঠিক বুঝতে পারে না। মাধুরী কেন ফোন করলো না এই কয়দিন?

ভেবে দেখলো সেদিন বিকালে মাধুরী মেসে বসেছিল ওর সঙ্গে খাবে বলে ছিল, খায়নি সেদিন অকস্মাৎ চলে গেছে— এবং তারপর থেকেই মহেন্দ্রের সঙ্গে মাধুরীর

আর কথা হয়নি? সেদিন কি কথা হয়েছিল মনে করতে চেষ্টা করল মহেন্দ্র ঠিকঠাক মনে পড়ে না কিন্তু কোন রকম ঝগড়ার কথা তো হয়নি এবং সেদিনই মহেন্দ্র সন্ধ্যায় গিয়েছিল ওখানে।

আজ আবার শনিবার হয়তো মাধুরী আজ আসবে, নিশ্চয় আসবে, ভাবতে ভাবতে মহেন্দ্র অফিসে কাজ শেষ করে মেসে ফিরছে। তার একটু দেরী হল, হয়তো ইচ্ছে করেই দেরী করলো মহেন্দ্র। মাধুরী এসে তার ঘরে অপেক্ষা করবে আশায় কিন্তু পৌঁছে দেখলো মাধুরী আসেনি।

মেসের অন্যান্য মেম্বারের অবস্থা দেখে কিন্তু মহেন্দ্র অনুভূতিশীল অন্তরে একটা ঝঙ্কার উঠলো আহা বেচারা! দেখলো, ওদের প্রায় সকলেই যথাসাধ্য যত্নে সাজ পোশাক পরছে। কেউ দাড়ি কামাচ্ছে, কেউ বা তার সব থেকে ভাল জামা কাপড় পরে এদিক ওদিক ঘুরছে আর কেউ বা আগে ভালো ভাবে নিজেকে সজ্জিত করে গুণ গুণ করে গান ধরেছে, কিন্তু সবাই যে, মাধুরীর আসার প্রতীক্ষায় এটা বুঝিতে কিছুই দেরী হয় না। মহেন্দ্র হাসলো মনে মনে। নিজের ঘরে এসে দেখলো মাধুরীর কোকো, ওভ্যালটিন, দুধ এখনো প্রচুর রয়েছে, খেলেই হয় কিন্তু কেমন যেন অভিমান জাগলো অন্তরে। অতগুলো খাবার জমা করে রেখে গেলেই কি যথেষ্ট হোল? থাক মহেন্দ্র খাবে না ওসব।

উনি কি আসবে না আজ? প্রশ্ন করলো অনিল নামে একজন তরুণ মেম্বার। কে? মাধুরী। হ্যাঁ।

কি জানি হয়তো আসবেন না। মহীন উত্তর দিল। চেয়ে দেখলো এবং অন্য সকলের মুখের ভাব করুণ বিষন্ন হয়ে উঠেছে।

অনিল বললো, আপনি যাবেন তাহলে?

না আমার ও তো যাবার কিছু কথা নেই, বলে মহীন গরম জলে চা ছেড়ে দিল। ঘেরাটোপরে সেতারখানা এক কোণে রয়েছে, এইটাকে নিয়েই সেদিনকার কথা মনে পড়লো মহিনের। অন্য দিন সে সন্ধ্যায় বাজায় ওটা, আজও হয়তো বাজাতো কিন্তু কেমন যেন অনিচ্ছা জাগছে, ঐ সেতারটায় আঙ্গুল বুলিয়ে যাবার এক উদগ্র ক্ষুধা ওকে পেয়ে বসেছে। হাত বাড়ালো ওটা নিতে কিন্তু তখনি হাত সরিয়ে নিল, না ওটাকে ছোবে না মহেন্দ্র। কেমন একটা অবসাদ পেয়ে বসেছে, না কেমন জ্বর, একটা জ্বালা যেনঃ না কেমন একটা কান্নার ঢেউ বুকে ঠেলে উঠতে চায়, মহেন্দ্র মাধুরীর আনা নরম জোড়া বালিশে মাথা গুজলো। ওঠো মহীনদা ওঠো মহীনদা। স্নেহ সজল সুকোমল কণ্ঠে ঝংকার, কতক্ষণ চা ছেড়েছ। এ্যা। এ আর খাওয়া যাবে না, ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে। নাও, কাপড় পর, বাইরে গিয়ে চা খাব ওঠো ওঠো ওঠো—

একটানা কথা বলে চলেছে মাধুরী, হাতের বাস্কেট থেকে ফলগুলো সাজিয়ে রাখছে। টিপটের লিকারটা বাইরে ফেলে দিয়ে এল তারপর আবার বললো—

বাজার করতে দেরী হয়ে গেল— তা অত, রাগবার কি হয়েছে?

রাগিনী মাধুরী, মহেন্দ্র হাসতে হাসতে বললো।

তবে কি অভিমান না অনুরাগ? হাসছে মাধুরী।

তোমার ভাষাটা একটু সংযত করলে ভাল হয় মাধুরী—

ও, আচ্ছা। চুপ করে থাকার প্রতিযোগিতা চলুক। মাধুরী ঘরটা নিঃশব্দে গোছাতে লাগলো। মহেন্দ্র উঠে কাপড় ছাড়লো, এবং একটা সবেদা খেতে খেতে বললো— কোথায় যেতে হবে?

তুমি হাসলে— চলো বেরোও। দরজায় তালা দিল মাধুরী।

মেসের বাবুর দল ভিড় করেছে, মাধুরী বললো ওদের মধ্যে বয়েজ্যেষ্ঠকে কাল আমি খাওয়াব আপনারা কোথায় খাবেন বলুন? কি খাবেন?

যেখানে ইচ্ছে। যা দেবেন তাই খাব।

বেশ আমাদের বাড়িতে খাবেন সব, আমি বাস রিজার্ভ করে আপনাদের নিয়ে যাব কাল রাত্রে ঠিক রইল তাহলে—

যে আজ্ঞে খুব আনন্দের কথা—

ঠাকুর চাকর সবাইকে যেতে হবে। আচ্ছা নমস্কার।

চলে এল মাধুরী, গাড়িতে উঠলো মহীনকে নিয়ে। মহেন্দ্র এতক্ষণে বলল। ওদের কেন খাওয়াবে মাধুরী?

একদিন ওরা একটু ভাল খাবে মহীনদা।

ওদের উপরে তোমার এই সহানুভূতির মানে বুঝতে পারছিনে—

ওর তোমায় ভালবাসে কিনা তাই। হাসলো মাধুরী নঃশব্দে।

মহেন্দ্র আর কিছু বললো না, অথবা বলতে পারলো না। দু'জনে চৌরঙ্গীর বড় একটা দোকানে ঢুকে গেল, নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ালো দীর্ঘ পথ গড়ের মাঠে, কিন্তু আশ্চর্য, কেউ কোন কথা বললো না। ওর বাক্য স্রীতে যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। নদী যেমন সমুদ্রে এসে মিশেছে, স্থির শান্ত, গভীর সমুদ্র। রাত নটা নাগাদ মহেন্দ্রকে মেসের দরজায় নামিয়ে বললো—চুপ করে থাকার প্রতিযোগিতায় এবার আমিই হেরে গেলাম মহীনদা—

মহীন তাকিয়ে রইলো গাড়ির ভেতর বসে থাকা মাধুরীর পানে, গাড়িটা চলে যাচ্ছে, মহেন্দ্র মনে মনে আবৃত্তি করলো—

"*এতো মালা নয় নয়গো—এ যে তোমার তরবারি—*

ক্লান্ত পদে নিজের ঘরে এসে মহেন্দ্র কোন রকমে কোটখানা খুলে শুয়ে পড়লো। খেয়ে এসেছে, আর কিছু খাবে না ও। কিন্তু ওর সমস্ত হৃদয় মন জুড়ে যে মাধুরীর রাগিনী বেজে চলেছে, তার অসহনীয় আনন্দ ও ধরতে পারছে না। একি সুখ। নাকি বেদনা, কে জানে!

সকালেই ঘুম ভাঙ্গলো চোখ মেলে মহেন্দ্র দেখতে পেল, মেসের বাবুর দল তার জানালায় দাঁড়িয়ে ডাকছে— অনেক বেলা হয়েছে স্যার, উঠুন না। দরজা খুলে বাইরে আসতেই ওরা সমস্বরে প্রশ্ন করলো—

বাস কটায় আসবে।

তাতো জানি না সন্ধ্যা নাগাদ আসবে হয়তো।

আপনি জানেন না সে কি! অবাক হয়ে গেল বাবুর দল, কিন্তু মহেন্দ্র ওদের কেমন করে বোঝাবে যে সে সত্যি জানে না। মুখে জল দিতে দিতে বললো—

বাস ঠিক সময় আসবে ও ব্যবস্থায় কোন ভুল হয় না।

বাবুরা আর কোন কিছু শুধোলো না, মহেন্দ্র অতঃপর কি যে করবে, ভেবে পাচ্ছে না, নিজের সম্বন্ধে মহীনের ভয় লাগছে, অহেতুক ভয় না হেতু কিছু আছে, কি সেটা। মহেন্দ্র যেন ইচ্ছা করেই ভাবতে চাইছে না, সেটা কি। অত খানা পাবার যোগ্যতা নাই ওর, প্রত্যাশা ও নাই কিন্তু মানুষের মন এমন আশ্চর্য পদার্থে গঠিত যে, মনের অজ্ঞাত আশাকে অকস্মাৎ সামনে দেখলে চমকে উঠে অথচ ওটা তারই মনের কথা। মহেন্দ্রের ঠিক সেই অবস্থা। কিন্তু মানুষের মনের সত্য অনেক আছে, যাতে সচেতন মনের স্বাক্ষর দিতে সে ভয়—মাত্র এড়িয়ে যায়, অগ্রাহ্য করে—

এই কয়েকদিন মহেন্দ্র দু'খানা গল্প লিখেছে একটি উপন্যাসও লিখতে শুরু করেছে, আর কিছু টাকা যোগাড় করে দাদাকে পাঠিয়েছে, যদি সে টাকা অতি সামান্য মাত্র কুড়ি টাকা।

কিন্তু টাকা সে রোজগার করতে পারবে তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। মাইনের টাকা কয়টা ছাড়াও রোজগার ওর কম হবে না। যুদ্ধের বাজারে বাংলা বইয়ের কাটতি বেড়েছে এবং আজ লেখকের আদর যথেষ্ট! গল্প লিখে টাকা এর পূর্বে কম লোকই অর্জন করেছে। লেখক হিসাবে নাম করে ফেলতে পারলে চাকরি হয়তো ছেড়েই দেবে মহেন্দ্র, কিন্তু জীবনের একটা জটিলতা ওকে অতিষ্ট করে তুলেছে এখানে সে অসহায়।

ঠিক সময় বাস এলো এবং মেসের মেম্বারদের তুলে নিল। খালি বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে মাধুরী দুজন গুর্খা দারোয়ান পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছে। চমৎকার ব্যবস্থা ওর মহীনকে নিয়ে সবাই হৈ হল্লা করতে করতে গিয়ে পৌঁছিল। অভ্যর্থনা করলেন স্বয়ং উমেশবাবু এবং মাধুরী।

মাধুরী ওদের আনন্দের জন্য প্রচুর ব্যবস্থা করে রেখেছে। নৃত্যনাট্য, মুক অভিনয় এবং ম্যাজিক দেখালো বেশ কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে তারপর খাইয়ে দিল সবাইকে এবং ফেরবার সময় প্রত্যেককে দিল একগোছা করে রজনীগন্ধা ফুল। নমস্কার করে বললো সকলকে—

অতিথি হিসেবে আপনাদের তো ডাকিনী আমি আত্মীয় ভেবেই ডেকেছি। সুযোগ পেলে আবার ডাকবো আসবেন তো?

নিশ্চয় একসঙ্গে সবাই বললো ওরা তারপর শুধালো—

আমাদের ওখানে আপনি কবে খাবেন?

যে কোনদিন সুবিধে মত খাব গিয়ে। আমি আর ভোজ খেতে যাব না, আপনারা কেমন খান দেখতে যাব। হাসলো মাধুরী।

ওরা সকলে বাসায় ফিরলো, সঙ্গে মহেন্দ্র। মেসের জীবনে এরকম উৎসব কমই ঘটে। এর জন্যে মহেন্দ্রকে ওরা ধন্যবাদ দিচ্ছে।

উর্বশী, উত্তর এবং আরো কয়েকটি পত্রিকায় গল্প লিখেছে মহেন্দ্র। কিন্তু ওতে তার মন ভরে না বড় একটা কিছু করবার ইচ্ছায় কতকগুলি বই কিনে আনলো পুরানো বইয়ের দোকান থেকে, পড়া আরম্ভ করে দিল। পরবর্তী শনিবার মাধুরী যথাসময় এল এবং বইয়ের গাদাটা দেখে বলল—ওতে অনেক রোগ জীবানু থাকে মহীনদা।

চিন্তার জীবানুও থাকে মাধুরী। মহেন্দ্র মৃদু হেসে জবাব দিল।

হ্যাঁ কিন্তু রোগকে ওরা ঠেকাতে পারে না।

না, বরং এগিয়ে আনে বলে হাসলো মহেন্দ্র, পরে বললো কিন্তু গরীবের ঘোড়ারোগ ধরলে কাঠের ঘোড়ারই সন্ধান করতে হয়। তাছাড়া এসব বই নতুন পাওয়া যায় কম দেখছো না, সব পুরান আর উপপুরান—

কি করবে ওগুলো পড়ে? মাধুরী প্রশ্ন করলো ও দিয়ে কি হবে তোমার?

অনেক হবে! বাংলার এই প্রাচীন সাহিত্য মন্থন করে অমৃত উঠাতে চাই। গরলও উঠতে পারে বলে মাধুরী যেন অপ্রসন্নভাবে ঘরের জিনিসগুলো গোছালো, চা তৈরী করে খাওয়ালো মহেন্দ্রকে। তারপরই বললো, চল খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে আনি তোমায়—

এখানে বিস্তর খোলা হাওয়া মাধুরী—

না এটা কলকাতার কনজেষ্টেড এরিয়া—নাও উঠে পড়।

বাইরে যেতেই হবে?

অবশ্যই যেতে হবে, কারণ বড় মিলনটা বাইরেই হয়, আকাশ নীল আম বনের সবুজে, সাগরের নিলে আর মাঠের শ্যামলতায়—হাসছে মাধুরী।

ওকে কি ঠিক মিলন বলে মাধুরী? ও শুধু ছুঁয়ে থাকে, আকাশ থেকে আকাশেই, সাগর ঠিক থেকে যায়, ঐ মিলনের মধ্যে বিরাট শূন্যতা, ব্যাকুল হাহাকার! তার থেকে ঐ কার্নিসের কবুতর দুটোকে দেখো অতটুকু জায়গায় ওরা কেমন এক হয়ে গেছে—

মহেন্দ্র কথাগুলো শেষ করতেই দেখতে পেল, মাধুরী প্রদীপ্ত চোখ মেলে ওর পানে চেয়ে আছে। আরক্ত হয়ে উঠেছে মহেন্দ্র অকস্মাৎ। তার কবি মন আকস্মিকভাবে কার কাছে কি কথা প্রকাশ করেছে, এতক্ষণে যেন সেটা অনুভব করলো তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলাবার জন্যে বললো কিন্তু বাইরের ওই মিলনটা ভালো মাধুরী।

কেন ভালো কেন হলো আবার? মাধুরীর কণ্ঠে ব্যাঙ্গোক্তি।

হ্যাঁ, ভালো চলো বাইরে যাই—ওর যে আকাশ আর বনের সবুজের মধ্যে বিরাট অবকাশ মহেন্দ্র কোটখানা গায়ে চড়াতে চড়াতে ভেবে নিল বলল—

আকুলতা আর ব্যাকুলতা—এসো বাইরে। ঘরে তালা দিতে হবে।

হু মৃদু হাসিটা মহেন্দ্রর মুখে লেগেই আছে, বেরিয়ে এলো। মহেন্দ্র তালা দিল ঘরে, তারপর চলতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। মাধুরী বললো—

আকুলতা আর ব্যাকুরতার পর? বললো, শেষ কর তোমার কথা—

ওর আর শেষ নাই মাধুরী, ওটা অশেষ, অনন্তকাল থেকে ওরা এই ভাবে আছে, ওদের মিলনের আকুতিতেই মহামিলনের মন্ত্র ধ্বনিত হয়।

গাড়িতে উঠলো দু'জনে। মাধুরী কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল, আর মহেন্দ্র নির্বাক। ফেরা বেলায় মেসের দরজায় নামবার সময় মহেন্দ্র বললো। আমাকে দিনকতক একটু বেশি করে পড়তে হবে মাধুরী একটা বড় কিছু লিখতে চাই।

বেশ তো পড়, ভাল করে খাবে আর রাত জেগো না।

মাধুরী চলে গেল, মহেন্দ্র দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, বাষ্প যতক্ষন বাষ্প থাকে ততক্ষণ ভেসে থাকে আকাশে, কিন্তু শীতলতার সান্নিধ্যে এলেই তাকে পড়তে হয় এসে সে সবুজ ঘাসে তা তপ্ত বালিতেও তো সে পড়তে পারে—

মাধুরী বায়না নিয়েছে, বাড়িতে তার অসুবিধা হচ্ছে অতএব যে কোন মেয়ে হোষ্টেলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু বাড়িতে কেউ এই আনন্দ প্রতীমাকে বোর্ডিং এ বিসর্জন দিতে চায় না। মাধুরীর বক্তব্য হচ্ছে যে ছোটদার বিয়ে আসন্ন ছোট বৌদি আসবে। কিন্তু মাধুরীর সঙ্গে তার বনিবনাও হবে না।

কেন হবে না? সব দাদা আর বৌদিরা ওকে ঘিরে প্রশ্ন করলো।

কারণ সে ধনীর একমাত্র সুন্দরী সঙ্গীতজ্ঞা মেয়ে।

তুই ধনীর সুন্দরী মেয়ে এ বাড়িতে একমাত্র মেয়ে আর সঙ্গীতজ্ঞা।

শোন ভাই ছোটদা, মাধুরী বললো, আমার যেন মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে আমার কিছুতেই মিলবে না। কেন অনর্থক অশান্তি—

শোন ছোটদি, রতীন বললো, তোর সঙ্গে যার মিল না হবে, এ বাড়িতে তার জায়গা হবে না তা সে লক্ষ্ণৌঠুংরি হোক আর মাদ্রাজ কথাকলিই হোক।

এ বিয়ে বন্ধ করে দাও বড়দা মাধুরীকে চাইবে, সে আসবে বৌ হয়ে—সবাই পরস্পরের মুখপানে তাকালো। মাধুরী হেসে বললো—

বেশ আসুক সেই লক্ষ্ণৌঠুংরী তারপর দেখা যাবে।

ওর সম্বন্ধে কেন তোর এত ভয় মাধুরী। রতীন প্রশ্ন করলো—

ভয় নাই ছোট দা, ভাবনা, ওর সেতারের ঢাকনাটার মধ্যে আড়াই হাজার মণি মুক্তা আছে— ওর বাগানের গোলাপ নাকি ছয় ইঞ্চি চওড়া হয়।

মেজবৌদি হেসে পালিয়ে গেল। বড়বৌদি হাসছে, কিন্তু মাধুরী তেমনি গম্ভীর। বললো হাসছো কি? ওকে ঘরে এনে পোষা বিলেতী কুকুর পোষার থেকে বেশি। তোর জন্যে একগাছা শেকল আর একটা চাবুক এনে দেব, তুই যথেষ্ঠ ব্যবহার করিস তার সঙ্গে বলে চলে যাচ্ছে ছোটদা আবার ফিলে বলল।

শোন মাধু এই পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার জন্যে তোকে আমরা পর করতে পারি। তোকে যে সইতে পারবে না আমরা কেউ তাকে সইবো না, চলে গেল রতীন।

অতঃপর ব্যাপারটা এইখানেই ইতি হয়ে যেতো হোষ্টেলে যাওয়া হতো না মাধুরীর, কিন্তু বলে রাখলো, দরকার বোধ করলে সে যাবে। আগামী সাতই মাঘ রতীনে বিয়ে। শীতকালে লক্ষ্ণৌ এ বিয়ে দিতে যাবার ইচ্ছে থাকলেও অনেকেই যেতে পারলো না। মহেন্দ্র গেল না। যথাকালে রতীন বিয়ে করে ফিরলো। বৌভাতের রাত্রে মাধুরী আবার মেসশুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দিল কিন্তু সে এখন কম আসে মেসে। দু'এক শনিবার বাদ যায়। মেসের একজন সেদিন প্রশ্ন করলো—

আপনি আজকাল আর যান না বড়?

সামনে পরীক্ষা বলে কাটিয়ে দিল মাধুরী।

মাধুরী খেয়ে এসে বললো ভাগ্যিস মহীন এখানে এসেছির, তাই মধ্যে মধ্যে ভাল ভোজ জোটে ওদের।

মাধুরী নিজের পড়াশুনা নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যেন। প্রতি শনিবার মহেন্দ্রের মেসে আসা আর হয়ে উঠে না, ফোন করে মহেন্দ্রকে অফিসেই জানিয়ে দেয় কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করতে। মাধুরী সেখানে যায়। দু'জনায় কোনো ভাল রেষ্টুরেন্টে খায়, কিছুক্ষণ বেড়ায়, তারপর মহীনকে মেসের গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে মাধুরী বাড়ি ফেরে। মেসের বাবুরা শনিবার তার অপেক্ষায় বসে হয়রান হয়ে এখন আশা ছেড়ে দিয়েছে। কেন যে মাধুরী মেসে আসে না মহীনও জানে না। এমন

কি মাসখানে হতে মাধুরী দুটো শনিবার মহীনের সঙ্গে দেখাই করলো না। হল কি ওর? মহীন চিন্তিত হচ্ছে, কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ওর কেমন যেন বাধে।

না আসাই ভাল মাধুরীর। মহেন্দ্র নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ভাবলেও কিন্তু সান্ত্বনা এতে পাওয়া যায় না। মন তার অশান্ত হয়ে উঠেছে। যে একটি মাত্র আশ্রয়কে অবলম্বন করে মহেন্দ্র এই বিশাল নগরীর বুকে ভেসে বেড়ায় সে নৌকা বুঝি ঘাটে বাহির হয়ে গেল। যাক মাধুরী ভাল হোক, সে রাজরানী হোক মহেন্দ্র নিজেকে সংযম করতে চাইল, নিজের অন্তরকে তিরস্কার করলো নিজের আত্মাকে ধিক্কার দিল তারপর খোকনের কথা ভেবে আপনাকে আত্মস্থ করলো।

একবার বাড়ি যাওয়া উচিত। অনেকদিন এসেছে বাড়ি থেকে। কিন্তু ছুটি পাওয়া কঠিন কারণ চাকরীতে খুব বেশি দিন ঢোকেনি সে। সামনে চৈত্র সংক্রান্তি পয়লা বৈশাখে ছুটি আছে ক'দিন আর একটা রবিবার ঐ সঙ্গে। মহেন্দ্র বাড়ি ঘুরে আসবে। বড়বাবুকে বললো কথাটা আনন্দ সম্মতি দিলেন। অতঃপর একবার মাধুরীকে এবং তাদের বাড়ির লোককে বলা উচিত কিন্তু বলবে কি করে? অথচ ভেবে দেখলো ফোন করে, অথবা অফিসে ফিরতে ওখানে গিয়ে বলে আসতে কোনই বাধা নাই, তবুও মহেন্দ্র কিছু করতে পারল না। এই সঙ্কোচ এই শঙ্কা ওকে আরও সঙ্কুচিত করে তুলেছে? দূরে হোক? কিই বা দরকার ওদের জানাবার? বড়লোক বড়লোকের মতই থাকে মহেন্দ্রের সঙ্গে ওদের কতটুকু যোগ। যে মাধুরী প্রতি সপ্তাহে আসতো, এসে ঘর ঝাট দিত পর্যন্ত সে আজ কিনা বিশ পঁচিশ দিন আসেনি এতেই বুঝা যায়, কিছু একটা ঘটেছে। ওর এখানে আসার সম্বন্ধে হয়তো কোন কথা উঠেছে কিংবা কোন অপমান— কথাটা ভেবে শেষ করতে পারলো না মহেন্দ্র। ফোন করে আর ওদের বিড়ম্বিত করবে না সে, বিপন্ন করবে না মাধুরীকে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে মাধুরী কাটিতে চায় তার সংসর্গ। ভাতগুলো খেয়ে মহেন্দ্র অফিসে বেরুলো। ট্রামে সে যায় না পয়সা বাঁচায়—হেটেই চলছে। খাওয়ার পরই এই পরিশ্রম ওকে কাতর করে, কিন্তু পয়সা খরচ করতে ওর ইচ্ছে হয় না। মনে হয়, একটা পয়সার জন্য তার খোকন কেঁদেছে দু'পয়সার বাঁশি মহীন তাকে কিনে দিতে পারেনি।

অফিসে কাজ করছে অকস্মাৎ টেলিফোন ডাক। মহীন গিয়ে শুনলো বড়দা বলছে।

—আজ সন্ধ্যায় এখানে এসো মহীন মাধুরীকে দেখতে আসবেন রামপুরের জমিদার। বাবার চেনা বন্ধুর ছেলেটি ভাল। শুনলাম ডাক্তারী পড়বার জন্যে বিদেশে যাবে।

—বেশ তো যাব। মহেন্দ্র বললো সাতটা নাগাদ পৌছাব আমি। বড়দা ফোন ছেড়ে দেবার পর মহেন্দ্র ভাবলো, এই তো মাধুরীর যোগ্য বর জমিদার ছেলে সুন্দর, শিক্ষিত, অভিজাত খুব ভাল হবে। যাক বাঁচা গেল—মহেন্দ্র সম্বন্ধে কোন খারাপ কিছু ও বাড়িতে আলোচনা হয়নি তাহলে। মহেন্দ্র ওখানে তেমনি আপনজন হয়েই আছে প্রমাণ বড়দার আজকেই এই আহ্বান। আনন্দ হচ্ছে মহীনের, মাধুরীর বিয়ে হবে যেন তার ছোট বোনের বিয়ে। খুব ভাল। মনের আনাচে কানাচে কোথাও কোন মেঘ নাই তো, অন্তরে নিলাকাশ জুড়ে মাধুরীর জন্য আশিসধারা ঝরেছে। মহেন্দ্র আনন্দিত হল পরিতৃপ্ত হল। আবার ফোন, মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরে শুনলো, বড়বৌদি কথা বলছেন। শোন মহীন, তোমার বড়দার ভুলো মন। যে কথাটা বলার জন্যে তোমার ডাকা, সেইটিই উনি বলেননি। মাধুরীকে নিয়ে আসতে হবে তোমার।

কোথেকে? মহেন্দ্র অতি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো সে কোথায় গেল বৌদি?

ওমা? তুমি জান না? সে পরীক্ষার পড়ার জন্যে হোষ্টেলে গিয়ে সিট নিয়েছে, আমহার্ষ্টস্ট্রীটের ছাত্রী নিকেতন থাকে। পরীক্ষা হয়ে গেছে, তবু মেয়ের বাড়ি ফেরার নামটি নেই। বিয়ের কথা শুনলে আসবেই না তুমি ভাইটি কোনো কিছু বলে ভুলিয়ে বাড়ি নিয়ে এস ছটার মধ্যে বুঝলে। হ্যাঁ বৌদি আচ্ছা বলে মহেন্দ্র কথা শেষ করলো।

কিন্তু চিন্তার আকুল সমুদ্রে ভাসছে সে, একি ব্যাপার মাধুরীর কেন সে হোষ্টেলে এল, আর মহেন্দ্রকে জানালো না কেন আমহার্ষ্টস্ট্রীটের ছাত্রী নিকেতন মহেন্দ্রের মেস

থেকে আট দশ মিনিটের পথ অথচ একদিনও মাধুরী এল না মহেন্দ্রের বাসায়। মেয়েটা সত্যিই অদ্ভুত।

কিন্তু ভেবে কিছু বোঝা যাবে না। মহেন্দ্র পাঁচটার সময় বড়বাবুকে বলে মেসে ফিরলো, কাপড় বদলে গেল, ছাত্রী নিকেতনে—মাধুরীকে খবর পাঠাল।

ও, তুমি। কী খবর মহীনদা? মাধুরী এসে প্রশ্ন করলো হাসিমুখে।

তুমি এখানে কেন মাধুরী? কদিন এসছে? কেনই বা এসছো?

হোষ্টেল বাসে দুঃখের একটা বিশেষ আনন্দ আছে মহীনদা। সেটা ভোগ করতে চাইছি। হাসলো মাধুরী কথাটা বলে।

স্বেচ্ছায় দুঃখ বর্ণনা এক প্রকার বিলাসী মাধুরী, দুঃখের নির্মমতা ওতে থাকে না। ও যেন ধনীর রৌদ্রের হাতের সোনা বাঁধানো মোয়া, গহনার কাজ হয়। কঠিন তিরস্কারে মাধুরী নিভে গেল একেবারে। আধ মিনিট থেমে বললো, আর কারণ আছে মহীনদা। কিন্তু যাক সে কথা। কি খবর বল?

বাড়ি চল, বড়বৌদি কি সব রান্নাবান্না করেছেন, খেতে ডাকলেন।

অনেকদিন ভাল কিছু খাইনি, তুমি তো আর খাওয়াতে যাচ্ছো না? আচ্ছা আমি কাপড় বদলে আসি।

মিনিট কয়েক পর দু'জনে বেরুলো। মাধুরী পরেছে একখানা কালো পাড়ে সাদা শাড়ি তাঁতের। কানে দু'টি কুমারী মাকড়ী ছাড়া আর কোনো সোনার গহনা নাই গায়ে। হাতে কাঁচের চুড়ি। এ বেশে মাধুরীকে কোনদিন দেখিনি মহেন্দ্র। কিন্তু কিছু বললো না, ট্যাক্সি করে শ্যামবাজার পৌঁছাল।

দ্বার পালদের বেশভুষা বদলে গেছে আজ। ধোলাই কোটি পাজামা পরা বড় দারোয়ান ফৈজু সিং সালাম জানালো ওদের। মাধুরী বললো—ব্যাপার কি ফৈজু। হঠাৎ বাবু হয়ে গেলি যে! দিদিরানীকে সাদি হোগি আওরহাম বাবু নাহি বনেগা? বলে হাসল ফৈজু।

মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো মাধুরী, মহেন্দ্রের পানে তাকালো অগ্নিময় দৃষ্টিতে, পর মুহূর্তেই শান্ত হাসি হেসে বললো আস্তে,

সব চক্রান্তকারীর দল, আচ্ছা। গেল ভেতরে একলাই।

মহেন্দ্র নেমে এল বসবার ঘরে। ওখানে উমেশবাবু, বড়দা, মেজদা এবং আরো কয়েকজন রয়েছেন। জমিদার মশাই এখানো আসেননি। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লেন। এসেই বললেন, সন্ধ্যালগ্নেই আমি মেয়ে দেখতে চাই, সময়টা ভাল আছে।

মেজদা গেল মাধুরীকে আনবার জন্য, কিন্তু আট দশ মিনিট অতীত হল মেজদা ফিরলো না, এদিকে জমিদার মশাই তাড়া দিচ্ছেন, সময় পার হয়ে যাবে। অতঃপর বড়দা গেল দেখতে কিন্তু আশ্চর্য বড়দাও ফিরছে না হোল কি? অবশেষে স্বয়ং উমেশবাবু মহীনকে গিয়ে দেখতে বললেন। মহীন গিয়ে দেখলো মাধুরী তার ঘরটায় খিল দিয়ে খাটে বসে আছে, চোখের জলে গড়াচ্ছে গণ্ড। বাইরে বাড়িশুদ্ধ লোক অনুনয় বিনয়, তর্জন, গর্জন করছে। মাধুরী নির্বাক। অবশেষে বললো আমি কি সং নাকি আমাকে দেখতে আসবে? আমি যাব না, যার যা ইচ্ছে করতে পারে। বলে শুয়ে পড়লো।

সং তুমি ছিলে না মাধুরী, এইবার সং সেজেছ! ভদ্রলোকদের এখানেই ডেকে আনি, দেখে যান বলে মহেন্দ্র কঠিন কণ্ঠে আবার বললো, আমাদের বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে অপমান করা বুঝলে।

আমি যদি বিয়ে না করতে চাই, মাধুরী উঠে বললো।

তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ বিয়ে দিচ্ছে না! দেখা দিলেই তো বিয়ে হয়ে যায় না। তাঁরা যখন এসেছে একবার গিয়ে দাঁড়াতে দোষ কি?

আচ্ছা চলো বলে খিল খুলে বেরিয়ে এলো মাধুরী।

কাপড় বদলে নে—বড়বৌদি বলল।

না, মাধুরী ধমক দিয়ে উঠলো শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি না।

গিয়ে প্রণাম করবি বুঝলি? মেজবৌদি বলল!

প্রণাম করার কথা তুমি শেখাবে, ভুতের মুখের রাম নাম।

বলে মাধুরী সটান চলে এল পিছনে বড়দা, মেজদা মহেন্দ্র এবং তার পিছনে বাড়ির মেয়েরা সব। মাধুরী ঘরে ঢুকে তিনজন অতিথিকেই প্রণাম করলো এবং তারপর বাবাকে প্রণাম করে বসলো সামনে। বৃদ্ধ জমিদার দেখে বললেন।

বাঃ বেশ মেয়ে।

তোমার নাম কি মা?

মাধুরী ভট্টচার্য সহজ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, মাধুরী।

বৌদিরা অন্তরালে গুঞ্জন করলো মুখপুড়ী আর কি? মাধুরী লতা দেবী বলবি না, শুধু ভট্টাচার্য।

জমিদার মুচকি হাসছিলেন— ভাব দেখে বোঝা যায়, তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে মাধুরীকে। আর একবার তার আপাদমস্তক দেখে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা মা, তুমি রান্না বান্না কিছু জান?

জানি।

কি জানো?

ডাল, ভা, তরকারী, শাক ভাজা, মাছ—মাংস ডিম—চা। কাটলেট, স্যাণ্ড উইচ, টোষ্ট, পান তামাক সাজা—

তামাক সাজাটাও কি তাহলে রান্নার মধ্যে পড়ে, বাঃ বেশ মা এমনি সপ্রতিভ মেয়েই চেয়েছিলুম, বলতে বলতে হাসতে লাগলেন। ঘরের সবাই হাসছে ও দিকে ভিতরেও হাসি, মাধুরী গম্ভীর মুখে। বৃদ্ধ জমিদারবাবু সস্নেহে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—

তোমাকে আমার ঘরে যেতে হবে মা, আমার মা হতে হবে, কেমন?

না, কারুর মা বাপ হওয়া আমার চলবে না, আপনি মাপ করবেন, বলে উঠতে উঠতে আপনাকে দুঃখ দিলাম, তাই আবার মাপ চাইছি, প্রণাম হই। প্রণাম কথাটা উচ্চারণ করে উঠে পড়র মাধুরী এবং কোন দিকে না চেয়ে সটান ভেতরে চলে গেল।

আকস্মিকতার আঘাতে ঘরে যেন বজ্রপাত হয়ে গেছে। উমেশবাবু লজ্জিত নতমুখে বসে আছেন, এবং অন্যান্য সকলেই তদবস্থা। কিন্তু জমিদারবাবু বললেন ওরকম হয়েই থাকে আজকালকার মেয়েরা। বিয়ের নামে জ্বলে উঠে, আবার বিয়ে হলেই ঠিক হয়ে যায়। মেয়ে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আপনি কবে ছেলে দেখতে যাবেন বলুন।

উমেশবাবু যেন বাঁচলেন, মেয়েদের স্বভাবের দোষ দিয়েই এ যাত্রা রক্ষা হলো, কিন্তু তাঁর মেয়েকে তিনি তো জানেন, বললেন, ধীরে ধীরে, বড় মেয়ে ওর মতটা আমি নিজে একবার জেনে আপনাকে জানাবো—

আমার ঐ একটি মাত্র বোন, ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারব না কাকা বাবু মাপ করবেন, বললো বড়দা বিনীত ভাবে।

মেজদা বললো বিয়ের ভয়ে ও হোষ্টেলে পালিয়েছে, অথচ ঘরে ফিরে ওকে না দেখতে পেলে আমাদের মনে হয় সারা বাড়িটা খালি—

বিয়ে তো দিতে হবে বাবা, বললেন, জমিদারবাবু।

হ্যাঁ দিতে অনিচ্ছা নাই, কিন্তু ওর মত না হলে দিতে পারবো না, ওকে খুশি করতে আমরা তিন ভাই সর্বস্ব দিতে পারি। ওযে আমাদের কত স্নেহের ধন তা বলে বোঝানো যায় না কাকাবাবু বড়দা বললো। তা তো বটেই? মেয়েও খুব ভাল, আমার স্ত্রী ওকে দেখেছে ওদরে পিকনিক পার্টিতে তাঁরই ইচ্ছে বৌ করে নিয়ে যাওয়া। বেশ ওর মত নাও তোমরা। জলযোগ সেরে তিনি উঠলেন। যাবার সময় আবার বললেন—

আমার ছেলেকে দেখলে ওর পছন্দ না হবার কারণ নেই। যদি মনে কর তো তার ব্যবস্থা হতে পারবে। মাকে আমার খুবই ভাল লেগেছে। ছেলের বাপ হয়েও তাই এতকথা বলছি। আমার বাড়িতে ও লক্ষ্মীর আসন পাবে!

ওরা চলে গেলেন। এমন একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি এতটা নামলেন তিনি মাধুরীকে পুত্রবধু করবার জন্য অথচ মাধুরী যে ব্যবহারটা ওর সঙ্গে করলো, অন্য বাড়ি হলে এ রকম মেয়ের অদৃষ্টে কি যে লাঞ্ছনা হতো বলা যায় না। কিন্তু এখানে ওসব কিছু হবার যো নাই! বৌরা জানে, মাধুরীকে কিছু বললে দাদারা সহ্য করবে না। যদি কিছু বলে তো দাদারাই বলুক। মেজবৌ বড়বৌ ছোটবৌ সব বিরক্ত হয়ে গেল! দাদাও চলে গেল, বসে রইলেন উমেশবাবু একা। মহেন্দ্র ও কি করবে ভাবছে ও দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দেখতে পেল মাধুরী এসে দাঁড়ালো তাঁর বাবার কাছে উনি গড়গড়া টানছিলেন। মাধুরীর চোখে জল! আঁচলে মুছে বাবার পা তলে বসলো। পায়ে হাত দিয়ে বললো, তোমাকে বড় দুঃখ দিলাম বাবা, কিন্তু কি করবো। কেন তোমরা আমাকে এমন অবস্থায় ফেল।

অপমানের কথা ভুলে গিয়ে উমেশবাবু ওকে কোলে নিলেন, বললেন তোকে যোগ্যপাত্র দিয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই মা—

আমার সম্বন্ধে চিন্তার কি আছে বাবা, আমাকে কেন এত দুর্বল মনে করছ? আমি নিজের ভার নিজেই সইতে যথেষ্ট সক্ষম। বিয়ে ছাড়া কি মানুষ বাঁচে না বাবা। পৃথিবীতে কুমারী মেয়ে বিস্তর রয়েছে—

আচ্ছা মা তোকে বিয়ে দেবার চেষ্টা আর করবো না থাক, তোর যেমন ইচ্ছে থাক— বলে মাধুরীর চোখ মুছে দিলেন তিনি।

তুমি খুব ভাল ছেলে বাবা বলে হাসলো মাধুরী অম্লান হাসিয়া বললো আমার বিয়ের খরচের টাকা গুলো আমাকে দিয়ে দাও। আমি ঐ টাকায় দম—দমার বাগানে একটা গোশালা করি—

গোশালায় কি হবে রে, হাসলেন উমেশবাবু।

দুধ হবে, ঘি হবে, মাখন হবে, দেশের ছেলেরা খাবে আর আমিও পয়সা পাব। গরীবদের দুধ মাখন বিলাবো। মা যশোদা হয়ে যাব বাবা।

কিন্তু গরু পোশা বড্ড ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার মা, ওসব চাষ শিখতে হয়।

আচ্ছা বাবা তাহলে ফুলের চাষ করবো ওখানে, তাও যদি না চাও তো কচুর চাষ—

কচু, বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠলো উমেশবাবুর।

হ্যাঁ বাবা, কচু খুব ভাল জিনিস, কালি কচু, ধলি কচু—সার মান কচু, জল কচু, কলম কচু।

ওতে কি রোজগার হবে হবে—

রোজগারের জন্যে তো আমি যাচ্ছি না বাবা, আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে মানুষ মেয়ে হোক বা ছেলে হোক, কীটপতঙ্গ নিয়ে তাদের খুঁটিনাটি খুঁজেও হাজার বছর কেটে যায় বাবা, নেশা খুব ভাল নেশা, যাকে বলে সাধনা। মাধুরী যেন তার বাবাকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বাবা বললেন, আচ্ছা তোর যা ইচ্ছা করিস, বলে আবার হাসলেন তিনি। অতঃপর আর কোন কথা না বলে মাধুরী বেরিয়ে গেল ওখান থেকে। মহেন্দ্রও অন্য দরজা দিয়ে এল ভিতরে। বৌদিরা মাধুরীর উপর রেগে আছে, কিন্তু মাধুরী ওদের গ্রাহ্যই করে না। সটান এসে বললো বড়বৌদিকে, খেতে দাও কিছু, আর শোন, হোষ্টেল থেকে বাড়ি ফিরে আসবো কাল। পরশু থেকে দমদমার বাগানে তপস্যা আরম্ভ করবো।

তপস্যা! কিসের তপস্যা ছোটদি। বড়বৌদি হাসলো।

প্রজাপতিরা কেমন করে ঘর বাঁধে, কি খায়, কতদিন বাঁচে, তার হিসেব রাখার তপস্যা, বুঝলে?

না ভাই, ও জেনে কি হবে?

ওরা সৃষ্টির সুন্দর জীবন ওদের জানলে চিরসুন্দরকে জানা যায়, আর এক পিস পুড়িং দাও, ব্যস, বড়দাকে বলো কাল এসে দেখা করবো। চলো মহীনদা আমার পৌঁছে দাও, বলে উঠলো মাধুরী।

আগে পতি, তারপর প্রজা হয়, জানিস। বড়বৌদি বললো।

ওটা তোমার জন্যে, আমার জন্যে শুধুই প্রজা, আমি স্বয়ং তাদের পত। চলো মহীনদা—

মহেন্দ্র ওকে নিয়ে বাড়ির গাড়িতেই চললো। রাস্তায় কোন কথা হল না, নামবার সময় মাধুরী বললো, সোনায় বাঁধা মোয়া আমি পারলাম না মহীনদা।

লোহার শেকল বড্ড ভারী হয় মাধুরী।

হোক, আমি বইতে পারবো, চলে যাচ্ছে মাধুরী, মহেন্দ্র বললো আবার ঐ শেকল তোমার গলায় ফুলের মালা হয়ে উঠুক।

চন্ডীপুরে মেলা হয় চৈত্র সংক্রান্তির সময়, খোকনের উৎসাহের অন্ত নাই, সবার বড় কথা কাকু আসবে।

কাকু আসবে আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেল। মাকে বললো—

আজ তো সোমবার মা কাকু তাহলে কবে আসবে?

পরশু বুধবারে সকালেই এসে যাবে তোর কাকু।

অতঃপর ভাতগুলো গিয়ে স্কুলে চলে গেল। পাঠ্য মুখস্ত করছে দিন রাত কোথাও যেন ভুল না হয়। বড় পাঠ বৃষকেতুর অভিনয়। খোকন দর্শকদের কাঁদিয়ে ছেড়ে দেবে। কাকু এলে আরও ভাল করে শিখে নিতে হবে।

কিন্তু পরশুর এখনো অনেক দেরি আর সেদিনই তো যাত্রা হবে, তাহলে শিখবে কখন? তারপর সং আছে, তাতেও খোকনের অংশটা আছে একটা। সং এ ওকে 'বর' করা হবে, কনের বয়স চল্লিস, খোকন তার কোলে চেপে বিয়ে করবে ইত্যাদির কথা ভাবছে খোকন।

পরশু এসে পড়লো, এবার কাকু এলেই হয়, অবশেষে কাকুও এল, কিন্তু খোকন এখানো তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না। এই কয় মাসে খোকন যেন অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে, কোলে চাপা কি আজ ঠিক হবে কিন্তু কাকু ধরেই কোলে নিল, এবং ঠিক তেমনি আদর করতে লাগলো, অতএব খোকন বড় হয়নি।

কলকাকলি ছুটিয়ে দিল কাকুর সঙ্গে। ঘন্টাখানেক বিরামহীন বাক্যস্রোত, কত যে বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করলে তার লেখার যোগ্য নেই। অবশেষে অর্পণা বললো এবার ছাড় দেখি কাকুকে, জলটল খেতে দেই—

হ্যাঁ মা দাও না তুমি জল খেতে—কোলে চড়েই বললো খোকন। খোকনকে সঙ্গে নিয়ে জলযোগ করলো মহীন, তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলো পাড়ায়। গ্রামের সকলেই খবর নিল ওর কাজকর্ম কেমন, মাইনে কত উন্নতির আশা কতখানি আছে ইত্যাদি। কয়েকমাস পরে গ্রামখানা যেন কেমন নতুন লাগছে, কিন্তু ঐ সঙ্গে একটা বিশেষ ব্যাপার মনে পড়ছে, যার নিরা করণ মহেন্দ্র করতে পারলো না। ব্যাপার এই— দিন চার পাঁচ আগে মহেন্দ্র শ্যামবাজারে গিয়ে বললো যে সে একেবারে বাড়ি যাবে। উমেশবাবু সপরিবারে বাইরে যাবেন গ্রীস্মটা কাটাতে মাধুরীও যাবে। অকস্মাৎ মাধুরী বললো— মহীনদার সঙ্গে ওদের বাড়ি ঘুরে আসি না বাবা।

তা কি করে হবে মা, ওতো কয়েক দিন পরেই ফিরবে, তুই থাকবি কোথায়। কলকাতায় তো কেউ থাকবে না?

ফেরার পথে মহীনদা আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে তোমার কাছে।

হ্যাঁ, তা হতে পারে উমেশবাবু বললেন। কিন্তু মহীনের আপত্তির যথেষ্ট কারণ ছিল গরীবের বাড়িতে এই ধনীকন্যার সম্মান হয়তো ক্ষুন্ন হবে। পল্লীর আচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে মাধুরীর কোন ধারণা নেই। তারপর এতবড় অবিবাহিতা মেয়ে দেখে লোকে হয়তো ওর সম্মুখেই কিছু খারাপ কথা বলে ফেলতে পারে—মহেন্দ্র এই সব কথা ভাবছে। মাধুরী ওর পানে চেয়ে বললো তোমার বোধহয় নিয়ে যাবার ইচ্ছা নেই, না মহীনদা? অনিচ্ছার কথা নয় তুমি সেখানে থাকতে পারবে কিনা ভাবছিলাম। আচ্ছা সে আমি বুঝবো বলে মাধুরী আবার বলল, বাড়িতে খবর দিও না। হঠাৎ গিয়ে পৌঁছাব বলে চলে গেল।

একই সঙ্গে হাওড়া এল সব। উমেশবাবু সাতটা দশের ট্রেনে উঠেছেন। আর

আটটা, ছত্রিশের ট্রেনে মহেন্দ্র মাধুরী ছাড়বে। উমেশবাবু এবং অন্য সবাই গাড়িতে উঠলেন মাধুরী ও উঠলো। মহেন্দ্র দেখে প্রশ্ন করলো—

ও কি? তুমি উঠছ যে— আমাদের বাড়ি যাবে না?

কৈ আর গেলাম—বাবাকে একলা ছেড়ে দিতে ভরসা হচ্ছে না।

একলা কোথায় মাধুরী—সবাই তো যাবেন ওর সঙ্গে?

তা হোক আমি না থাকলে বাবা বড় অসহায় হয়ে পড়েন, তাছাড়া তোমার বাড়ি দেখা পালিয়ে যাচ্ছে না, পরে গেলেই হবে।

ট্রেন ছেড়ে দিল—যেন পশ্চিম দেশটাই পালিয়ে যাচ্ছে, এমনি ভাবে মাধুরীও। অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে ভাবলো মহেন্দ্র, তারপর নিজেই ট্রেনে উঠলো এসে। মাধুরী না আসায় ওর অনেক চিন্তার অবসান ঘটেছে— কিন্তু কেন মাধুরী আসবে বলে এল না এইটা মহাচিন্তার ব্যাপার। কিন্তু এ নিয়ে কারো সঙ্গে কিছু আলোচনা করা চলে না। আপনার অন্তরেই মাধুরীর কথা গোপন রেখে মহেন্দ্র হুল্লোড় করে কাটিয়ে দিল। চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব, খোকনের অভিনয় এবং মহেন্দ্রের সেতার বাদ্য সব মিলে বাড়িটা বেশ গমগম হয়ে রইল এই কটা দিন।

যথাকালে মহেন্দ্র আবার যাত্রা করলো কলকাতায়। মেসে এলে একটা ঘরে শুয়ে ভাবতে লাগলো, মাধুরী কলকাতায় নেই, শনিবার কেউ আর গাড়ি নিয়ে এসে ডাকবে না, চলো মহীনদা। পরদিন মহীন একখানা চিঠি পেল মাধুরী লিখেছে।

শ্রীচরণেষু মহীনদা, তুমি আমায় নেহাৎ দায়ে পড়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে। এতবড় ধিঙ্গি মেয়েকে নিতে তোমার ইচ্ছে ছিল না। লোকে হয়তো খারাপ কিছু ভাবতে পারে এই কথা তুমি ভাবছিলে তাই গেলাম না। বড়লোকে প্রণাম করতে যদি সময় সুযোগ কখনো হয় তো যাব। প্রণাম জেনো মাধুরী।

কথাগুলোতে একটা তীক্ষ্ণ সত্য রয়েছে। মহেন্দ্র চিটিখানা পড়ে জবাব লিখে দিল— মাধুরীর বুদ্ধি তাকে ঠিক পথেই চালিত করেছে।

মেসের লোক কিন্তু বড় নিরাশ হয় শনিবার দিন। বরাবর প্রশ্ন করে, এখনো তিনি কলকাতায় ফেরেন নি? না, দেরী আছে ফিরতে বলে মহেন্দ্র হেসে চলে যায়। মাধুরী না আসায় মহেন্দ্রের চেয়ে এদের দুঃখই যেন বেশি হয়ে উঠেছে, অমনি ভাব। মাধুরীর পরবর্তী পত্র এল। সে লিখেছে—

দেশে ইনফেকশান চলছে, কিন্তু মানুষের এত দৈন্য যে, দেখা যায় না। ভাত নাই, কাপড় নাই, কচি ছেলের দুধ নাই, কি আছে মহীনদা জানো? আছে ভাষণ, আছে ভেজাল, আছে ভন্ডামী।

মহেন্দ্র পড়ে একটু হাসলো, তারপর বেরিয়ে গেল অফিসে। মাধুরীদের ফেরার সময় হয়েছে, এবার হঠাৎ একদিন সে এসে পড়বে মেসের দরজায় কিন্তু দিন পার হয়ে যাচ্ছে, মাধুরী ফিরছেই না। শুনলো সে নাকি মেজদার সঙ্গে বোম্বাই গেছে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে তারপর শুনলো মালয়ে গেছে সে মেজবৌদির সঙ্গে—এরপর হয়তো শুনবে আমেরিকায় গেছে মাধুরী।

মহেন্দ্র গভীর নিশীথে সেতারটা কোলে নিয়ে বসে ভাবে কতদূর আজ সেতারের অধিকারিণী। বর্ষার আকাশ আর্দ্র করে মহেন্দ্র কণ্ঠ থেকে করুণ রাগিণী ঝঙ্কার তোলে— সে কথা কি গেছে ভুলে?

নিস্তব্ধ নিশীতে মহেন্দ্র সেদিন অনুভব করলো মাধুরীকে লাভ করবার যোগ্যতা তার থাকলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু একটা অন্তরায় রয়েছে, যাকে অতিক্রম করা অসাধ্য। পাংশু মুখে কথাটা চিন্তা করতে করতে মহেন্দ্রের চোখ ফেটে জল পড়তে লাগলো। কিন্তু মানুষের অন্তর চিরদিন আশাকে আশ্রয় করে। মহেন্দ্রও করলো।

সকালেই ডাকল দরজায়, মাধুরীর মধুর কণ্ঠ, মহীনদা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল মহীন। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দরী সম্মুখে।

কত কথা তোমার সঙ্গে আছে আমার মহীনদা, বলতে বলতে ঘরে ঢুকে বসলো মাধুরী একটা চেয়ারে। মহেন্দ্র মুখ হাত ধুয়ে বাইরে গেল। ফিরে দেখলো মাধুরী গরম

জলে চা ছেড়ে রুটিতে মাখন লাগাচ্ছে। মহেন্দ্র ঘরে ঢুকতেই ওর পানে চেয়ে মাধুরী প্রশ্ন করলো তোমায় যেন কিছু শুকনো দেখাচ্ছে মহীনদা, শরীর ভাল?

হ্যাঁ, যথাপূর্ব। বলো তোমার কি অনেক কথা—

মাধুরী চা তৈরী করতে আরম্ভ করলো, বোম্বাই, সিংহল এবং মালয় ভ্রমণ কাহিনী। খুব ধীরে বসিয়ে বলছে চা খেতে খেতে শুনছে মহীন। অকস্মাৎ মাধুরী কথা থামিয়ে বললো।

দেশ দেখার আনন্দ তোমাকে জানাতে আসিনি মহীনদা, নিজেকে খুঁজে বেড়াবার দুঃখটা জানতে চাইছি—

নিজেকে খুঁজেতে তো দেশে দেশে ঘুরতে হয় না মাধুরী, নিজের মধ্যেই খুঁজতে হয়।

না, নিজের মধ্যে নিজেকে খোজা অধ্যাত্মসাধনা, সেটা আত্মকেন্দ্রিক, আর বিশ্বের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করা বিশ্বকেন্দ্রিক, সেটা প্রেমের সাধনা মহীনদা।

মহীন কিছু বললো না, মাধুরীর মুখপানে তাকিয়ে রইল। মাধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে তার নিজের কথাটা ভাবলো তারপর বললো আবার—

মানুষকে দেখলাম বহু দেশে বহু অবস্থায় থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলতা সব ঐ একটা বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে আমার মনে হয়, বিশ্বে যা কিছু উপজীব্য একমাত্র প্রেম। তুমি একদিন বলেছিলে তোমার ক্ষেত্রে অনন্তের চারণভূমি তখন এটা বুঝিনি। মহেন্দ্র এবারও কিছু বললো না, চা খাওয়া শেষ করলো। মাধুরী বললো, আজ রবিবার তোমার ছুটি, বিকালে যাবে ওখানে। আজ বড়বৌদির খোকার জন্মদিন, একটা খেলনা নিয়ে যেও। উঠলো মাধুরী, তোমার হয়তো খেয়াল হবে না বলে খেলনার কথাটা জানিয়ে দিলাম যাচ্ছি। চলে যাচ্ছে মাধুরী।

ওখানে বড় বড় লোক আসবেন, কত কি দেবেন, তার মাঝে আমার চার পয়সার ভেপু মানাবে মাধুরী। আমি খালি হাতেই যাব।

না, মাধুরী ধমক দিল চার পয়সাও খরচ করতে হবে না, একটা আশীর্বাদ ছড়া লিখে নিয়ে যেও চলে গেল মাধুরী।

মহেন্দ্র ভাবতে লাগলো। না, খালি হাতে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু কি সে নিয়ে যাবে? অবশেষে একটা ছড়াই লিখলো। ছেলেটার ডান নাম বাদল বর্ষার দিনে ওর জন্ম তাই এই নাম। মহেন্দ্র লিখলো—

বাদল যখন আসে লুটিয়ে পড়ে ভাসে——
গাছের পাতায় গড়িয়ে পড়ে ফুলের বুকে হাসে।
বাদল এলে মাদল বাজে মেঘের আঙিনায়
খালের জলে, বিলের জলে, একটি হয়ে যায়,
আমার কাছে, তোমার কাছে কোথাও কিছু ফাঁকা না আছে
সকল জুড়ে থাকে বাদল সকল জানার পাশে।
এই দুনিয়ায় বাদলকে তাই সবাই ভালবাসে।

ছড়াটা লিখে ভাবতে লাগলো মহেন্দ্র, বেপথু মধুর মত অন্তরটা তার কে জানে কি বলবে এ ছড়া দেখে। হয়তো ভালো হলো না, হয়তো হাস্যকর হবে ব্যাপারটা! কিন্তু আর কোন উপায় নাই, একখানা লাল রং এর পুরু কাগজে মহেন্দ্র লিখলো শ্রীমান বাদল পঞ্চম জন্মদিন, তার পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে ছড়াটা লিখে দিল, আশীর্বাদ মহীন কাকা। অতঃপর রওনা হোল সন্ধ্যার সময়। এই কাগজটাই সে উপহার দেবে বাদলকে সামনেই মাধুরী বললো দেখি কি এনেছ বাদলের জন্য।

মহেন্দ্র ভয়ে ভয়ে গোটানো কাগজটা দিল তার হাতে। মাধুরী ওটা নিয়েই চলে গেল, মহীন এল বসবার ঘরে। মাধুরী নিজের ঘরে গিয়ে কাগজটা খুলে পড়লো, বেশ বড় কাগজখানা ওর পাশে তুলে দিয়ে একটা পদ্মকুড়ি এঁকে দিল আর তার পাশে আঠা এঁটে দিল বাদলের একখানা ছোট ফটো। তারপর বড় একখানা ফটো ফ্রেমের মধ্যে

ভাল খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ালো। এখন ওটা বাঁধানো হয়ে গেছে দেখার মত বস্তু হয়েছে।

এত বড় বাড়িতে ছেলে ঐ একটিই, কাজের উৎসবটা খুব জোরালো হচ্ছে। বিস্তর অতিথি আসতে লাগলেন আশীর্বাদ করতে। তাদের উপহারের মধ্যে প্লাষ্টিকের খেলনা থেকে প্যারাম্বুলেটার পর্যন্ত আছে, খেলনার শেয়াল কুকুর থেকে সোনার গয়না পর্যন্ত সব সাজিয়ে রাখা হচ্ছে একটা টেবিলে।

মহেন্দ্রের হাতে কোন ফাঁকে মাধুরী কাগজ জড়ানো ফটো ফ্রেমটা দিয়ে বলল, দাও এটা বাদলের হাতে—

কি এটা?

অত খবরে কাজ কি? দাও গিয়ে যাও—

মহেন্দ্র নিশ্চয় জানে মাধুরী তাকে বিপন্ন করবে না। এতখানি বিশ্বাস আর কাউকে করতে পারে না এখানে। নিঃশব্দে নিল জিনিসটা? গিন্নীর স্বয়ং কোলে নিয়েছিলেন বাদলকে। কাগজ খুলে দেখলেন ঝকঝকে একটা ফ্রেম আর তার মধ্যে কি যেন লেখা হাসিমুখে রেখে দিলেন। ধানদুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ সেরে মহেন্দ্র এসে বসলো একধারে।

কত রকমের কত উপহার এসেছে কিন্তু মহেন্দ্রের উপহারে অভিনবত্ব অবাক করে দিয়েছে সকলকে। বড়বৌদি স্বয়ং দেখে অত্যন্ত খুশী হোল বড়দাও আনন্দিত একবারে সামনেই ওটা রেখে দেওয়া হয়েছে। বাদলের মামা বরুণবাবু ওটা তুলে নিয়ে পড়লো জোরে বললো, তুমি চমৎকার লেখ তো মহীন?

কবিতা এমন একটা জিনিস যা বাজারে কেনা যায় না এত লোকদের এত মূল্যবান উপহার মলিন হয়ে গেল, এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে মহেন্দ্রকে। কিন্তু ভেবে লাভ নাই মহেন্দ্র তৃণখন্ডবৎ উড়ে চলে যাবে নিয়তির নিষ্ঠুর পান্থশালায়।

সুন্দর কবিতা হয়েছে ঠাকুরপো, বড়বৌদি বললো হেসে—খাওয়ার পর তোমাকে একটা কথা বলবো শুনে যেও চলে গেল বড়বৌদি। নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু কি বলবে কথা, যদি কিছু বলবার থাকে তো এক্ষুনি বললেই হোত। মহেন্দ্র মহা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে গিয়ে ভাল করে খেতেই পারলো না। কিন্তু বড়বৌদি খারাপ কিছু বলবে না নিশ্চয়।

তবু মহেন্দ্র দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে রইল, শুধু দুশ্চিন্তা নয় একটু আতঙ্কিত খাওয়া হলো, অতিথিরা সব বিদায় গ্রহণ করেছেন, বড়বৌদি তখনও কাজে ব্যস্ত। অবশেষে এসে বললো—

এতক্ষণে ফুরসৎ পেলাম ভাই—

তাহলে কথাটা এবার বলুন বৌদি।

হ্যাঁ, মাধুরীকে তোমার কেমন লাগে মহীন? হাসছে বড়বৌদি।

কিন্তু মহেন্দ্র ভয় পেয়ে গেল রীতিমত। এ রকম প্রশ্ন করার অর্থ কি? মহীন কি কোন রকম অবিশ্বাস ভাজন হয়েছে। কিন্তু চুপ করে থাকা চলে না, বললো কেন, বৌদি, হঠাৎ এ প্রশ্ন করলেন।

করলাম, আমার মনে হয় ঠাকুরপো, মাধুরী তোমাকে ভালবাসে—

ভালবাসে? আমায়?

হ্যাগো মশাই তোমায়, বলে আবার হাসলো বড়বৌদি, আর যতটা বুঝেছি তুমিও ভালবাস তাকে।

না, বৌদি একি আপনি বলছেন, আমি তার কোনো রকমে যোগ্য নই— যোগ্য কিনা সেটা আমরা বুঝবো, মাধুরীকে আমরা সুখী করতে চাই মহীন।

হ্যাঁ নিশ্চয় আমিও চাই সে রাণী হোক—

রাণী হলেও সুখী হয় না বোকারাম তুমি কবি তোমাকে এর চেয়ে কি বোঝাব! ওকে আর আমরা সুতো ছেড়া লাটাইয়ের মত ঘুরতে দেব না। মহীন লাটাই এ বেঁধে দেবো।

সুতো ছেড়া ঘুড়ি—

না তো কি। বোম্বাই, সিংহল কোয়েম্বাটোরে, এত কি কাজ। তোমার বাড়ি না যেতে পারার অভিমান জানো। হাসলো বৌদি, বললো রাত হোল যাও। তোমার কবিতাটা আমার বড় ভাল লেগেছে। টাকা দিয়ে তুমি হাতি কিনে আনলেও আমরা খুশী হতাম না।

চলে গেল বড়বৌদি মহেন্দ্র নতমুখে বসেছিল। কিন্তু আর বসে থাকা চলে না। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যাবে তার।

উঠে রাস্তায় এসে মহেন্দ্র একখানা রিক্সা ভাড় করলো। নিশ্চুপ বসে যেতে পারবে— আপনার মনকে অনুভব করবে—উপভোগ করবে। আনন্দ দেহের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে ওর অন্তরকে আরক্ত করে তুলেছে, কিন্তু মহেন্দ্র চিন্তাশীল ব্যক্তি। সে ভাবলো যে সহজ সত্যকে সে এতকাল স্বীকার করতে চায়নি অন্তস্থলে তলিয়ে দিয়েছে আজ যেন সেই সত্যটা অপরের দুঃখের ভাষা পেয়ে তাকে আদালতে দাঁড় করিয়ে শুধু স্বীকৃতির স্বাক্ষরই নিল না, টিপসই পর্যন্ত আদায় করে নিল কিন্তু মহীন সত্যকে অস্বীকার করে লাভ কি? চেয়ে চেয়ে দেখলো অন্তরের পরতে কখন মাধুরীর ছবি আঁকা হয়ে গেছে, ও ছাড়া কিছুই নাই আর দেখতে পাচ্ছে না মহেন্দ্র। মনটা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সারা অঙ্গ ওর একি অন্তঃসলিল। প্রেমবন্যা, একি আন্তর্দাহী প্রেমবহ্নি?

কখন যে গোলদীঘির মোড়ে এসে পৌঁছেছে মহীন, কোন পথে কেমন করে কিছুই খেয়াল নেই। রিক্সাওয়ালা ডাক দিল বললো—

বহুত শান্তি হো গিয়া বাবু এৎনা মাৎ পিজিয়ে!

কিয়া মাৎ পিয়েগা? মহেন্দ্র বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

দারু আউর ক্যা। আর রাস্তা তো বাৎলাইয়ে, কিধার যায়েগা।

মহেন্দ্র কিছুমাত্র প্রতিবাদ করলো না, ওকে মাতাল বলার জন্য ঐখানেই নেমে পয়সা ক গন্ডা দিয়ে বাকী পথটুকু হেঁটে এল ভাবতে ভাবতে, সে সত্যি যেন একটা অসাধারণ মদ খেয়েছে যায় নেশা ওকে এজন্মে শুধু নয় বহু জন্ম মাতাল করে রাখবে।

মেসে এসে আলো না জ্বেলেই বিছানায় শুয়ে পড়লো মহীন। আশ্চর্য যে কথা নিজেই সে ভাল করে জানেনি সেই কথা বাইরেও প্রকাশ হয়ে গেল বিশ্বে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে তার অন্তরের গোপন চাঁদ। কিন্তু মহেন্দ্র তা জানতে চায় না। কোথাও কাউকে সে বলেনি মাধুরীর কথা— বাড়িতে কে কে আছেন মহীন?

কর্তা গিন্নী তিন ছেলে বৌ আর কুমারী মেয়ে পড়ে কলেজে।

এর বেশী মহেন্দ্র আর কিছু বলেনি বৌদিকে! মাধুরীর নামটা পর্যন্ত নয় কারণ মাধুরীর স্নেহ সহানুভূতি মাখা অন্তরটা সে বৌদির অন্তরে সঞ্চারিত চায়নি। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখাতে চায় না কাউকে। কিন্তু একি সত্য হবার। একি সত্যি হবে। এই স্বপ্ন এই অলীক কল্পনা! না, সত্য কাজ নেই এ স্বপ্নেই থাক কারণ মহেন্দ্র আর ভাবতে পারলো না।

সকালে স্নানাহার সেরে অফিসে গেলো মহেন্দ্র এবং এমনি সপ্তহটা কেটে গেল, মাধুরী খোঁজ নিল না, বড়বৌদি ওকেও ফোন করে বললো না। কী এক অবস্বাদের হীনতা ওকে আচ্ছান্ন করে প্রতি মুহূর্তে।

কি সে? জানে না মহেন্দ্র! কি আতঙ্ক কি এক অবস্বাদ না না কি এক অনিবার্যতার ভয়াবহ পরিণাম ওকে শৃংখল, কিন্তু মহীন আর বেশী ভাবতে ভয় পেল নিদারুণ আতঙ্কে চমকে উঠলো মহীন।

ব্যাপার কি মহীনদা? আজ সাতদিন একেবারে ডুব দিয়েছ, মাধুরী বললো এসে।

লুকোবার ঐটা ভাল জায়গা মাধুরী।

পিছনে যদি মাছরাঙা থাকে তো ডুবেও নিস্তার নেই জানো? বসে পড়লো মাধুরী চেয়ারে!

মাছরাঙা আকাশের জীব বলে জলে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। তার খাদ্যের জন্যে একটা মাছ পালালে আর একটা মাছ সে ধরতে চেষ্টা করবে জলে ডুবে মরবে কেন?

কেন এমন কথা বলছে মহীনদা—মাধুরীর চোখে সীমাহীন বেদনার পাবার উথলে উঠলো মাছরাঙাদের পেশা বুঝি একটা না পেলে আরেকটা ধরা। খেয়ে তাদের বাঁচতে হয়, মাধুরী মহেন্দ্র অতি অল্প কথায় উত্তর দিল।

মাধুরীর চোখের করুণা দেখে দ'জনেই চুপচাপ। তারপর মহেন্দ্র আবার বললো চা খাবে মাধুরী?

না, চলো বাইরে গিয়ে খাব, অকস্মাৎ বললো, তুমি কি আমাকে মাছরাঙা মনে কর মহীনদা?

তুমি নিজেই মাছরাঙার উপমা দিয়েছ মাধুরী আমি নই।

হ্যাঁ কিন্তু শোন।

থাক মাধুরী, কথার কথা গেঁথে লাভ কি।

লাভ, কাব্য হয়।

হ্যাঁ কিন্তু কাব্য জীবন নয়। জীবন থেকে কাব্য জন্মায়, কাব্য থেকে জীবন জন্মায় না। কবিতা জীবনে ভোজ্য জীবন তো কবিতার ভোজ্য নয় মাধুরী। জীবন তপন ক্লিষ্ট ঋষি দুঃখ দৈন্য স্বভাব উৎপীড়নে আনন্দে অবসাদে চলে তার তপস্যা কখনও আলোতে কখনও অন্ধকারে কখনও দীর্ঘায়ুতে, কখনো ক্ষীণায়ুতে কখনো ধনীর প্রসাদে কখনো দরিদ্রের কুটিরে আপনাকে পূর্ণ করে চলে, তারপর তপোবনে শুধু হরিণ শিশুই চরেনি শাদুলি সারমেরাও বিচরণ করে চলে। কোথায় যেতে হবে?

এ প্রশ্ন কেন করলে আজ আবার মহীনদা? আমি যেখানে নিয়ে যেতে চাই, তুমি কেন সেখানে যেতে ভরসা করছো না, কেন? মাধুরীর স্পষ্ট ক্রন্দন যেন।

মাছরাঙা মাছের শত্রু মাধুরী, মহীন হাসলো কথাটা বলে। কিন্তু মাধুরীর মুখ তেমনি করুণ গম্ভীর। দু'জনে একটা দোকানে ঢুকে গেল, মাঝে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো গাড়ীতে চড়ে, কিন্তু প্রয়োজনীয় কয়েকটা কথা ছাড়া আর কোন কথা হল না ওদের? অবশেষে একটা সিনেমায় গিয়ে কিছুক্ষণ কাটাল সেখানে সেই নীরবতা। অবশেষে মাধুরী বললো জোর করে যেন।

পায়ে পড়ে ফুলকে মাড়িয়ে যেও না মহীনদা।

না মাধুরী, পাশ কেটে চলে যেতে চাই—

না? মাধুরীর কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। অন্ধকার ঘরের মধ্যে, চোখের দীপ্তিও। সব ফুল সব পূজায় লাগে না মাধুরী, শাস্ত্রের নিষেধ আছে।

লাগলে কি হয়? মাধুরীর মুখখানা অত্যন্ত কাছে আনলো মহেন্দ্র। অন্ধকার ঘর সুরভিত মুখকমল, মহেন্দ্র অতিকষ্টে নিজেকে সংবরণ করে আস্তে আস্তে বললো পূজা ব্যর্থ হয় না, কিন্তু কথাটা মাধুরীর গলায় আটকে গেল।

অকস্মাৎ আলো জ্বলে উঠলো, শেষ হলো ছবি, মাধুরী ত্বরিত আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকলো? কিন্তু তবু দেখতে পেয়েছে মহেন্দ্র ওর চোখে জল। স্নেহের সুকোমল স্বরে বললো।

মানুষ বড় অসহায় মাধুরী তার জীবনে মধু থেকে জল বেশী, তার বিষ মধুর মধুকেই শুধু নষ্ট করে না মৌচাকেও শত ছিদ্র করে দেয়।

মধুটা তা বলে ফেলনা নয়।

না, কিন্তু তাকে ধরবার শক্তি মৌচাকের থাকা দরকার নইলে গড়িয়ে যাবে।

গোপাল মল্লিক লেন পর্যন্ত আর কোন কথা হয়নি। কিন্তু মহীন নামবার পর মাধুরী বলেছিল, তোমার মধু গড়িয়ে যাবে না, জমে মোমের পুতুল হয়ে থাকবে।

গাড়ী চলে গেল, কিন্তু মহীন দেখছে, গাড়ীর ভিতরে ঐ মানুষ পুতুলটার চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। কিছু বললো না মহীন নিঃশব্দে ঘরে এসে দাঁড়াল।

চোখের জল যার পড়ে তার ভাগ্য ভালো, মহীনের চোখ দু'টা জ্বালা করছে, সইতে পারছে না কিন্তু চোখ বুজেও ঐ রকম অবস্থা। আকাশের তারা যে স্নেহ সজল দুটি চোখ, বাতাসের শিহরে শিহরে যেন সেই উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, জ্যোৎস্নার ধারায় যেন সেই ব্যথা করুণ, সমর্পণ, না মহীন ঘরে টিকতে পারবে না। কোথায় যাবে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে মহীন।

আঘাত, নিষ্ঠুর আঘাত করেছে সে মাধুরীকে, অতখানা না করলেও কি হোত না? আরো হয়ত করতে যাবে আঘাত, রক্তাক্ত করে দিতে হবে ওর অন্তর, আর সেই সঙ্গে মহীনেরও সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হয়ে যাবে। কিন্তু যে আঘাত আজ হয়েছে, তাই কি যথেষ্ট নয়, তার প্রমাণ মাধুরীর শেষের ওই কথাগুলো। মোমের পুতুল হয়ে থাকবে সে। কেন সে বললো ওকথা?

যতখানি মাধুরী আজ এসেছিল, কোন মেয়ে এতটা আসে না, কিন্তু মহীনের নিষ্ঠুর প্রত্যাখান কি ফিরে তাকে নিয়ে যাবে না তার আপন স্বর্ণ সিংহাসনে? ফিরে যাক মাধুরী, আপন আসনে ফিরে যাক।

মহীন কি কোনদিন মাধুরীর অন্তর জয় করবার চেষ্টা করেছে। কৈ মনে তো পড়ে না। কিন্তু এতদিনের কত কথা কাকলী কে জানে দুর্বল মুহূর্তে কি বলে ফেলেছে মহেন্দ্র। হ্যাঁ একদিন বলেছিল মহীনকে খাওয়াবার অধিকার মাধুরীর আছে, উত্তরে মহীন বলেছিল হ্যাঁ আছেঃ কিন্তু খাওয়াবার অধিকার প্রতি নারীর আছে, এ অধিকার এদের বক্ষ পীযুষের স্বাক্ষর। হ্যাঁ আর একদিন মাধুরী বলেছিল, নিজেরটাই দাবী করে আনন্দ। মহীন বিশেষ কিছু বলে নাই উত্তরে। কেন বলে নাই? বললেই হোত যে যোগ্যপাত্রে দান করতে হয়। অনেক ভুল করেছে মহেন্দ্র, অনেক অন্যায় অকর্তব্য হয়ে গেছে তার। আরো সোনায় বাধানো নোয়া নিয়ে করা মাধুরী, প্রমাণ করেছিল ওকে ওই প্রণামটা ওর আত্মসমর্পণের প্রণাম নাকি। আরো কত কথা কি ঘটনা অঘটন সংঘাত। কে জানে মহীন তাকে আকর্ষণ করছে। সজ্ঞানে যেটা করতে চায়নি, অজ্ঞাত মন সেটা করিয়ে নিয়েছে ওকে দিয়ে।

একি হোল? এটা তো মহীন কোনদিন চায়নি, মাধুরীর প্রতি তার প্রেম সে নিজেই করতে চায়নি, এতই গোপন করে রেখেছিল যে তার স্বপ্নও তাকে সজাগ করতে পারেনি এ সম্বন্ধে, অথচ বাইরে সেটা প্রকাশ হয়ে গেছে আশ্চর্য্য—

কিন্তু ভেবে লাভ নেই। ওকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিতে হবে। হবেই, এর জন্যে মহীনের যা কিছু ক্ষতি হয় হোক, যতখানা যাবার যাক, মাধুরীকে সে কোন রকম কেরাণী বন্ধুত্বের গহ্বরে নামাতে পারবেনা শুধু তাই নয় দারিদ্রের কঠোর আঘাত নয়, অশিক্ষার আর অন্ধ সংস্কারের কারাগারে অনভ্যস্ততার কন্টকাকীর্ণ পথ আর অপচয়ের অবজ্ঞা সহ্য করে মাধুরী দুদিনও টিকতে পারবে না ওখানে। বড় বৌদি বলেছেন যোগ্যতার কথা তাঁরা ভাববেন। কিন্তু তাঁরা ভাবলেই মহেন্দ্র যোগ্য হয়ে যাবেন— যাওয়া সম্ভব নয়। অনেক কারণে নয়? অন্ধ দাদা অসহায় বৌদি আর আদরের খোকনকে ছেড়ে মহেন্দ্র মাধুরীকে নিয়ে কলকাতায় সুখস্বর্গ রচনা করবে অপরের সাহায্যে এও কল্পনাতীত। কিন্তু এসব কারণ নিতান্ত গৌণ, বাইরের লোক ভাববে এগুলো। ভিতরে আরো আরো গভীরতর কারণ আছে, কিন্তু কি সে কারণ? মহেন্দ্র শিউরে উঠলো। সচকিত হয়ে উঠলো কেউ কোথাও নেই তো? না মহেন্দ্র স্থির আরো কঠোর আঘাত করবে মাধুরীকে।

কিন্তু আজ এখন কি করা যায়? শয্যায় অঙ্গ দিতে ইচ্ছে করছে না। ও শয্যা ঐ পেলব হাতের স্পর্শে লাঞ্ছিত কিন্তু এখনো যা কিছু আছে সবই তো ওর। নিরুপায় মহেন্দ্র ছাদের কার্নিশের ধারে এসে দাঁড়ালো? কেমন যেন জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে, জ্বর নয় মাধুরীকে আঘাত করার উত্তাপ। হাতুড়ি দিয়ে কিছুতে আঘাত করলে হাতুড়িটাও গরম হয়ে যায়—এতো তাই। কিন্তু অসহায় বোধ হচ্ছে। একি জ্বর। একি জ্বালা যন্ত্রণার তীব্রতম বহিঃপ্রকাশ। মহেন্দ্র মাথার চুলগুলো দু'হাতে আংগুল দিয়ে টেনে ধরলো। না সহ্য করা যাচ্ছে না, শুতে হবে। ছাদে কেউ হয়তো সন্ধ্যাবেলা শুয়েছিল, ছেঁড়া মাদুরখানা পড়ে রয়েছে। মহেন্দ্র এসে শুয়ে পড়লো সেই মাদুরে—

খোকন খোকন। আয়? মহেন্দ্র দু'হাত দিয়ে নিজের বুকখানা চেপে ধরলো। যেন তার শিশু দেবতাকে আলিঙ্গন করছে, বলছে মহেন্দ্র আকাশকে লক্ষ্য করে—

এক ছিল রাজকন্যা চাঁদের মত রূপ, মেঘের মত চুল, তারা মতন চোখ ওহো না এ কার কথা বলছে মহেন্দ্র উপুড় হয়ে পড়লো ছেঁড়া সেই মাদুরটায় স্তব্ধ রাত্রি জেগে পাহারা দিচ্ছে ওকে।

চায়ের জল নিয়ে চাকর রামচন্দ্র এসে ডাক দিল সকালে—
ও বাবু, ওঠো, ভিজে গেছো যে, ও মহীনবাবু।

ভোরের দিকে কখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হয়েছিল, সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে মহেন্দ্রের। চোখের জলটা বৃষ্টির জলে এক হয়ে গেছে। না এ জল কি শুধু জল? মহেন্দ্রের হৃদয় শোণিত অশ্রু হয়ে নেমেছে দুটি গণ্ডে, তার রক্তাভা এখনো লেগে রয়েছে। তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে গেলে মহেন্দ্র ট্যাঙ্কের জলে। তারপর চা তৈরি করতে লাগলো।

আজ রবিবার অফিস ছুটি, করবে কি মহেন্দ্র সারা দিনটা? কোথায় যাবে? যাবে না কোথাও, ঘরেই বসে থাকবে, কিন্তু মাধুরী যদি আসে? না মহেন্দ্র ঘরে থাকবে না। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লো জামা গায়ে দিয়ে।

নতুন বাস লাইন খুলেছে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। চড়ে বসলো মহেন্দ্র। পৌঁছালো এসে দক্ষিণেশ্বরে। পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের সাধনপীট। পঞ্চবটি এলে নতজানু হয়ে প্রণাম করলো মহেন্দ্র শাক্তি দাও হে গুরু শুনেছি বিবাহিতা পত্নীকে তুমি পূজা করেছিলে দেবী রূপে বিলাসের সঙ্গিনী করনি সে কাহিনী আজ বিশ্বের বিস্ময়, হে লোকোত্তর মহাজীবন, এই বৃক্ষ বটবৃক্ষ তলের প্রতি ধুলিকণায় তোমার সেই মহা তপস্যা চির জাগ্রত—সেই শক্তির কিঞ্চিত আমার দান কর প্রভু। আমি যেন সইতে পারি, বইতে পারি এই দুঃসহ দুঃখের বহ্নি জ্বালা।

সারাদিন ঘুরে বেড়ালো মহেন্দ্র। গঙ্গায় কূলে কূলে নৌকায় চড়ে বেলুড় গেল। সেখান থেকে গেল আরো দূরে। কিন্তু সন্ধ্যানাগাদ ওর খেয়াল হোল সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয়নি। শরীর দুর্বল বোধ হচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও খাবার পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে গিয়ে ও এসে পড়লো বলীখান নামক একটা জায়গায়? সেখান থেকে বাসে চড়ে ফিরলো। এসে ও প্রশ্ন করলো, দিদিমণি আসেনি রাম? আজ্ঞে না।

আচ্ছা যা দোকান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আয়।

আপনার ভাত ঢাকা আছে বাবু—

ও থাক কাউকে দিয়ে দিস।

মহেন্দ্র উপরে উঠে এল, নিজের ঘরে। মাধুরী আসেনি, হয়তো আর আসবেন না। আনন্দ হচ্ছে ওর! হ্যাঁ আনন্দই তো। একে বলে আত্মঘাতী আনন্দ বিলাস—আত্মনাশা সমাধি যোগ।

ভর দুপুরবেলা আষাঢ় মাসের লম্বা দিন। মাধুরী আনমনা হয়ে ঘুরছিল? হোস্টেল ছেড়ে না এলেই ভাল হতো। ওখানে অনেক সঙ্গী ছিল—কথা কয়ে লুডু খেলে বা গান গেয়ে সময় কাটানো যেতো, বাড়িতে তার বড্ড অভাব।

নিরুপায় হয়ে মাধুরী বাড়ির পশ্চিমদিকের সেই জানালায় গেল। দেখলো, জানালার কাছে মাদুর পেতে ঘুমুচ্ছে। ওর মেয়েটি ঘরে খেলা করছে নিজের মনে। জানালায় রয়েছে একটা কুঁজোতে জল। অকস্মাৎ মেয়েটি মাধুরীকে দেখে জানালায় আনন্দে হাসছে কিন্তু তার কচি পা লেগে কুঁজোটা গেল উল্টে, পড়লো ওর ঘুমন্ত মার গায়ে, ছলছল কলকল জল সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বৌ উঠেই ব্যাপার দেখলো মেয়েটাকে ধরে দুই কিল তার পিঠে বসিয়ে দিল।

অ্যা—কান্না জুড়ে দিল মেয়ে।

মাধুরী হাসি চাপতে পারছে না বললো—

মারলে কেন? কেন মারলে ওকে? নিজে অসাবধান আর ওকে পিটুনি। তাকিয়ে লজ্জায় হেসে ফেলল বৌটি। মেয়েটি কোলে নিয়ে বললো দেখ না ভাই সব ভিজিয়ে দিল— চুপ চুপ বাপি আসছে—

বেশ করলো জলের কুজো রাখবার কি জায়গা ছিল না?

যেখানে রাখবো ও যাবে—ভয়ানক দামাল। ছাড় এখন ঝাঁট দিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলো। মাধুরী দেখলো সীমাহীন আনন্দ অনুভূতিতে অন্তর ওর পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কত দুঃখ তবু কত আনন্দ এই ছোট বধুটির বুকে? কি এক অপার্থিত প্রেম ওকে ঘিরে রেখেছে স্বামীর প্রতি সংসারের প্রতি। এ প্রেম আত্মকেন্দ্রিক কিন্তু

আত্মাকে বাদ দিয়ে তো বিশ্ব নয়। আমি আছি তাই বিশ্বে প্রেম রয়েছে প্রকাশ আমাকে ঘিরেই সব! কিন্তু এ সব দর্শনের কথা। মাধুরী হাসলো আপন মনে দার্শনিক হবার মতলব নেই ওর। কি তাহলে হবে ও? কিছু না—মাধুরী একটা না ফোঁটা কুঁড়িতেই যাকে পোকায় খেয়েছে—

আজ কলেজ নেই তোমার। বধুটি প্রশ্ন করলো।

না ছুটি আছে। আজ তো শনিবার।

তোমার উনি এখনো আসে নি?

কৈ আড়াইটে বেজেছে নাকি।

প্রায় বাজে।

তাহলে এক্ষুণি এসে পড়বে। আজ আবার সিনেমা দেখতে যাবে বলেছে। কে জানে কখন যাবে। হয়ত সন্ধ্যার শোতে।

তুমি যাবে তো?

হ্যাঁ—একা যায় না তো। সিনেমা দেখার পয়সা তো কম তবু যখন যাই দু'জনেই যাই, আমি বেশি যেতে চাই না ভাই। অভাবের সংসার ও কিন্তু বড় বেশি জেদ করে, বলে পৃথিবীতে বাঁচতে খাদ্যের মতন এও দরকার।

হাসলো মাধুরী মুখে কিছু বললো না, হয়তো বলতো কিন্তু ওর স্বামী এসে পড়লো মাধুরী সরে এলো ওখান থেকে। ওই বধুটিকে দেখে হিংসা হচ্ছে মাধুরীর কত মান অভিমান আদর আবদার কত অভাব অনটনের মধ্যে আনন্দের অমৃতকুঞ্জ একে বলে নীড়। তুচ্ছ এক ফ্লাট বাড়ির ছোট এক কুঠুরীতে একজোড়া কবুতর আর তাদের একটা বাচ্ছা অন্ন নাই, আলো নাই, আয়ু ও হয়ত বেশি নাই, নাইবা থাকলো যতক্ষণ ওরা আছে ফুলের মত ফুঠে আছে। ফুলের আয়ু কম বলে তার ফোটার গৌরব কম হবে?

মাধুরী আপন ঘরে গিয়ে ভাবছে। চুল বাধলো গা ধুলো কাপড় বদলালো এবার কোথাও এবার কোথাও বেরুতে হয় কিম্বা মেজদার খেলায় যোগ দিতে হয়; অথবা না? যাবে না মাধুরী আর মহীনের বাসায়। কিন্তু অনুপ সিং এসে জানাল গাড়ি আনা হয়েছে। মাধুরী এসে উঠলো গাড়িতে।

উঠলো মাধুরী অনুপ সিং গাড়ি চালিয়ে দিল। কোথায় যাচ্ছে কোন প্রশ্ন করলো না নির্দেশও দিল না মাধুরী। যেখানে যায় যাক খানিকটা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সিংজী সেন্ট্রাল এভিন্যুর সোজা রাস্তা ধরে সটান এসে কুলুটোলায় মোড় ঘোরালো। তারপর গোলদীঘির কোনায় আসতেই দেখতে পেল ট্রাম থেকে মহীন নামছে। মাধুরীও দেখলো, বললো এসে উঠে পড় বাসায় আজ নাইবা গেলে।

হু কোথায় যেতে হবে। গাড়িতে চড়তে চড়তে মহীন প্রশ্ন করলো।

এ প্রশ্ন আর করো না মহীনদা যাবার পথ এক হলে ওকথা শুধাবার অধিকার থাকে।

মহেন্দ্র নিঃশব্দে বসে রইল কোন কথা বললো না। গাড়িটা গড়ের মাঠের দিকে নিয়ে যেতে বললো—কারো মুখে কোন কথা নাই! অবশেষে মাধুরীই বললো, তুমি হয়তো ভাবছো, আমি তোমার মেসে যাচ্ছিলাম। না আমি কোথাও যাচ্ছিলাম না।

আকস্মিক দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে। অবশ্য অনুপ সিংতো ওখানেই নিয়ে যেত গাড়ি।

মহেন্দ্র এখনও কোন জবাব দিল না। মাধুরী নিউ মার্কেটের সামনে গাড়ি থামালো। তারপর নেমে মহীনকে বললো, নামবে একবার।

হ্যাঁ চল। নামলো মহেন্দ্রও।

সারি সারি ফুলের দোকানগুলোতে অজস্র ফুল সাজানো রয়েছে। মাধুরী তাকাল না সটান চলেছে, কিন্তু মহেন্দ্র দেখছে শোকেস ভর্তি ফুল। বললো আস্তে, ফুল নেবে মাধুরী?

না, ওকি হবে? তোমার কাছেই গল্প শুনেছি, এক রাজকুমার এক দেশে বেড়াতে গিয়ে দেখল, সেখানকার নরনারী, পশু পক্ষী প্রজাপতি অতি সুন্দর, কিন্তু কার অভিশাপে প্রাণহীন পাথর হয়ে আছে, ওগুলো সেই পাথর, মাটির স্নেহ ওরা পায় না মহীনদা।

না, কিন্তু মানুষের স্নেহ—

না মহীনদা স্নেহ ওরা পায় না, ওরা মানুষের কামনার ইন্ধন, ওদের দিয়ে বিলাসকুঞ্জ সাজান যায়, বাইজীর গলায় মালা দেওয়া যায়, আর কিছু নয়।

মহেন্দ্র যেন গুছিয়ে বলতে পারছে না। কেমন হতভম্ব হয়ে আছে অথচ কথা তার আয়ত্তে কিন্তু মাধুরীকে কি আবার আঘাত করবে মহেন্দ্র? না, আঘাত না করে বললো।

বিয়ের বাসরও সাজানো যায় মাধুরী।

সে বিয়ে বাইরের বিয়ে মহীনদা রেজিষ্টারী করা কন্ট্রাক্ট, অন্তরের বিয়েতে লাগে হলদে সুতোয় বাঁধা দুর্বাঘাস, আর কুন্দ, না হয়ে আকন্দ ফুলের মালা, ডালিয়া ভায়েন্থাস, কসমস ক্রিসান্থিমাসের সেখান ঠাঁই নেই। এসো।

মাধুরীরের চোখে চকচক করছে জল কিন্তু মহেন্দ্র যেন লক্ষ্য করে নাই এমনিভাবে বললো, ওদিকে কোথায় যাবে?

আবার কেন এ প্রশ্ন মহীনদা? কোন বন্দীশালায় তোমার নিয়ে যাচ্ছিনে নিরাপদে মেসে পৌঁছে দেব, এসো। এগুলো মাধুরী। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছলো একবার মহেন্দ্র পিছনেই আছে। সটান চললো মাধুরী সাজান দোকানের মাঝ পথ দিয়ে। একটা ফটোর দোকান, মাধুরী ঢুকে বললো দোকানদারকে—

এর ছবি তুলতে হবে একটু তাড়াতাড়ি হবে কি?

হ্যাঁ এক্ষুনি। বলে দোকানদার আয়োজন করছে। মহেন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললো।

আমার ফটো তুলবে কেন মাধুরী? আমি তো মোটেই তৈরি নই।

তুমি যেমন আছ অমনটিই তুলব, ক্লান্ত, অভুক্ত অসুন্দর।

হঠাৎ যেমন আমি এসেছিলাম তোমার কাছে?

হ্যাঁ, অর্থাৎ তুমি যেখানে সত্যি তুমি।

মহেন্দ্রকে বসিয়ে দিল মাধুরী একটা টুলে। ফটো তোলা হলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দোকানে ওকে খাওয়ালো, তারপর গোলদীঘির পাড়ে নামিয়ে দিয়ে বললো তুমি যে এসেছিলে, এ ফটোটা তার সাক্ষী রইল।

সাক্ষী নাইবা থাকতো মাধুরী।

স্বাক্ষরটা মুছে ফেলা যাচ্ছে না মহীনদা, তোমার হাতের কালিটা দ্রাক্ষার জীবন রক্ত, হাজার বছর ওর দাগ থাকে। গাড়ি চলে গেল মাধুরীকে নিয়ে।

মহেন্দ্র নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ কে জানে?

সত্যি মোছা যাবে না দ্রাক্ষার কালি। পাঁচশো বছরের পুরোনো পুঁথি আছে মহেন্দ্রর বাড়িতে ঐ দ্রাক্ষার কালি দিয়ে লেখা আজও সে অক্ষর যেমন উজ্জ্বল একথা সেই একদিন মাধুরীকে বলেছিল। কিন্তু কালি মুছে না গেলেও পুঁথি পুরানো হয়ে যায়, অপাঠ্য না হোক দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে, তখন তাকে কুলঙ্গীর এক কোনায় ফেলে রাখা হয়। উঁই ইঁদুর তার ধ্বংস সাধন করে কেউ দেখে না কেউ দেখতে চায় না, মহেন্দ্র উঠে এলো ওর মেসের ঘরে বুকের ভেতরটা কেমন করছে কেমন অসস্তি— কেমন অব্যক্ত যন্ত্রণা। কিন্তু কিছুই করবার নেই। মাধুরীর অন্তরে মহেন্দ্রের স্বাক্ষর যতই উজ্জ্বল হয়ে হয়ে থাক, পুরানো পুঁথির মত তাকে অপাঠ্য হয়ে যেতে হবে, কিন্তু মহেন্দ্রের অন্তরে মাধুরীর স্বাক্ষর নয় ক্ষোদিত শিলামূর্তি যার মৃত্যু নাই, অমরত্বের অনির্বান অগ্নিতে সে দগ্ধ হচ্ছে। বুকখানা দু'হাতে চেপে মহেন্দ্র শুলো বিছানায়, সর্বাঙ্গে ওর আগুন, এই অগ্নিতে নির্বাপিত করবার শীতল সলীল সম্মুখে কিন্তু সেখানে যাবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ তার কাছে কেন? বহুবার ভাবা ভাবনাটা আবার ভাবতে লাগলো মহেন্দ্র। মাধুরীর অবাল্য পরিচিত সমাজ সংস্কার শিক্ষা, তার স্বাধীন চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ বেদনার অভিব্যক্তি তার অসামন্যতা রাজপ্রসাদে করার যোগ্য, মহেন্দ্র কেমন করে তাকে দারিদ্রের পঙ্ককুন্ডে নামিয়ে আনবে? মাধুরীর তরুন মনের উচ্ছ্বাস আজ হয়তো উদ্বেল আকুল বর্ষাস্রোতে, বর্ষাস্রোত দুকূল প্লাবিত করে, সে হয়তো চন্ডীপুরের জীর্ণ কুটিরে গিয়ে ঢুকতে চায় কিন্তু শীতের শুকনো দিনে জীবন হয়ে যাবে শীর্ণ, বিবর্ণ, বিকৃত, ব্যাধিগ্রস্ত। হয়তো মাধুরীর মা বাবা ভাই বৌদি তাকে ঘর বাড়ি টাকা

কড়ি দিয়ে কলকাতায় বিশাল নিকেতনেই রাখতে চাইবে, কিন্তু মহেন্দ্র তার অন্ধ দাদা আর একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র কে পরিত্যাগ করে স্বর্গেও যেতে সম্মত নয়। আর সে কথা একান্তই অবাস্তব, কারণ তার বংশ গৌরবের পরিপন্থী! কিন্তু এ সব কোন কারণই নয়, কোন বাধাই নয় মাধুরীকে লাভ করার পক্ষে। তার প্রেম যদি সত্য হয়, সব বাধাই অতিক্রম করতে পারা যায়। কিন্তু না, নিয়তির নিষ্ঠুর বাধাটাকে অতিক্রম করতে পারে না মানুষ নিরুপায় অসহায় মহেন্দ্রও চিন্তা বন্ধ করে ভাবলো, মাধুরীর মনে যদি স্বাক্ষর সে দিয়েই থাকে নিজের অজ্ঞাতসারে, তবে সে স্বাক্ষর যতই স্থায়ী কালিতে লেখা হোক, পুরানো অপাঠ্য হয়ে যাবার সুযোগ দিতেই হবে। মহেন্দ্রের অন্তরে শিলা মূর্তি অক্ষয় মহেন্দ্র তাকে জীবনের পর জীবন বহন করবে, কিন্তু মাধুরীর অন্তর আকাশের মত নির্মল হয়ে উঠুক মেঘ সরে যাক সেখানে দেখা দিক পূর্ণ চন্দ্রের উজ্জ্বলতা পূর্ণ চন্দের অমিয় ধারা।

মহেন্দ্র ঘরের টালিগুলোর দিকে চেয়ে ছিল, অন্ধকার ঘর কিন্তু আকাশের জ্যোৎস্না টালির ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ছোট বিন্দুর মত, দু'তিনটে ফাঁকে এমনি ঘরে নিবিড় অন্ধকার, অথচ বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন ছুটছে। মহেন্দ্রের অন্তরটাও যেন তাই। ভেতরে অশ্রু সাগর, বাইরে আনন্দের তুফান। মহেন্দ্র চেয়েই রইল টালির একটা ফটোর পানে দূর অন্ধকূপ থেকে দেখছে যেন অসীম আলোর সমুদ্রকে। ও আলো ছোয়া যায় না। ও আলোতে সঞ্চারণ করবার জন্য যে চাঁদের সৃষ্টি, সেই ওখানে বিরাজ করুক, মহেন্দ্র নিঃশব্দে সরে যাবে আরো গভীর অন্ধকারে।

পরদিন রবিবার, অফিস নাই। মুখ হাত ধুয়ে মহেন্দ্র চা খেলো, দাড়ি কামালো, তারপর পরিষ্কার জামা কাপড় পরে গেল ওদের অফিসার ইনচার্জের বাড়ি। মহেন্দ্র অল্পদিন চাকরি নিলেও কর্মদক্ষতায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অফিসার বাড়িতে ওকে সস্নেহে আহ্বান করে প্রশ্ন করলেন, কি খবর মহীন? মাদ্রাজ অফিসের জন্য আমাদের কাকে পাটাবেন ভাবছিলেন? অফিসে আমাকে যদি পাঠান তো আমিও যেতে প্রস্তুত আছি।

তুমি যেতে চাও? বেশ, কিন্তু অনেক দূর আর মাইনেতো বেশি বাড়াতে পারবো না, শুধু এই টাকার মধ্যে চলতে পারবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আর আজকালকার যুগে দূরত্ব বলে কিছুই নেই। আমি যেতে চাইছি, দেশ দেখা আর একটা চেঞ্জও হবে।

আচ্ছা, যাও আমি তোমার মত বিশ্বাসী একজন ইয়ংম্যান খুঁজছিলাম। তাহলে কালই অর্ডার করে দেব, তুমি মাদ্রাজ মেলে রওয়ানা হয়ে যাবে কেমন?

একেবারে মাদ্রাজ, কতদূর কে জানে? কিন্তু উত্তর মেরুতে যেতেও আজ সে প্রস্তুত। মাধুরীকে তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এর জন্যে কিনা করতে পারে। মহেন্দ্র আর দেরী করতে পারে না।

বাসায় এসে সব গুছিয়ে ফেললো, ভাঁজ করে ইজিচেয়ার শেকল প্যাক করে পাঠিয়ে দিল বাড়ির ঠিকানায়, সুটকেস আর বিছানা বালিশ মাত্র সঙ্গে নেবে কয়েক খানা বইও, ব্যাস।

কিন্তু নিজের উপর কেমন রুদ্ধ হয়ে উঠেছে মহেন্দ্র। এতটা বেলা হলো রবিবার মহেন্দ্র যখন খেতে এলো ভাত তখন শুকনো হয়ে গেছে। যাক, একদিন না খেলেও চলবে। কোকো, ওভালটিন মাল্টা বিস্তর রয়েছে মহেন্দ্র সন্ধ্যাবেলা সব বাবুদের ডেকে খাইয়ে দিল যা ছিল। কিন্তু কাউকে বললো না সে কোথায় যাচ্ছে, শুধু বললো দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

গভীর রাত, মাধুরীর দেওয়া সেতারটায় ঝঙ্কার তুলে মহেন্দ্র। সুপ্ত কলকাতার বুকের উপর এক অশরীরী যেন প্রিয়াদের স্কন্ধে নৃত্য করে চলেছেন, মৃত্যুর অমৃতময় পথে, গর, ল। গরীয়ান ভূমিতে ত্যাগের অগ্নিময় তপস্যায়, সাধনা নির্বিকল্প সমাধিতে।

সকালে উদয়সূর্য ওকে দেখলো, বুকের রক্ত চোখের পাতায় চিকচিক করছে, কিন্তু

গ্রীষ্মকালে বাবুদের কেউ কেউ ছাদে শুয়ে থাকবেন। তারা দেখবার পূর্বেই মহেন্দ্র হাতমুখ ধুয়ে ফিটফাট হয়ে নিল। সারারাত ও ঘুমায়নি ঘুমাবে না আর কোন রাত। ওর রাতের ঘুম রইল এই কলকাতার দিনের জাগরণে সম্বল করে ও চলে যাবে দূর দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে, কূলহারা এক জীর্ণ তরণী ডুবে যাবে।

মেসের বাবুদের চিঠি একটা কাঠের বাক্সে পিওন দিয়ে যা, মহেন্দ্র নামবার সময় দেখলো ওর নামে একখানা কার্ড রয়েছে, বাড়ির চিঠি বৌদি লিখেছে। পড়ে একটা ম্লান হাসলো মহেন্দ্র, চিঠিখানা আবার বাক্সে ফেলে দিয়ে গেল।

মাদ্রাজ মেল, উঠে পড়ল মহেন্দ্র। কোণার একদিকে নিঃশব্দে বসল গিয়ে বাক্স বিছানা সেতার সমেত, চোখ বুঝলো, লক্ষ স্মৃতিঘেরা কলকাতা ওর কাছে বিলুপ্ত হয়ে যাক, মুছে যাক, মুছে যাক কর্মের মন্দির থেকে।

সেদিন বাড়ি ফিরে মাধুরী কারো সঙ্গে কথা বলেনি, নিজের ঘরে শুয়েছিল গিয়ে কিন্তু পরদিন স্নান সেরে মার পূজার ঘরে গিয়ে নানা কাজ করলো, দুপুরে নিজের ঘরটা গোছালো, বিকালে প্রসাধন শেষ করে মেজদার খেলায় যোগদিল। ছোড়দিকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, মেজবৌদি বললো হেসে।

কোন দিন কম সুন্দর দেখায়, প্রশ্ন করলো মাধুরী।

না, কম না, আজ যেন বেশ উজ্জ্বল—

তাহলে আর দেরী নাই, দীপ নিভার আগে জ্বলে উঠে।

ছিঃ মাধুরী, ওসব কি কথা। মেজদা ধমক দিল ওকে। কুমার ছিল আর বরুণ। মাধুরী একটুখানি চুপ থেকে হেসে বললো—

খারাপ নয় মেজদা, বেশি জ্বললে প্রদীপের বুক জলে যায়, তার চেয়ে নিভে যাওয়া ভালো।

কেন এসব কথা বলছিস বোনটি, কি হলো? মেজদা ওর বেণীটা সস্নেহে আকর্ষণ করলো হাতে নিয়ে শেষে ফুলগুচ্ছটা দেখছে। মাধুরী বললো—

নিভে আমি যাবো না মেজদা, আমি প্রদীপ নই, হাসছে মাধুরী অম্লান হাসি। আমি হলুম সাপের মাথার মনি গল্পে আর গরলে আমার বাসা—

গল্পে থাকতে চান থাকুন কিন্তু গরল কেন? বরুণ বললো চা খেতে খেতে।

গরলে না হলে গল্প হয় না। সমুদ্র মন্থনে আগে গরল উঠেছিল, তবে পুরানের গল্প জমলো। চলুন খেলা যাক, আমি আর মেজদা, ভাই বোন একদিকে।

অতঃপর খেলা আরম্ভ হলো। মাধুরী ভালো খেললো। হাসি মুখেই খেলছে কিন্তু কেমন যেন আনমনা। কুমার দেখে বললো।

আপনি বড্ড অন্যমনস্ক রয়েছেন—

আচ্ছা, মেজবৌ খেলুক এবার—বলে চলে গেল মাধুরী বাবার কাছে। উমেশবাবু বসেছিলেন এক জায়গায়। মাধুরী এসে দাঁড়ালো।

বাবা দমদমার বাগানটার আমি কিছু করবো বলেছিলাম মনে আছে?

হ্যাঁ মা, কি করবে?

অনেক কিছু করা যাবে বাবা, আমার প্লান বড়দাকে জানাবো। অত ঝামেলার মধ্যে থেকে কাজ নেই, আর শোন বাবা—

বল, উমেশবাবু তাকালেন কন্যার পানে—

মাধুরী অল্পক্ষণ বাবার মাথায় হাত বুলালো, তারপর আস্তে বললো—

আমার বিয়েতে তুমি তো অনেক টাকা খরচ করবে ভেবেছ বাবা।

হ্যাঁ কেন?

বিয়ে আমি করবো না বাবা। টাকাগুলো আমাকে দিয়ে দাও, আমি দমদমার বাগানে একটা আশ্রম করবো—

আশ্রম?

হ্যাঁ যোগী সন্ন্যাসীর আশ্রম নয় বাবা, জীবনের আশ্রম, সেখানে মানুষ আশ্রয় পাবে। আমি অবশ্য ধর্মশালা করবো না, মঠ মন্দিরও করবো না আমি করবো

মৌমাছির চাষ, গরুর গোহাল, খেলনার কারখানা আর গরীব ছেলেদের জন্য স্বাস্থ্যকর শিক্ষার ব্যবস্থা।

এসব আমি খুব বুঝি না মা, তোর বড়দাকেই বলিস, কিন্তু বিয়ে কি তুই করবি না?

না বাবা, সে তো বলেছি, বন্ধন আমি সইতে পারবো না, আমি মুক্ত আছি মুক্তই থাকবো।

চলে গেল মাধুরী। মুক্ত আছে মুক্ত। মিথ্যা কথা। বাবার কাছে মিথ্যে কথা বলে এল মাধুরী। মুক্ত সে নাই, তার অন্তর বন্দী শুধু বেদনার সমুদ্রে মুহ্যমান তবু মাধুরী বলে এলো সে মুক্ত আছে মিথ্যা কথা।

কিন্তু মিথ্যা বলে মনকে আঁখি ঠারতে হয়। কিন্তু মাধুরী ভাবতে লাগলো, কয়েকদিন ধরে ভাবছে, একই ভাবনা বারবার ভাবে, প্রায় দশদিন ভাবছে, কেন মহেন্দ্র তাকে এভাবে প্রত্যাখান করলো। কি তার অভাব, কোথায় তার অযোগ্যতা। সব ছেড়ে সর্বস্ব দিয়ে মাধুরী তাকে ভালবাসলো, আর মহেন্দ্র তাকে মাছরাঙার সঙ্গে তুলনা করে বিদায় দিল।

বিতাড়িত করে দিল বললেও বেশি বলা হয় না। কেন কি এর কারণ? তবে কি মহেন্দ্র ভালোবাসেনি মাধুরীকে?

না না এ হতে পারে না, মহেন্দ্রের প্রেম শুধু তার চোখে নয়, সব অবয়বে প্রকাশ পেয়েছে মাধুরী ভুল দেখেনি, এতোখানি ভুল হবার সম্ভাবনা নাই। মাধুরী এতো ছেলেমানুষ নয়। তবু মহেন্দ্র তাকে চাইলো না কেন? কেন?

প্রশ্নটা বুকের মধ্যে গুমড়ে মরছে, উত্তর নেই। তবে কি মহেন্দ্র তাকে সত্যিই ভালবাসেনি। মাধুরী কত দিন যে দেখেছে, মহেন্দ্রের সারা দেহ মনে মাধুরীর বিজয় নিকেতন উড়ছে, সে ভুল সে কি ছলনা তার? না মাধুরী দৃঢ়স্বরে বললো না। মহেন্দ্র তার গৌরবের ভূমি থেকে নামতে চায় নি এই—ই কারণ মহেন্দ্র তাকে তার জীর্ণ পর্ণ কুটিরে নিয়ে যেতে চায়না, এই কারণ মহেন্দ্র তাকে সম্রাজ্ঞীর আসনে দেখতে চায় এই—ই কারণ। কিন্তু মাধুরী ভুল ভেঙ্গে দেবে মহেন্দ্রের। মাধুরীর প্রেম যদি সত্যি হয়, যদি একনিষ্ঠ হয়, তবে কোথায় যাবে মহেন্দ্র তাকে ফিরে আসতেই হবে মাধুরীর কাছে সে মাছরাঙা নয়, মহাসতী। তার মৃতদেহ সম্বন্ধে নিয়ে মহেন্দ্র একদিন বিশ্বময় ঘুরে বেড়াবে। মাধুরীর প্রেম ব্যর্থ হবে না ব্যর্থ হতে দিবে না মাধুরী। বিলাসে কেলিকুঞ্জে সে প্রেম সার্থক না হোক বিরহের অগ্নিকুন্ডে তাকে গ্রহণ করতেই হবে। মাধুরীর অন্তর আজ অন্তরের চারণভূমি।

চোখের ঘন পদ্মে শিশির বিন্দুর অশ্রু জেগে উঠলো মার্কেট থেকে সদ্য আনা মহেন্দ্রের ছবিখানা অত্যন্ত গোপনে রেখে দিল মাধুরী দেরাজে। চোখ মুছলো, তারপর বেরুবে, আয়নায় মুখটা দেখে নিল, হাসি হাসি করলো মুখখানাকে জোর করে। অকস্মাৎ বড়বৌদি এসে প্রশ্ন করলো, মহীন কোথায় রে ছোড়দি। কদিন আসেনি কি ব্যাপার?

কি জানি, খুব ব্যস্ত আছে হয়তো।

যাওনি তুমি ওখানে?

না একটা নতুন নাটকের অভিনয় করবো, বড্ড ব্যস্ত আছি তাই বৌদি। কি নাটক রে?

শকুন্তলা দুষ্মন্ত যোগাড় হচ্ছে না ভাবছি আমাদের গনেশকে কেমন মানাবে?

হাসলো মাধুরী বড়বৌদি হেসে ফেলল গনেশ বাড়ির চাকর, মোটা বেঁটে দাঁত উঁচু তাই ওকে গনেশ বলে। কিন্তু বৌদি হাসি থামিয়ে বললো কেন মহীন ঠাকুরপো।

দূর ও তো দুর্বাসা। ওর অভিশাপেই এত বড় নাটকখানা জন্মাল। রাগের ঋষি রাজা সাজার যোগ্যতা ওর নেই চলো বৌদি বড় ব্যস্ত আজ আমি।

আমরা তো ওকেই দুষ্মন্ত করবো ঠিক করছি বড়বৌদি হেসে বললো। মাধুরী কথাটা শুনলো কিন্তু উত্তর না দিয়েই চলে গেল বাইরে।

মেসে মহেন্দ্রর অবস্থান সেখানকার মানুষগুলোকে যেন একটা অনাস্বাদিত আনন্দের

আস্বাদ দিয়েছিল। এটা আর কিছুই নয়, মাধুরীর আবির্ভাব কিন্তু মহেন্দ্র চলে গেছে, মাধুরী আর আসবে না। সবাই ওরা বিশেষ এরকম নিরাশ হয়ে পড়েছে। ভাঙ্গা বাক্সটায় পড়ে আছে মহেন্দ্রর ক'খানা চিঠি। সবাই নিজের চিঠি দেখতে গিয়ে এগুলো একবার করে দেখে নেয়। মহেন্দ্রের ঠিকানা জানা নেই নইলে রি—ডাইরেক্ট করে দিত। দু'একজন পড়েও রেখেছে পোস্টকার্ড দুটো, সেদিন এই নিয়ে ওদের কথা হচ্ছিল।

ওর বাড়ির চিঠি ওকে কোথেকে দেখতে আসবে তাই বাড়ি যেতে লিখেছে ওর বৌদি।

দেখতে আসবেন। বিয়ের জন্য।

হ্যাঁ তাইতে লিখেছে দেখলাম।

তাহলে এই শ্রীমতীর সঙ্গে বিয়ে নয়, বন্ধুত্ব অর্থাৎ পরকীয়া।

থাক থাক, আমাদের অতসব ভেবে কাজ কি। এ যুগে ওরকম ঢের হয়ে থাকে, বুঝলে।

ছোকরা কিন্তু খুব অন্যায় করলো। মেয়েটা সত্যি ওকে ভালোবাসে ব্যাচারা।

হঠাৎ এভাবে মহীনের চলে যাওয়াটা কিন্তু খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে কি বলো জনুদা।

ওকে ক্ষমা করা যায়না পাড়া গাঁয়ের গাধা একটা বলে জনরঞ্জন বাবু মুখখানা বিকৃত করলো। ওদেরই যে মহা ক্ষতি হয়ে গেছে মহেন্দ্র চলে যাওয়াতে এমনি ভাব। আজ শনিবার খিচুড়ির আয়োজন হচ্ছে ওদের, কিন্তু মহীন থাকলে হয়ত মাধুরীও আসতো, নিরামিশ খিচুড়ির আস্বাদ হয়ত বহুগুণ বেড়ে যেত। ছোকরা করলো কি? কেন চলে গেল?

ও যেন ওদের কাছে একটা নিদারুণ রহস্য।

বর্ষার জল দাঁড়িয়েছে মেসের গলিতে। কলকাতার জনবহুল পথে পথে পথিকরা জুতো হাতে হাঁটছে, এ গলিতে ঠিক সেই অবস্থা। অকস্মাৎ ছড়িয়ে মেসের দরজায় এসে দাঁড়ালো প্রকান্ড গাড়িখানা, ভেতরে মাধুরী।

আসুন, আসুন এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল, বহুদিন বাঁচবেন—

অভিশাপ দিচ্ছেন? মাধুরী গাড়িতে বসেই বললো হাসতে হাসতে।

সে কি? অভিশাপ কেন? মেম্বারগণ আকস্মিক আঘাতে থেমে গেল। বহুদিন বাঁচার অর্থ বহু দুঃখ ভোগ আবার হাসলো মাধুরী।

ওরা এবার বললো—

আপনি কেন দুঃখ পেতে যাবেন। দুঃখ পাব আমরা গরীব কেরানীর দল।

দুঃখহীন যে জীবন, সে জীবন নয়, সে অনুভূতিহীন জীবকোষ জীবন মাত্রেই দুঃখ ভোগ করে।

বলেই মাধুরী একটু হাসলো। ওর প্রতিটি কথার মধ্যে কেমন যেন দুঃখের সুর অভিব্যক্ত হচ্ছে। না না, এ চলতে দেওয়া হবে না, তাড়াতাড়ি বললো।

দীর্ঘ জীবন যদি কর্মে পরিপূর্ণ হয়, তবেই সার্থক, নইলে সে অভিশাপ।

আমরা নিশ্চয় আপনার সফল জীবন কামনা করবো।

মাধুরী কিছু না বলে নামবে কিনা ভাবছে। বড়বৌদির কথায় কেমন যেন সচকিত
হয়েছে মাধুরী। মহেন্দ্র একেবারে ও বাড়ি যাওয়া বন্ধ করেছে, এ ব্যাপারটা বড়ই
দৃষ্টিকটু। জীবন সাথীরূপে মাধুরীকে না হয় গ্রহণ নাই করল মহেন্দ্র তা'হলে পিতৃবন্ধুর
বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলো কেন? মাধুরীর সঙ্গে সম্বন্ধ কেটে দিয়ে সে মাধুরীকে অবকাশ
দিতে চায় তাকে ভুলবার, কিন্তু এটা ভুল। বরং পরস্পরকে বোঝাবুঝির পর সান্নিধ্য
আর স্নেহ সম্পর্কের মধ্যে দু'জনেই কিছু কিছু সহজ হতে পারবে। এই ভেবে মাধুরী
এসেছে আজ কিন্তু নামবার পূর্বেই জনুবানু বললো—মহেন্দ্র কোন ঠিকানা দিয়ে যায়নি
ওর একগাদা চিঠিপত্র পড়ে রয়েছে, আপনি নিয়ে যান, ওর ঠিকানায় ডাইরেক করে
দেবেন। মাধুরী আসলে ভাল হয়ে বসলো বুঝলো, মহেন্দ্র মেসে নেই।

ওর বৌদি এই পোস্টকার্ডটিতে লিখেছে কোথেকে ওকে দেখতে আসবে বিয়ের জন্য, আপনার সঙ্গে এই ব্যাপারটা আমরা ক্ষমা করতে পারছি না।

কেন? হাসলো মাধুরী বিয়ে তো করতে হবে তাকে।

হ্যাঁ আমাদের ধারণা সেটা আপনার সঙ্গেই—

আপনাদের মাথায় দেখছি নির্মল গোবর, একটুও গাইদুধ নেই। আমি লক্ষপতির মেয়ে আর ও ষাট টাকার কেরানী, আমাদের বিয়ে হবে কি করে ভাবলেন?

নিশ্চয়ই, সে তো বটেই, মেম্বারগণ লজ্জিত হয়ে পড়লো। এর মধ্যে একজন একখানা মাসিক পত্র, দু'খানা সাপ্তাহিক, দুটো পোস্টকার্ড আর একখানা খাম এনে দিল মাধুরীর হাতে। বললো, আপনি নিশ্চয় তার ঠিকানা জানেন?

হ্যাঁ আমি সবই জানি আচ্ছা নমস্কার বলে চলে যাচ্ছে মাধুরী।

আর আসবেন না? করুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো জনরঞ্জন।

আসবো, এই মেসের সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষয় হয়ে রইল, চলে গেল গাড়িখানা। মেয়েটি সত্যি চমৎকার। বললো জনরঞ্জন।

হ্যাঁ, ওকি আর আসবে? মহীন ছোড়াটা কেমন বেআক্কেল জানতাম না।

গভীর বিষাদিত হৃদয়ে সবাই চলে গেল। সামনের রাস্তার তখনো গাড়ির চাকার আঘাত লেগে জলটা টলমল করছে অতটুকু জল কিন্তু কি তার তরঙ্গ। ছলাৎ ছল শব্দে যেন ক্রন্দন জুড়েছে মাধুরী আর কখনো আসবে না, আসবে না।

চিঠিগুলো নিয়ে নিশ্চুপ বসে রইল মাধুরী গাড়িতে। অনুপ সিং শুধালো কোথায় যাব দিদিমণি। বাড়ি—

না, গঙ্গার ধারে চল, জল কতটা বেড়েছে দেখে আসি।

নিঃশব্দে চলেছে গাড়ি। মাধুরী বৌদির পোস্টকার্ডখানা পড়লো। অন্য পোস্টকার্ডটা একজন সম্পাদকের তিনি গল্প চেয়েছেন মহেন্দ্রের কাছে। খামের চিঠিও খুললো মাধুরী মহেন্দ্রর লেখা উপন্যাস, মরণ যমুনা, ছাপা হলো খবর জানিয়েছেন প্রকাশক। মাসিক সাপ্তাহিক মহেন্দ্রের গল্প বেরিয়েছে। সবই ভাল খবর কিন্তু কোথায় মহেন্দ্র এখানে নেই। বাড়িতেও যায়নি তবে গেল কোথায়? এত দীর্ঘদিন ছুটি পাবারও আশা কম তার। তাহলে চাকরি কি ছেড়েই দিয়ে গেল নাকি, কেন? বিস্ময়টা অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠলো, কিন্তু বৌদির চিঠিখানা পড়ে মাধুরী আন্দাজ করে কোন খবর না দিয়ে অকস্মাৎ মহেন্দ্রের সরে পড়ার কারণ আর কিছু নয় লজ্জা। মাধুরীকে সে জীবন সঙ্গিনী করতে পারবে না, গ্রহণ করবে হয়তো বা কোন পল্লী দুলালীকে। এরই জন্য মহেন্দ্র আঘাত পর্যন্ত করে গেল মাধুরীকে। ধিক কাপুরুষ মুখ ফুটে কেন বলতে পারল না কথা।

ঠোঁট কামড়ালো মাধুরী, তৎক্ষণাৎ দুর্বল লাজুক মহেন্দ্রের মূর্তিটা এসে সামনে দাঁড়ালো বলা যায় না, সত্য ভালোবাসে মহেন্দ্র তাকে। তাই হয়তো মহেন্দ্র নিরুপায় হয়তো অসহায় হয়তো অন্ধদাদার সম্মান রক্ষার জন্যে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ, অথবা, কি আর কারণ থাকতে পারে? মাধুরী তো দীনাতিদীনা হয়ে তার হাত ধরে সঙ্গে যেতে চেয়েছিল জীবনের পথে। মহেন্দ্র কি দরিদ্রর ঘর তুলতে ভয় পেলো?

থামাও সিংজী আদেশ করলো মাধুরী, স্বয়ং গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লো। চিঠিগুলো পড়ে রয়েছে আসনে। মাধুরী নিঃশব্দে গঙ্গার কূলে দাঁড়ালো গিয়ে। দুকূল ভরা নদী সূর্য অস্ত যাচ্ছে ওপারে মাধুরী তাকিয়ে রইল?

নমস্কার, কি দেখছেন একা দাঁড়িয়ে? নমস্কার জানালো সুশীলবাবু হাতে র‍্যাকেট হয়তো মাঠে খেলছিল।

নমস্কার, মাধুরী আকস্মিকতা সামলে বলল দেখছিলাম সূর্য যখন ডোবে তখন পৃথিবী হাসে না কাঁদে হাসলো মাধুরী সুন্দর করে।

কি দেখলেন? কাঁদে নিশ্চয়?

না হাসে। পৃথিবীর প্রেম এমন সত্যি যে কাল আবার সূর্যকে আসতেই হবে।

হ্যাঁ, কিন্তু এই যে নৌকাটা যাচ্ছে ওপারে, ও নাও ফিরতে পারে।

তাহলে বোঝা যাবে এপারে ওর প্রেমের কোন বন্ধন নেই। মাধুরী আবার হাসলো।

music2radio.blogspot.com

হ্যাঁ, নিশ্চয় চলুন রেস্তোরাঁয় গিয়ে এককাপ চা খাই সুশীল আবেদন জানালো।

আপনাদের শুধু খাই খাই মাধুরী ঝঙ্কার দিল জানেন চোখের আনন্দ ভোজে উদরের ভোজ্য বিরোধী।

উদর পূর্ণ থাকলে চোখের ভোজ্য বেশি আনন্দদায়ক—

না অন্তর যার আছে, উদরকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে।

তাহলে বাঁচে কি করে দেবী।

দেবী বাঁচবার কথা ভাবে না মৃত্যুতেই সে অমর হয় কথাটা আপনাকে বলে ভুল হলো।

কেন ভুল হোল কেন! সুশীল সবিনয়ে প্রশ্ন করলো আবার।

কারণ, আপনারা দেহকেই বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তার প্রমাণ র‍্যাকেট আর রেস্তোরাঁ, আলো জ্বালা অন্ধকারে গিয়ে আমি গোধুলী লগ্নকে হারাতে চাইনে। চলে যাচ্ছে মাধুরী।

গোধুলী কিন্তু বিয়ের লগ্ন, সঙ্গে সাথী দরকার জানাল সুশীল।

না শুধু বিয়ের কথা ভেবেছেন দেখছি গোধুলী বিরহের ও লগ্ন, পৃথিবীর বিরহ আকাশে বিরহ, এই সন্ধ্যারাগ বিরহেরও মহাকাব্য।

চলে গেল মাধুরী অনেক দূর! সুশীল দাঁড়িয়ে রইল।

নির্জন নদী সৈকত অন্ধকার নেমে আসছে, বর্ষার সন্ধ্যা। এখানে এভাবে থাকা আর উচিত নয় মাধুরী ঘরে ফিরবে কিন্তু কোথায় ঘর। যে সুখনীড় সে রচনা করতে চেয়েছিল আকস্মিক ঝড়ে তা ভেঙ্গে গেল গাছ থেকে পড়ে যাওয়া একটা পাখির বাসা হাতে তুলে মাধুরী ভাবছে চোখের জল টলমল করছে ওর! না সামলাতে হবে, মাধুরী বাসাটাকে স্রোতের জলে ছেড়ে দিল ভেসে যাচ্ছে বাসাটা ভেসে যায়, সবই ভেসে যায় ডুবে যায় নিষ্ঠুর আবর্তে।

উঠে আসছে উপরে, এক ভিখারিনী হাত পাতল কোলে একটা শিশু।

দাও না দুটো পয়সা।

তুমি বিয়ে করেছিলে?

হ্যাঁ, মা, দুর্ভিক্ষের বছরে চোখের জল গড়িয়ে গেল মেয়েটার।

থাক, আর বলতে হবে না। মাধুরী হাত ব্যাগ খুলে দুটো টাকা ফেলে দিল। রাণী হও মা রাজরাণী হও।

কাকু তো আসছে কাঁদছো কেন মা তুমি?

অর্পণা কোন জবাব দিতে পারলো না। নিঃশব্দে তাকালো ছেলের মুখপানে উপচে পড়ছে জল। শেষে হাহাকার করে উঠলো অর্পণা—

হারে হতভাগ্য ছেলে—

কিন্তু কিছুই বুঝলো না খোকন। বাইরের রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালো, পেঁপে গাছটায় চার পাঁচটা ফল পেকেছে কাকু এলে খাবে, কলার ফুলটাও পাড়তে হবে এবার কাকু চপ তৈরী করবে এ দিয়ে। গতবার দোপাটি ফুল অজস্র ফুটেছে আর নীল অপরাজিতা কাকু দেখবে এসে। হ্যাঁ ঐতো আসছে কাকু। গরুর গাড়ি এসে থামলো। একি কাকুই তো। চেনা যায় না, অমন কার্তিকের মতন কাকা খোকনের যেন মনে হলো ভুতের কঙ্কাল।

কাকু। খোকন দৌড়িয়ে গিয়ে কাকুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আয় বাপ আমার। বলে হাত বাড়াতে গিয়েই থেমে গেল মহেন্দ্র। আস্তে বলল, ছেলেটাকে সরাও বৌদি—

হ্যাঁ এসো—।

অর্পণা অশ্রুপ্লাবিত চোখে মহেন্দ্রকে ধরলো গিয়ে, ধীরে ধীরে নামালো গাড়ি থেকে, অতিসাবধানে নিয়ে এল তার শোবার ঘরে কিন্তু খোকনকে ওখান থেকে সরিয়ে দিল দয়াল, ঠেলে বের করে দিল। খোকনের কাকু আর ওকে যেতে দিবে না কাকুর কাছে। কেন? অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে চলে গেল খিড়কীর পুকুরে। গোটাকতক ঢিল ছুঁড়ে মারলো জলে বসা পান কৌড়িগুলোকে উড়ে যাচ্ছে পাখিগুলো।

যা, পালা সব, কেউ এখানে থাকতে পারবিনে দুই গালে জল খোকনের। মহেন্দ্র এসে শুয়ে পড়লো খাঠে ওর জিনিসগুলো সব দয়াল এনে রাখলো এই ঘরেই, সেতারটাও আনলো, মহীন হাত বাড়িয়ে নিল পাশেই রাখলো। দেবেন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরের এক ধারে, এতক্ষণ মহেন্দ্রের খাটে এসে বসলেন তার সর্বাঙ্গ দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করতে লাগলেন, বুক চিবুক, চোখ কিন্তু ওর চোখে অবিরল ধারা নামাছে।

এ কতদিন হচ্ছে মহীন। প্রশ্নটা আটকে যাচ্ছে গলায় বার বার।

কলকাতায় থাকতেই বুঝা গিয়েছিল দাদা—

তাহলেও তক্ষুণি বাড়ি ফিরলে কেন?

লাভ নেই। ওর চিকিৎসা করার মত সামর্থ আমাদের নেই দাদা।

তাহলেও আমি ভিটে মাটি বেঁচে দেখতাম। একি করলি মহীন। আমার অন্ধের চোখ অন্ধ করলি।

সান্ত্বনার ভাষা। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দয়াল অর্পণা ঘরের চৌকাঠ ধরে নিজেকে সামলাচ্ছেন, মহীন কিন্তু স্থির কণ্ঠে বললো—

ঐ বিঘে পাঁচ সাত জমি আর ভিটেটুকু থেকে খোকনকে বঞ্চিত করতে পারলাম না দাদা। দূর দেশে গিয়ে হাওয়া বদলের চেষ্টা করছি যথাসাধ্য ওষুধ পথ্যও খেয়ে দেখলাম, এ মিনতি, কোন ফল হোল না। যা রইল তাই দিয়ে ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে খরচ আর করবে না আমার পিছনে।

মহীন? দেবেন্দ্র একবার আর্তকণ্ঠে ডাকলেন তুই যে আমার কাছে খোকনের থেকে বেশি মহীন কিন্তু বলা হলো না কথা। দেবেন্দ্র মহীনের মাথাটা কোলে নিয়ে নীরবে বসে রইল বহুক্ষণ।

ধীরে ধীরে মৃত্যু এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে পদ সঞ্চারে মহেন্দ্র ভাবে নির্মম আঘাত সে করে এসেছে মাধুরীকে। কেন করেছে, তা জানলো না মাধুরী, জানবে না কোন দিন। দ্রাক্ষার কালিতে লেখা স্বাক্ষর অস্পষ্ট হয়ে যাবে মাধুরীর মনের পট থেকে মুছে যাবে হয়তো। যাক গভীর রাত্রে মহেন্দ্র সেতার খানা বাজাতে বাজাতে ভাবে এইসব।

আর রাত জেগো না মহীন। অর্পণা এসে বসে।

দূর বোকা মেয়ে। মাধুরী হেসে বলল রাণীরা থাকে রাজমহলে, তোদের দুঃখ কি তারা দেখতে আসে। চলে এল মাধুরী মোটরের কাছে। মুখটা মুছে নিল অনুপ সিং দেখার আগে তারপর চড়ে বসতে বললো—

বাড়ি চলো সিংজি কথাটায় এতো বেশি ক্রন্দন যে নিজেই চমকে উঠলো মাধুরী।

কিন্তু অনুপ সিং অত লক্ষ্য করবে না। দীর্ঘদিনের পুরানো লোক সে। মাধুরীকে জন্ম থেকে দেখছে। স্নেহ করে নিজের কন্যার মত। নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মতলার মোড়ে ভিড় গাড়িটা থামাতে হলো।

কাগজের ঠোঙায় লজেন্স চিনাবাদাম বিক্রি করছে একটা লোক, অন্য একজন বেচছে বেলুন এগিয়ে আসছে মাধুরীর গাড়ির দিকে। মাধুরী বলল চালাও সিংজী এরা বড্ড বিরক্ত করে—

গরীব আদমী হুজুর বলে অনুপ সিং ধমক দিল হকারকে এই ভাগ গে।

ভাগবার লোক নয় ওরা বেলুনওয়ালা ঠিক এসে দাঁড়ালো এবং বললো বিরক্ত হলে চলবে কেন বলুন, আপনারা না কিনলে আমরা খাই কি? আমাদের তো ছেলেপেলে আছে। দেব দুটো—

দিন—মাধুরী একটা আধুলী ফেলে দিল ওর হাতে—ক'টি ছেলেমেয়ে আপনারা?

গুণে বলতে হবে স্যার। গরীবের ঘরে ওরা অগুন্তি আসে। চারটা বেলুন ভেতরে দিয়ে সে চলে গেল। গাড়িও ছাড়ল! মাধুরী হাসছে ওর কথাটা শুনে। কিন্তু দেখতে পেল এক জোড়া বর বধু খাচ্ছে। বধুটিকে দেখলো মাধুরী দেখতেই লাগলো গলা বাড়িয়ে। মাধুরীর গাড়ি ঐ ট্যাক্সির পাশাপাশি আসতেই খোলা গাড়িতে ক'নের কোলে অকস্মাৎ বেলুন চারটা ফেলে দিল? মাধুরীরে গাড়ি বেগে চলে যাচ্ছে। আপনার

রসিকতায় হাসছে মাধুরী। ওদের ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্যই দিল। ভাঙ্গা বাসাটা স্রোতে ফেলে দিয়ে এসেছে, গাড়ি নীড়টাকে কিছু তো দিল।

মুখের হাসিটা ওর মিলাচ্ছে না আর একবার গলা বাড়িয়ে দেখতে চাইলো অনেকে, মুখে হাসি কিন্তু চোখে জলটা যে রোধ করা যাচ্ছে না। হোল কি মাধুরীর? এত দুর্বল তো ও নয়। না মাধুরীর অন্তরের মৌচাককে কে যেন নিংড়ে দিচ্ছে। অসহায় মাধুরী শুয়ে পড়ল নরম কুশনের উপর।

সুদীর্ঘ পথ, মন বিষণ্ণ শরীর অবসন্ন, মাদ্রাজ শহরে এসে নামলো মহেন্দ্র। অর্ধমৃত মনে হচ্ছে ওকে। কিন্তু এই দূর বিদেশে, কোন আত্মীয় স্বজন নাই নিজেই নিজেকে দেখতে হবে।

আপনার অন্তর দিয়ে রচনা করে প্রেমস্বর্গ ও ত্যাগ করে এসেছে নিষ্ঠুর নিয়তি ওকে কোথায় নিয়ে যাবে, কে জানে।

মাদ্রাজ ব্যাঙ্কের ঠিকানা ছিল সেখানে পৌঁছাতে অসুবিধা হোল না বেলা নয়টায় পৌঁছাল মহেন্দ্র। ও কি রকম দেশ? ধনীর প্রসাদের পাশে দরিদ্রের কুটির বাংলাদেশের চেয়েও প্রকট বেশি ওখানে। কিন্তু ওসব ভাবলে চলবে না। মহেন্দ্র ওখানকার অফিসে দেখা করলো।

ওখানে যিনি আছেন, তিনি মাদ্রাজী হলেও অতিশয় আদরে মহেন্দ্রকে গ্রহণ করেন। কাছাকাছি একটা কম খরচের বাড়িতে তার থাকবার জায়গাও ঠিক করে দিলেন। একতলা একটি ঘর বড্ড গরম কিন্তু ভাড়া খুব কম কাজেই মহেন্দ্র এখানে আস্তানা গাড়লো। নিজেই রান্না করে খাবে, আর যদি কোনদিন না রাঁধতে পারে হোটেলে খেয়ে নিবে। কুইক সার্ভিস বলে এক রকম খাদ্য পাওয়া যায় এখানে নানারকম আনার দিয়ে তৈরি হয় চাইবা মাত্র সার্ভ করে, তাই এর নাম কুইক সার্ভিস।

মাদ্রাজ শহরটা দেখতে দু'একদিন গেল মহেন্দ্রের। বাড়িতে দাদাকে লিখে জানালো তার এখানে আসার কথা এবং কলকাতার প্রকাশক আর পত্রিকার অফিসেও জানিয়ে দিল কিন্তু মাধুরীকে বা উমেশবাবুকে কিছুই জানালো না।

এই অকৃতজ্ঞতা ওকে পীড়িত করছে কিন্তু মহেন্দ্র নিরুপায় কেন? কেউ জানে না, জানে মহেন্দ্র স্বয়ং আর বিশ্বনিয়ন্তা বলে যদি কেউ থাকেন। ভীরু মহেন্দ্র পালিয়ে সে এল, প্রেমের অপমান করে এল মহেন্দ্র। মাধুরী ভাববে এবং এ কথাই ভাববে। মহেন্দ্র ভীরু মহেন্দ্র কাপুরুষ, মহেন্দ্র অশক্ত দুর্বল শুধু নয়, মহেন্দ্র অকৃতজ্ঞ, মহেন্দ্র অ—প্রেমিক। উপায় নাই, অন্য আর কিছু উপায় নাই। মাধুরীর ভাল হোক, সে রাজরাণী হোক মহেন্দ্র সর্বান্তকরণে কামনা করে। শিবের গলার মালা সে শিবের গলায় দিতে পারে না—না, না—

চোখে জল মহেন্দ্রের কিন্তু দুর্বল হলে চলবে না। আরও কঠিন হতে হবে। এখনো অনেক বাকি আছে তার দুঃখের এরপর আছে নিবিড় অমাবস্যার নিবদ্ধ অন্ধকার—নির্মম নিয়তি। মহেন্দ্র প্রথম দিন হোটেলে খেয়ে অফিসে গেল। এখানে যত গরম তত লঙ্কার ঝাল তেঁতুলের টক। আম সস্তা কিন্তু স্বাদ নেই, বাংলার বাগানের আম মনে পড়ছে তাদের খিরকী পুকুরের গাছের আম।

ওঃ কতদূর। কত দীর্ঘ দূরত্ব। কিন্তু মন এমন বস্তু যে মহেন্দ্র এই মুহূর্তে তাকে মাধুরীর কাছে পাঠাতে পারে, মাধুরী এই কয়মাস তার অনুক্ষণের সঙ্গিনী ছিল।

অফিসে কাজ করছে। মাত্র তিন জন লোক, একটা বেয়ারা, মহেন্দ্র একটা চিঠি টাইপ করছে প্রথমেই কলে কাগজ লাগিয়ে কলকাতা অফিসের ম্যানেজারের নাম লিখতে হবে মহেন্দ্র খট খট করে টাইপ করে ফেলল মাধুরী ভট্টাচার্জ। রবার দিয়ে মুছলো সেটাকে মহেন্দ্র লিখে ফেলল মাধু ম্যানেজার শব্দটাতে ভুল হলো।

দূর হোক কাগজখানা খারাপ হয়ে গেল। মহেন্দ্র ফেলে দিয়ে অন্য কাগজ নিয়ে আবার টাইপ আরম্ভ করলো। দারুণ গরম পাখা চলছে, তবুও অস্বস্তি লাগে মহেন্দ্র কষ্টে শেষ করলো চিঠিখানা।

কাজ খুব কম কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা এক মহা বিড়ম্বনা। মহেন্দ্র দু'চার দিনের

মধ্যে অফিসের অবস্থা বুঝে খাতা নিয়ে ওখানেই লেখা আরম্ভ করছে। বাংলা ওরা কেউ বুঝে না। মহেন্দ্র দেখে শুনে খাতিরও করলো এবং এদিকে মহেন্দ্রের যথেষ্ট সুবিধাও হলো।

গভীর রাতে মহেন্দ্র সেতারখানা তুলে নেয়, মাধুরীর আঙ্গুল বুড়ালো সেতার মনে পড়ে মাধুরী বলেছিল আমার হাতেরর বীণা তোমার হাতে বাজাবে ঘেরাটোপ খুলে যন্ত্রটায় হাত বুলিয়ে আদর করে মহিন চুম্বন করে তারপর বাজাতে আরম্ভ করল চোখ বুজে। সেতারটা যেন স্বয়ং মাধুরী। একলা ঘরে হেসে হেসে শুধায় সেতারখানাকে শুনছো মাধুরী বিরহের ব্যথা ভরা স্বর, শোন—

মাদ্রাজ নৃত্য গীতের দেশ ঐ আবর্জনাময় একতলা বাড়ির কুঠরী থেকে সুরের পরী নৃত্য করতে করতে বের হয়ে আসে শহরের গলিতে তার অনির্বাণ আকর্ষণ অনুভব করলো ঐ পাড়ার কয়েকজন অনতিবিলম্বে। একদিন এসে তারা ধরলো মহীনকে।

কতো সুন্দর বাজান আপনি? চলুন, আমাদের শ্রীমন্দিরে আপনাকে যেতে হবে।

এ সেতার তো অন্য কোথাও বাজে না ভাই? মহেন্দ্র সবিনয়ে জবাব দিল।

কেন? বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে তাকালেন ওঁরা।

এটা ভূতে পাওয়া সেতার এই ঘরে দরজা বন্ধ করে ওকে বাজাতে হয় হাসল মহীন।

বেশ ওটা থাক হেসে বললেন, আমাদের শ্রীমন্দিরে বিস্তর যন্ত্র আপনি যেটা ইচ্ছে বাজাবেন আজ আপনাকে যেতে হবে আমরা নিয়ে যাব সন্ধ্যাবেলা।

বাংলা এঁরা জানে কিন্তু ইংরেজীতে কথা প্রায় সকলেই বলতে পারেন বলল—

আমি সুরের সাধনা করি, তারজন্য দরকার নির্জনতার। শ্রীমন্দিরে সেটা হবার যো নাই আমাকে মাফ করলে খুশি হবো, আমার সুরে আমি সমাধিস্থ থাকতে চাই—

সে কি? আপনার মতন অসধারণ শিল্পীকে চিনবো না আমরা। না না কাল আপনাকে একবার যেতেই হবে, সাধনা আপনি করুন। মধ্যে মধ্যে আমরা না শুনে ছাড়ছি না।

যাবার সম্মতি না দিয়ে উপায় নাই। পরদিন সকালে ওরা এসে পড়লেন মহেন্দ্রকে নিয়ে যেতে। মাধুরীর সেতারখানা মহেন্দ্রে একবার তুললো নিয়ে যাবার জন্য, না যদি হারিয়ে যায়, যদি ভেঙ্গে যায়, অতি যত্নে মহেন্দ্র ওটা রেখে দিল। আবার এরা প্রশ্ন করলেন—

ঐ সেতারটি খুব প্রিয় বুঝি আপনার?

প্রিয়। না না প্রিয় বললে সবটা বুঝায় না, ওকে আমার প্রিয়া বলা চলে। হাসলেন সবাই কিন্তু একজন ওরইমধ্যে রসিক আছেন, বললেন—

ভূতে পেয়েছে বলেছিলেন যে।

হ্যাঁ, সুরের ভূত। একলা ঘরে রোজ ওকে বাজান হয়, নইলে আমার ঘুম জাগরণ জীবন মরণ একাকার করে দেবে, হাসলো মহেন্দ্র। দীর্ঘায়িত চোখ ওর চিকচিক করছে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ওদের সঙ্গে।

এক পূজামন্দির সংলগ্ন মুণ্ডপ এই শ্রীমন্দির, বড় ক্লাব, বহু ব্যক্তি শুনলেন মহেন্দ্রের যন্ত্রালাপ কিন্তু কণ্ঠ সংগীত সে গাইল না এখানে। অথচ ওপাড়ার সবাই শুনেছে কণ্ঠও তার অপরূপ। একজন বললো—

বাংলা গানই হোক না একটা।

মাফ করবেন। মহেন্দ্র কাটিয়ে দিল অনুরোধটা।

উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা পেল সে। কত যে আনন্দ ওর হবার কথা। কিন্তু না বিষাদের বিষন্নতা ওকে মুহূর্তের জন্য ত্যাগ করলো না। ফেরার পথে একজন বললেন—

নিজেকে প্রকাশ করুন। সত্যি আপনি অসাধারণ শিল্পী।

সব ফুল প্রকাশ পায় না বন্ধু অনেক গোপনে ঝরে যায়, মৃদু হাসলো মহেন্দ্র। আপন আবাসে ফিরে গভীর রাত্রিতে মাধুরীর দেওয়া সেতারটা বাজাতে লাগলো মাধুরী শোন—

অন্তরের ব্যথা অশ্রুর আকারে ঝরে পড়ছে—

অশ্রুর অক্ষরে কিছু সৃষ্টি করে যেতে হবে মহেন্দ্রকে। এখানে কাঁদলে তো চলবে না। মহেন্দ্র অকস্মাৎ সেতারখানা ঘেরাটোপে মুড়ে রেখে দিল তারপর কাগজ কলম নিয়ে বসল। অত্যন্ত অসুস্থবোধ করছে, তবু লিখলো খানিকটা।

জীবন মহাসাগরে সীমাহীনতার কয়েকটা ক্ষুদ্র দ্বীপ জলে গেছে। উঠেছে ওরই উপর কখনো বা বসে এসে সমুদ্রচর পাখি। রঙিন পাখার হাওয়া বুলিয়ে যায় সাথীর সঙ্গে কূজন করে যায় এই তো জীবনের অবলম্বন। কত ক্ষুদ্র, কত অসহায় সে। তবু জীবন কত মহৎ কত বিরাট কত উদার। কী বিস্তীর্ণ ওর পরিধি। তবু জীবন একা, একান্তই একা জীবনে সে সত্য না প্রকাশ পাক, কারণ তার অনিবার্যতা কেউ ঠেকাতে পারবে না, লিখে চলছে মহেন্দ্র। দীর্ঘক্ষণ লিখলো, ক্লান্ত হাত আর চলছে না। কখনো এক সময় কলম হাতেই ঘুমিয়ে পড়লো মহেন্দ্র।

অফিসে কাজ কর্ম এবং উপরে কৈফিয়ৎ নেবার কেউ নেই বলে মহেন্দ্র যথেচ্ছা অফিসে যায়, কুকারে রান্নার করে খায় না হয়তো দোকানে কুইক সার্ভিস চালিয়ে দেয়। নিজের উপর তিলমাত্র দরদ ওর নেই যেন। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি বিরামহীন গতিতে চলেছে, সঙ্গীতও চলে গভীর রাত্রে, একবার অন্ততঃ সেতারখানা না বাজিয়ে মহেন্দ্র ঘুমাতে পারে না এক অশরীরী আকর্ষণ যেন হাতছানি দেয় বাজাও একবার বাজাও।

কলকাতায় থাকাকালীন মহেন্দ্র যে উপন্যাসখানা লিখেছিল তা ছাপা হয়ে এসেছে এবং দুটো বাজনা আর দু'খানা রেকর্ড দিয়েছিল, খবর পেল চিঠিতে যে, সেগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে ওরা লিখেছে মহেন্দ্র বাবু আরো কিছু রেকর্ড দিলে কোম্পানি খুশি হয়ে গ্রহণ করবে?

সব সম্ভাবনা সম্মুখের। সম্পদ, সম্মান এবং সুন্দরী মাধুরী, না মহেন্দ্র যেন চীৎকার করে উঠলো না শব্দটা সঙ্গে সঙ্গে। সর্বাঙ্গ কাঁপছে ওর। কী এত অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস যেন বুকখানা ফাটিয়ে যাচ্ছে। সামলাতে হোল চোখে জল আসা দরকার, কিন্তু কৈ মহেন্দ্র আজ কাঁদতে পারছে না। কম্পিত হাতে মহেন্দ্র ঘেরাটোপে ঘেরা সেতারখানা আনতে হাত বাড়ালো, অবসাদে হাতখানা জড়িয়ে আছে।

দু'মাসে কিন্তু মন্দিরটা দেখা হয়নি, চললো। ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে, নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো মহেন্দ্র দেওয়ালের সামনে, সোপানাবলী পার হয়ে তবে ভেতরে যেতে হবে, কিন্তু মহেন্দ্র অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর উঠে উপরে যাওয়া অসম্ভব। মহেন্দ্র ঐ সোপানের এক ধারে শুয়ে পড়লো।

দীর্ঘক্ষণ শুয়ে রইল মহেন্দ্র অকস্মাৎ মনে হলো মাধুরীকে আজ ছোয়া হয়নি আজ তার পূজা হয়নি যেন, মাধুরী অভিমান করে বসে আছে বাড়িতে। উঠেই ফিরলো বাড়ির পানে। রাত্র অনেক, একা পথ হেটে বাসায় এসে অদ্ভুত মহেন্দ্র সেতার নিয়ে বসলো, স্তব্ধ কক্ষের ঘুমন্ত কন্যা যেন জাগ্রত হয়ে উঠল মুহূর্তে কিন্তু যে রাজকুমার তাকে জাগালো তার রক্তাক্ত রসনা লেলহী হয়ে উঠলো সেতারের তন্ত্রীতে।

ঘরের ক্ষীণ আলোতে দেখলো মহেন্দ্র আবার আঃ। মহেন্দ্র নিঃশব্দে শুয়ে পড়লো সেতারটা কোলে নিয়েই।

আশ্চর্য। আমাদের একবার জানালো না পর্যন্ত। একেই বলে নিমকহারাম। বিয়ের নেমনতন্ন পাবেন মেজদি বললো ছোট বৌ, মেজবৌ এর কথার উপর।

ব্যাপারটা অন্য কিছু নয়, মাধুরী যে চিঠিখানা মেস থেকে এনেছে সেটা বড়বৌদি দেখেছে এবং বাড়ির সকলে জানতে পেরেছ যে, মহেন্দ্র কোলকাতায় নেই, অকস্মাৎ চলে গেল। এখানে কোন কিছু বলে না যাবার কারণ কেউ ওরা খুজে পাচ্ছে না। অতঃপর ঠিক করলো যে মহেন্দ্রর বৌদি তার বিয়ের সম্বন্ধে কথা, লিখেছেন, সে খবর এখানে প্রকাশ করতে মহীন লজ্জা বোধ করেছে, শুধু লজ্জা নয় ভয়ও করেছে কারণ মাধুরীর সঙ্গে তাকে অবাধ মেশার সুযোগ এরা দিয়েছিল। মহেন্দ্র সে সুযোগের অসম্মান করেছে, অতএব না বলে পালিয়েছে। কথাটা মনের মত হোল, কিন্তু মাধুরী

স্বয়ং এই আলোচনায় উপস্থিত নাই, অতএব আর কে কি ভাবলো দেখে লাভ নাই। শুধু বড়বৌ বললো সকলকে—

থেমে যা ভাইসব মাধুরীর মনটা আগে জানি তারপর কথা হবে।

এর আর জানা জানি কি দিদি, মেজদা বললো মহীন কোন নোলক পড়া কনে বৌকে বিয়ে করবে, তাতে মাধুরীর কি? ওকি মাধুরীর যোগ্য নাকি? ছোঃ। থাম মেজবৌ, ধমক দিল। ভালবাসার ব্যাপারে যোগ্য অযোগ্য তোরা কে কত দেখিস, আমার জানা আছে। খেলার মাঠে মেঝঠাকুরপোকে দেখে তুই কি রকম ঘায়েল হয়েছিলি মনে আছে। তোর কান্না দেখে মা তোকে এ বাড়িতে আনলেন নইলে হাসলো বড়বৌ। মেজবৌ হেসে বললো।

তুমি কি মনে কর দিদি, মাধুরী ওকে ভালবাসে?

ভাল তো বাসেই—তবে ভালবাসার নানা রূপ আছে গোপা! সেটা বোনের ভালবাসা হতে পারে। দু'চারদিনের অপেক্ষা করলেই বোঝা যাবে।

এত ভালবাসা নিয়ে তিন জায় কি পরামর্শ তোমাদের? বলে মাধুরী এসে উপস্থিত হলো অকস্মাৎ! ছোটবৌ ওর বন্ধু হতে চায় বলে বসলো।

আমাদের ছোটদি কাকে ভালবাসবে তাই নিয়ে বাজি ধরা হচ্ছে।

তাই নাকি!!

বেশ বেশ কার কি মত শুনতে পারি কি?

না না, তোকে শোনালে চলবে কেন?

তুই আগে ভালবাস, তারপর আমাদের কার জিৎ হলো বোঝা যাবে বড়বৌ বললো।

যদি কাউকে না ভালবাসি তাহলে তো আমারই জিৎ হবে।

তা কি হয় রে ছোটদি, হাসলো সবাই ওরা, ভালবাসতেই হবে। বিয়েও করতে হবে খামাকা সময় নষ্ট করছিস বললো মেজবৌ।

একেবারে সময়ই নষ্ট করে ফেললাম। আচ্ছা, তোমরা সকলেই আশ্বস্ত হও হে আমার পরম শুভাকাঙ্খিণী বৌদিগণ আমি অবিলম্বে ভালবাসব, প্রেমে পড়ব, এমনভাবে পড়ব তোমরা গলায় দড়ি দিয়াও টানিয়া তুলতে পারবে না। সবাই হাসলো ওর কথায়।

বাড়িতে কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো গোপনে গোপনে। বৌদিদের এবং দাদাদের বদ্ধমূল ধারণা যে মাধুরী বেশি আকৃষ্ট হয়েছে মহেন্দ্রের প্রতি। ওদের চোখে মহেন্দ্রের যোগ্যতা কম, তবু ওরা স্নেহের বোনটিকে সুখী করতে মহেন্দ্রের হাতেই তাকে দিতে আরজি হতো না, সেই মহেন্দ্র অকস্মাৎ যে কোন কারণে হোক গেছে কোথাও। সংবাদটা একদিক দিয়ে খারাপ হলেও অন্যদিক দিয়ে খুব ভাল সংবাদ ওদের কাছে। মহেন্দ্র গেছে, ভালই হয়েছে, তার আর কোন সংবাদ নিয়ে দরকার নাই। তার প্রসঙ্গই বাদ দেওয়া হোক এ বাড়িতে এবং মাধুরী যাতে অপর কোন যোগ্য পাত্রকে অবিলম্বে ভালবাসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হোক।

অতএব সকাল থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত গান গল্প খেলা চলতে আরম্ভ করলো রতীন এবং তার বন্ধুর দল গানের আসর জমায়, গল্পেরও। মেজদা চালায় খেলার ব্যাপারটা এবং বড়বৌ নিতান্ত নিরীহ হলেও তার ভাই বরুণকেও প্রায় আসতে দেখা যায় এ বাড়িতে। কুমার এবং তার সঙ্গিনী ডেইজী তো প্রতিদিনের অতিথি সব ব্যাপারটাই মাধুকে নিয়ে, সরে পড়বার সময় পায় না মাধুরী। অবিরাম আহ্বান আসছে, হয় সেজদা না হয় ছোটদার কাছ থেকে বড়দাও ডাকে সময় সময়, কিন্তু বড়দা অন্য কথা কয় না, বলে স্নেহের সুরে তোকে শুকনো লাগছে কেন রে দিদি।

না দাদা খুবই তো ভাল আছি? মাধুরী হেসে জবাব দেয়।

খান তিনেক যুদ্ধ জাহাজ এসেছে আমেরিকা থেকে, চল, দেখে আসবি।

মাধুরী দাদার সঙ্গে বেরুতে বাধ্য হয়, না গেলেও দাদা ভাববে মাধুরীর অন্তর অসুস্থ। জোর করে হেসে, গল্প করে, কত কি বায়না ধরে, কিন্তু স্নেহের সত্য দূরবীনটা বড় জোরালো বিষণ্ন হয়ে পড়ে। বলে—

মার্কেটে চল, ফুল কিনে দিই—
ও বাসি ফুল দিয়ে কি হবে বড়দা?
বাসি ফুল ওরা কেমন সুন্দর টাটকা রাখে চেয়ে দেখো—
হ্যাঁ, ওগুলো মিসরের মমী, কাঠামোটা আছে, আসল বস্তুটাই না। কি? মধু আর গন্ধ। বলে মৃদু হাসে মাধুরী।
একটা দোকানে নানা রকম জীবন্ত মাছ সাজানো রয়েছে শোকেসে, শৈবালের ভেতরে ভেতরে তারা সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে, বড়দা দেখে বললো, নিবি মাধু? সাজিয়ে রাখবি তোর ঘরে।
না বড়দা, এই বন্দী জীবন দেখলে আমার কান্না পায়, কতটুকু জায়গায় ওরা ঘুরছে?
নিরুপায় বড়দা আর কি করবে? ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে, নিজেও ব্যবসাদার অসংখ্য লোক চেনে তাকে। পথে কত ব্যক্তি নমস্কার জানায় তার ইয়ত্তা নেই। পাশে মাধুরী বসে থাকে, তাকেও নমস্কার জানায় সকলে। মাধুরী বলে।
তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুলে বিস্তর সেলাম পাওয়া যায় বড়দা।
হ্যাঁ, কেন? তোর খারাপ লাগে নাকি?
না, শিবের কাছে যে সব ভূত থাকে, মানুষ কেন তাদের পূজা করে তা বোঝা যায়, হাসে মাধুরী কথা বলতে বলতে—
বড়দা এবং আর সবাই জানে ওর কথা কইবার ধরন চুপ করে থাকে। বাড়ি ফিরে মাধুরী দেখে ছোটদার আসর গরম এবং সে আসা মাত্রই ডাক আসে। শেষে মাধুরী অতিষ্ঠ হয়ে বৌদিকে বলে।
বাড়িটা একেবারে গড়ের মাঠ হয়ে উঠলো পালাতে হবে দেখছি।
অত কষ্ট করে কাজ কি? কারো সঙ্গে গেথে যা বড়বৌদি বললো।
গেঁথে যাবো। আমি কি পুঁতির মালা নাকি। মাধুরীর চোখ মুখ গম্ভীর।
পুঁথির মালা কে বলেছে। মুক্তার মালাই হবি—
মোটেই না, আমি হারের মালা গাঁথবোই কাকে, পরাবোই বা কাকে বলো।
কিন্তু সেদিন কথা হয়েছে, তুই অবিলম্বে কাউকে ভালবাসবি, কথা রক্ষা কর।
ভালো তো বেসেছি ঐ গাছ পাতা পাথর কাক কোকিল চিল গাংচিল, তারপর মাধুরী দিল হেসে, আরো কত কি—
ও ভালবাসাকে প্রেম বলে না তুই বলেছিলি প্রেম পড়বি—পড় শীঘ্র।
ওহো, প্রেমে কিন্তু পড়তে পারছিনে বৌদি, কণ্ঠ এমন করুণ করলো মাধুরী যে বৌদি আর হাসি চাপাতে পারলো না, কিন্তু মাধুরী বলে চলেছে—
আমি তোমার গলায় দড়ি বেঁধে প্রেম সাগরে ডুবতে যাবো—
মাধুরী বৌদির গলায় আঁচলটা জড়িয়ে টানছে। বৌদি অতিষ্ট হয়ে বললো, থাম রে পড়ে যাবি ভাই, কিন্তু ছোটদি শোন, বড়বৌ অকস্মাৎ গম্ভীর হলো।
বলো, আদেশ করো না পালন করতে পারবো না......
না, আদেশ তোকে যে করবে তারই কথা বলছি—
হেন জন জন্মে এই নাই এ ত্রিভুবনে থিয়েটারী ঢং এ বললো মাধুরী।
ঠিক জন্মেছে, আজ কথাটা আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই, তোর বড়দার আদেশ বিয়ে না করতে চাইবার কি তোর কারণ? আমাদের দেশী প্রথা মতন কেউ তোকে দেখতে আসবে, এ তুই চাসনে আর আবার বিলেতী ঢং-এ কাউকে পছন্দ করবি তাও হচ্ছে না, এতো সুযোগ সুবিধে আমরা করে দিচ্ছি তবু তোর মতলবটা কি খুলে বল।
দেশী প্রথায় আমার শ্রদ্ধা নেই। আমাকে দু'মিনিট দেখে কেউ অপর কারো জন্য নির্বাচন করবে এ আমি মেনে নিতে পারি না, আর বিলাতি প্রথার তোমরা বাধা—
আমরা? বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠলো বৌদির।
হ্যাঁ তোমরা, কতগুলি শিংওয়ালা ভেড়া ঘরে এনে তোমরা লড়াই দেখছো, এদিকে ওদের শিং এর ঠোকাঠুকিতে আমি বেচারা যাই যাই অবস্থা। তোমাদের মায়া মমতা কিছু নেই আমার উপর! নাকি স্বয়ম্বরের দিন যে ওদের মধ্যে লড়াই এ যে জিতবে,

তাকে আমি মালা দিব। ওদের বিদেয় কর দোহাই তোমার। আচ্ছা, কিন্তু তারপর তোর মালাটা পাবে কে?

মালা এখনো আমার গাঁথা হয়নি, বলে গেল মাধুরী?

উনিশ বছরে মেয়ে। ফুটন্ত যৌবন ওকে ঘিরে ধরেছে। বড়বৌদি দেখলো বাড়ির সকলের স্নেহের পুতুল ওকে কি করে সুখী করা যায়। নিঃশ্বাস ফেলে বড়বৌদি স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

কি ব্যাপার? অমনকরুণ দেখাচ্ছে তোমায়?

মাধু সম্বন্ধে আমি খুব ভাল বুঝছি না। মহীনকে ও ভুলতে পারছে না! আর তোমাদের এ সব বন্ধু বান্ধব কেউ ওর মন জয় করতে পারবে বলে মনে হয় না। ওদের বিদেয় কর মেয়েটা খামোখা মনঃকষ্ট পাচ্ছে। এভাবে চললে ওর শরীর ভেঙ্গে যাবে....

কি তাহলে করা যায়, বলে বড়দা উঠে বসল ভাল হয়ে। তুমি কি মহীনের কথাও তুলেছিলে ওর কাছে।

না, ওর কথা আমরা মোটেই আলোচনা করতে চাই না মাধুরীর সঙ্গে সে গেছে যাক—

কিন্তু মাধুরী যে ওকে ভুলতেই পারছে না বলছে?

হ্যাঁ, ভুলবার অবসর কে দিচ্ছ তোমরা? এই ভেড়ার গোয়ালের আওয়াজ ওকে মহীনের শান্ত গম্ভীর চরিত্রটা স্মরণ করিয়ে দেয় বার বার। মাধুরী নদীর মতন মহীন ছিল গম্ভীর সমুদ্রের মতন, ওদের মিলন হলে—বড়বৌদি কেঁদে ফেললো—

মহীনকে কি আবার খুজবো তাহলে? বড়দা প্রশ্ন করলো।

না, খোঁজা ঠিক হবে না। মহীনকে আমি যতখানি জেনেছি, তাতে মনে হয় কোন কারণ ছাড়া সে চলে যায়নি, কারণ সেই মাধুরীকে গভীর ভাবে ভালবাসে?

তাহলে চলে সে গেল কেন? আমি তো খুঁজেই পাচ্ছিনে কি এর কারণ? ওদিক দিয়ে ভেবে লাভ নেই। যে ভাবে সে গেছে, তাতে মনে হয়, না গিয়ে তার উপায় ছিল না। মাধুরীকে ভুলবার জন্য পথ দেখাতে হবে।

কি বল।

ও দমদমার বাগানে কি সব করতে চায়, করে দাও। দিন কতক কাটাক ক্লান্ত হয়ে পড় ক ঐ সব ব্যাপারে—মন সঙ্গীর অভাবটা অনুভব করুক তখন নিজেই বেরিয়ে আসবে ওসব ছেড়ে।

কিন্তু যদি ঐ কাজ নিয়ে মেতে যায়?

যায় তো যাবে। আমরা চাই ও সুখী হোক—ওতেই যদি সুখ থাকে তো থাকবে।

এ পর্যন্ত কথা কয়ে বড়বৌদি নিজের কাছে চলে গেল। বড়দা কিছুক্ষণ ভাবলো মাধুরী সম্বন্ধ্যে। দমদমার বাগানে কি করবে তার প্ল্যান মাধুরী আগে দিয়েছে বড়দাকে? সেইটা আবার দেখলো। সুন্দর সুবিস্তৃত পরিকল্পনা মাধুরীর মন্দ কি? তাই করুক কিছুদিন। নইলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে সারা বাড়িটায় ওই হোল বেশি আতঙ্ক।

পরদিন সকালে বড়দা মাধুরীকে নিয়ে বেরুলো দমদমার বাগান দেখতে। প্ল্যান মত কোথায় কি করা হবে তার জন্যই তাদের ফার্মের দুইজন ইঞ্জিনিয়ারও অন্য গাড়িতে গেলেন। কয়েকখানা ঘর তৈয়ার করতে হবে এবং আরো নানান কিছুর দরকার ফেরা পথে মাধুরী চুপচাপ বসে আগের গাড়িতে।

খেয়াল তোর কতদিন থাকবে ছোটদি? বড়দা প্রশ্ন করলো।

খেলাল নয় দাদা প্রয়োজন। আমার জন্যে, তোমার জন্যে এবং আরো অনেকের জন্য।

কিন্তু বিয়ে করে স্বামী সংসার নিয়ে এগুলো করা চলে বোনটি।

হয়তো যেমন তেমন ভাবে চালানো যায় কিন্তু তাতে তো একনিষ্ঠ আসে না দাদা, নিষ্ঠা ভাগ হয়ে যায় যে কোন তপস্যার পেছনে একনিষ্ঠতা থাকা দরকার।

তাহলে কি বুঝবো, তোর এটা তপস্যা। বড়দার প্রশ্নটা কেমন যেন ক্রন্দন ভরা।

তপস্যা কিছু খারাপ নয় দাদা, মাধুরী হাসলো, বাবার তপস্যায় আমাদের এত বড়লোক করেছে, মোটরে চড়ে বেড়াচ্ছি, তোমার তপস্যায়ই আমরা নির্ভয়ে খাই, দাই, ঘুমোই, আমার তপস্যায় যদি কারো কিছু ভাল হয় তো হোক গাড়িটা গেটে ঢুকলো।

হোক বড়দা যেন ক্লান্ত কণ্ঠে বললো, টাকার আমাদের অভাব নাই দিদি, বাবা যথেষ্ট রোজগার করেছে, তার সিকি অংশ তোর আর আমাদের গোটা পরিবারের সব স্নেহ তোর উপর রইল, যা তুই চাইবি, যাতে তুই সুখী হবি, তাই করে দেব।

আমি জানি, বড়দা এই মূলধন নিয়ে আমি তপস্যায় বেরুলাম।

মাধুরীর গাড়ি থেকে নেমে ঘরে ঢুকলো। বড়বৌদি শেষের কথাগুলো শুনল বড়দার সঙ্গে। মাধুরীকে পেছনে ফেলে প্রশ্ন করলো—

তাহলে বাগানই করবি বিয়ে করবি নে।

বিয়ের ব্যাপারটা আমার কাছে একটা পুরুষের সঙ্গে একটা মেয়ের জীবন বেঁধে দেবার চুক্তিপত্র নয় বৌদি, আমার কাছে ওর অর্থ আত্মার সঙ্গ আত্মার অখণ্ড মিলন, শোলার টোপর আর শাঁখের বাদ্যি না হলেও সেটা হতে পারে, চলে যাচ্ছে মাধুরী।

মাধুরী। জড়িয়ে ধরলো বড়বৌদী ওকে, চোখে জল আসছে, বললো, তোকে মাঝখানে রেখে তোর দাদার খাটে শুয়ে থাকতাম, কত স্নেহের ধন তুই আমাদের। এ অভিশাপ কেন তুই মেনে নিবি, বাগান করে আর গরু পুষে কি মেয়েদের জীবন কাটেরে দিদি?

মাধুরী বিব্রত এবং বিপন্ন হয়ে পড়ল। তাই মাতৃসীমা স্নেহশালী বড়বৌদিকে অন্তরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করে মাধুরী আর কেউ হলে দু'কথায় উড়িয়ে চলে যেত, কিন্তু ওখানে ওকে ভাবতে হয়। কষ্টে হাসি এনে বললো—

বুড়িয়ে যাইনি বৌদি এই তো উনিশে পড়লাম, বিয়ে এরপর করতেও পারি কাউকে।

এমন দিন কি হবে রে ছোটদি।

কি জানি শাখে তো জল দিয়ে রাখ, ঠিক সময়ে যেন বাজে।

বলে আর দাঁড়ালো না সটান উপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিল আর সে অভিনয় করতে পারছে নির্দয় অভিশাপে ওকে জড়িয়ে ধরেছে নাগপাশের মত। দরজা বন্ধ করে মাধুরী হাত ফুলগাছে রাখলো, সেই না জানা ফুল, দেরাজ থেকে মহেন্দ্রের ফটোখানা বের করে ওর পাশে রেখে বললো—

শোন এর নাম রাখলাম স্বাক্ষী ফুল, তোমার আমার মিলনের স্বাক্ষী, চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে।

মহেন্দ্র যাওয়ার পর, কেন গেল, এবং কোথায় গেল, এ আলোচনা যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু সবই মাধুরীর অসাক্ষাতে, অনেকের ধারণা মহেন্দ্র নিজেকে একান্তভাবে মাধুরীর অযোগ্য ভেবে চলে গেছে, মেজবৌদির এই মতটা প্রবল। ছোটদা এবং বৌদির মত হচ্ছে, ওদের দু'জনার কোন রকম ঝগড়া বা মান অভিমান হয়েছে, মহেন্দ্র তাই আত্মগোপন করলো। মেজদা বলে, মাধুরী যে ভুল করতে যাচ্ছিল, মহীন এটা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য চলে গেছে। বড়দার কোন মত নাই, মহেন্দ্র চলে যাওয়ায় মাধুরী যাচ্ছে ভেঙে পড়ে এই তার ভয়। আর বড়বৌদির মত হচ্ছে মহেন্দ্রের যাবার পিছনে এমন কিছু আছে, যা অগ্রাহ্য করা কারো সাধ্য নয়। সে কারণটাও বড়বৌদি যেন আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু মুখ ফুটে সেটা বলা চলে না সহজে, অন্ততঃ বলতে সে চায় না।

উমেশবাবু এবং গিন্নীমা মহেন্দ্রের এই ভাবে চলে যাওয়াটাই কিভাবে গ্রহণ করলেন, জানা যায় না। ইচ্ছে করলে তাঁরা দেবেন্দ্রকে পত্র লিখে খবর নিতে পারতেন, কিন্তু মেজবৌমা বাধা দিল, বললো যে পিতৃবন্ধুর পুত্র হিসাবে ম[illegible]কে যথা সাধ্য স্নেহমমতা দেখানো হয়েছে এবং তার প্রতি কোন অকর্তব্য হয় নাই। এরপর সে যখন অকস্মাৎ নিরুদ্দেশের পথে চলে গেছে তখন তাকে যেতেই দেওয়া উচিত সে সংসারী হবে কি সন্ন্যাসী হবে, গরীব হবে কি ধনী হবে, কিছু এদের এসে যায় না।

অতঃপর বন্ধুদের কথা আসে, মাধুরী যেভাবে মহীনকে নিয়ে মেতে ছিল। এই ক'মাস তাতে সোসাইটির সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, মহেন্দ্র চলে যাওয়ায় যেন চাঁদ রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে, এমন ভাব সকলের। কুমার বললো—

রাহুরমুখ থেকে মুক্ত মুখ চাঁদ যে দাগ হয়ে উঠে বৌদি, তখন তার আলো সুন্দর হয়।

হ্যাঁ—বড়বৌদি বললো, কিন্তু রাহু না হয়ে যদি সাপের ছোবল হয় তো বিরাট ভেতরে কাজ করে—সে বড় যন্ত্রণা কুমার বাহাদুর।

না, না, চাঁদ এত উঁচুতে যেখানে সাপ পৌঁছাতে পারে না হাসলো সবাই কুমারের কথায়!

কি জানি, বড়বৌদির কণ্ঠ বিষণ্ন বাবার কাছে শুনেছিলাম কেতুর চেহারা নাকি সাপের মতন—

কিছু ভাবলেন না, ঐ গরুর গোবর ও বিষ নেমে যাবে। সবাই হাসতে লাগল কুমারের কথায়! হাসিকে আরো উস্কে দেবার জন্য কুমার বললো ঐ দমদমায় দু'মাস থাকলেই ওর দম আটকে আসবে, তখন সোসাইটিতে ফিরবার জন্যে হাসুপাকু করবে দেখবেন।

আর একচোট হাসি কিন্তু বড়বৌদি অনুভব করলো কুমারের কণ্ঠে মহীনের ভাষা। এ কি অনুকরণ?

এ সব আলোচ্য কথাবার্তা সবই মাধুরীর অসাক্ষাতে। ওকে কেউ শুধোয় না মহেন্দ্রের কথা, তার প্রসঙ্গই তোলে না, মাধুরীর সমুখে। যে মানুষটা তিনমাসে এ বাড়িতে একটি বিশেষ মানুষ থেকেছে সে সরে যাওয়ার পর তার অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এমন কি যে ঘরটায় মহেন্দ্র থাকত তাকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করিয়ে মেজদার অফিস ঘর বানিয়ে দিয়েছে, চেয়ার টেবিল, টেলিফোনে আকীর্ণ সে ঘর এখন। মহেন্দ্রের ছেঁড়া পুঁথি দু'খানি ফেলে দিয়েছে কোথায় কে জানে মহেন্দ্রের অস্তিত্ব এরা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করে দিতে চায় এখানে। কারণ নিজের ঘরে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনে না।

কিন্তু এতটা করা যে কত বড় ভুল হলো, ওরা ভাবলো না। যার জন্য ওদের এই আপ্রাণ প্রচেষ্টা, সে কিন্তু তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করেছে এটা। সঙ্গীতের আসর, সাহিত্যের আসর সবই ঠিক আছে, শুধু মহেন্দ্রের কথাই উচ্চারিত হয় না কোথাও। এখানে বাড়িতে একটা কুকুর বিড়াল দু'দিন থেকে চলে গেলেও মানুষ বলে, আহা কুকুরটা আজ নাই, অথবা বিড়ালটা বড় জ্বালাতন করতো। মহেন্দ্র সম্বন্ধে এতটুকু কথাও শোনা যায় না এখানে। এই নীরবতা মাধুরীর অন্তরের কোন অতল তলে গিয়ে সরব হচ্ছে, ওরা কেউ খোঁজ নিল না। ওরা ইংরেজি প্রবচন ভাবলো, আউট অব সাইট, আউট অব মাইণ্ড। মহেন্দ্রকে ওরা তাই মুছে দিল ওদের সর্বাঙ্গীন স্মৃতি থেকে। এদিকে মাধুরী একা তাকে ধরে রাখবে তার মানস মন্দিরে। কিন্তু মহেন্দ্র সম্বন্ধে অন্য সকলের একটা নীরবতা ওর কেমন অসহ্য বোধ হয় অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায় এতখানি অগ্রাহ্য করলো তারা মহেন্দ্রকে এই বেদনা ও সইতে পারে না।

মাঝে মাঝে মাধুরীর মনে হয় চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দেবে মহেন্দ্রকে সে ভুলবে না সে ভুলতে পারে না। মাধুরীর অন্তরে একটা লোক বাসা বেধেছে সে মহেন্দ্র জীবনে তাকে না পায় ক্ষতি হবে না, মৃত্যু অতিক্রম করে চলবে সে মহেন্দ্রর কাছে ওদের নীরবতা মাধুরীর অন্তরকে আরো সরব শক্তিময় করছে সতী করে দিচ্ছে, কিন্তু কিছু করবার নাই, কিছু বলার নাই, নিজের অন্তরকে সম্পূর্ণভাবে সংগুপ্ত করে মাধুরী দমদমার নীরবতা মাধুরীর অন্তরকে আরো সরব শক্তিময় করছে সতী করে দিচ্ছে, আহার নিদ্রা পর্যন্ত হয় না সময়মত অবিশ্রাম অনুধ্যান করে ঐ কাজটার তদারক কতটা করে এতগুলো কাজ।

পরিকল্পনা নেহাত মন্দ করেনি, বাগানটার নাম ব্রজধাম, ঐ নামই রইলো। ওতে তিনটি বিভাগ থাকবে ফলের খেলনা এবং কাঠের শিল্প কাজের আর গরুর দুধের।

গরু এবং ছাগল তো থাকবেই, হাঁস মুরগীও থাকবে ওখানেই। তিনটি নাম মাঝে ফুল অফিস ঘর এবং পাশে গোশালা আর কর্মীদের থাকবার ঘর তৈরি হচ্ছে। বড়দা নিজে কন্ট্রাকটর এবং লোকজন মালমশলা সবই হাতে, কাজেই অতি দ্রুত কাজ হয়ে গেল। এখন উদ্বোধন করা হবে। গাই গরু কেনা হয়েছে ষোলটা, ছাগল বিশটা, শ'খানেক হাঁসমুরগী তাদের জন্য যথাপযুক্ত লোকও রাখা হলো। ফুলের জন্য মালী তো ছিলোই, কাষ্ঠ শিল্পের জন্য আটকালো না, কারণ উমেশবাবু নিজেই বড় ব্যবসায়ী অতএব পূজার কিছু পূর্বেই সব এরকম হয়ে গেল যাতে উদ্বোধন করা চলে।

অতঃপর উদ্বোধনের দিন ঠিক করে মাধুরী ছাপানো চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করলো দমদমার ঐ পাড়ার সমস্ত অদিভাসীকে এবং নিতান্ত জানা—শোনা তার সহপাঠিনী মেনকা, গীতা, বিপাশা ইত্যাদি কয়েকজনকে। কে উদ্বোধন করবেন কিছুই জানল না। একটা কিছু সে করছে, এইটুকু জানিয়ে দিল নির্দিষ্ট দিনে বাগানের সামনে প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেলটা ভর্তি হয়ে বেশির ভাগই ওখানকার দরিদ্র মধ্যবিত্ত আর তাদের গৃহিনীগণ, বালক বালিকা এবং কুলি মজুর। লাউডস্পীকার আছে, কিন্তু ডায়েসে কোন লোক নাই, ফুলের মালাও নাই এমনকি চেয়ারও নাই একখানা। এ কি রকম উদ্বোধন, কেউ বুঝতে পারছে না, কিন্তু যথাসময়ে মাধুরী তার বাবার হাত ধরে এসে উঠলো ডায়াসে। অতি সাধারণ একখানা মিলের শাড়ি পরনে, হাতে গলায় কোন গহনা নাই, উমেশবাবুও দাঁড়ালেন। মাধুরী তার বাবার হাত ধরে এসে উঠলো মাধুরী বক্তৃতা আরম্ভ করলো—

সমবেত ভদ্রমহিলা, মহোদয়গণ এবং বালক বালিকারা।

ব্রজধাম এর দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে আমি কোন লাট—বেলাট রাজা মহারাজাকে ও ডাকিনি কারণ, এটা আপনাদের জন্য করেছি, তাই এখানকার সব ব্যাপারে আমি সাধারণ হতে চাই। এখানে কোন রকম ধনপূর্ব বা আভিজাত্য কোনদিন ঠাঁই পাবে না, এটা হবে সহজ, সরল সত্যের ধাম স্বাস্থ্য আর আনন্দ বিতরণের জন্য এর প্রতিষ্ঠা আশীর্বাদ করুন, এই কাজ যেন সফল হয়।

এখানে আমি একটা বক্তৃতাবাগীশ আর আপনারা সব হলেন শ্রুতি তীর্থ। অতএব শুনুন প্রথমত এখানে কাষ্ঠ শিল্প এবং দেশীয় খেলনা তৈরি হবে। এর নাম দিলাম হিন্দোল বিভাগ, পায়ের খড়ম থেকে রুটি করা চাকী বেলুন এবং নানারকম খেলনা আর কাঠের পুতুল থেকে ছবি বাঁধা ফ্রেম পর্যন্ত পাবেন আপনারা এখানে ন্যায্য মূল্যে। এর উদ্বোধন করবেন আমার বাবা। এবং এই কারখানায় তৈরি প্রথম খড়ম জোড়াটি উনি খরিদ করবেন।

হাততালি পড়লো এবং উমেশ বাবু প্রথম দরজাটি খুলে ভেতরে ঢুকলেন, মাধুরী তাঁর পায়ে খড়ম জোড়া পরিয়ে দিল।

দ্বিতীয় বিভাগে গোশালা। মাধুরী বললো, এতে দুধ হবে এবং আপনরার খাঁটি দুধ কিনে নিতে পারবেন, বারো বছর ছেলেমেয়েদের জন্য জনপ্রতি এক পোয়া পাবেন, দাম চার আনা, রোগীর জন্য ডাক্তার যতটা বলতে পারবেন, ঐ দামেই কিন্তু আমি কয়েকজন গুপ্তচর নিযুক্ত করেছি কেউ কোন রকম আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করলে তবে তার বাড়িতে দুধ দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এর উদ্বোধন করবে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান বাদল বলে রাখাল বেশ পরিহিত বাদলকে হাত ধরে টেনে আনলো মাধুরী। তার হাতে একটা বড় বাঁশের ডাণ্ডা হাসছে খুব। ঠেলে দরজা খুলতেই একপাল গরু ছাগল দেখা গেল—

বাদল তার মাঝখানে গিয়ে একটা ছাগলের পিঠে দুই ডাণ্ডা লাগিয়ে দিল।

বাঃ বাঃ আচ্ছা গোপালোকী বলে উঠলো দর্শক দল। সবাই হাসছে মাধুরীও হেসে ওকে কোলে তুলে আবার আরম্ভ করলো—

এই বিভাগটার নাম গোষ্টি বিভাগ—এর পর ফুলের বিভাগটা দ্বারা খুলবেন আমার বান্ধবী শ্রীমতি মলিনার দেড় বছরের কন্যা কল্যাণীয়া মালতী বলে সে বাড়ির পশ্চিম দিকের সেই বৌটির কোল থেকে সাজানো মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেল তৃতীয় দরজায়।

ছেড়ে দিল মেয়েটাকে। দরজাটা ফুলের মালা দিয়ে আটকানো আছে মালতী অর্থাৎ দেড় বছরের মেয়েটা ওখানে দাঁড়িয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে মালাটায় কামড় লাগালো দর্শকরা হেসে খুন—কিন্তু ভড়কে গিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল। আচ্ছা লোক ঠিক করেছে মাধুরী দ্বার উদ্‌ঘাটন করবার জন্য! কিন্তু সত্যি সবাই খুশি হলো—বক্তৃতা নাই বাগ্মিতা নাই মাধুরী শুধু বললো শুনুন, বক্তৃতা এখানে হলো না হবেও না। এখানে কাজ। সমস্তটার নাম 'বজ্রধাম'—আর তিন ভাগের তিনটি নাম হিন্দোল বিভাগ, গোষ্ঠ বিভাগ আর ফুলদোল বিভাগ। দুধ কিনতে যারা একান্ত অসমর্থ হবেন ছেলে বা রোগীর জন্য এবং প্রসূতির জন্যও তাঁরা আবেদন করলে অনুসন্ধান করে বিনামূল্যে কিছু দুধ দেবার ব্যবস্থা হবে এখান থেকে। বাড়তি দুধে খাঁটি ঘি হবে, আপনারা কিনতে পারবেন কিন্তু তাও রোগী বা প্রসূতি ছাড়া কাউকে বেচা হবে না। আপাততঃ এই আইন রইল দরকার হলে অন্য আইন করা হবে। টাকাকড়ি, চিঠিপত্র এইসব অফিসের ঠিকানায় পাঠাবেন এই সমাজ সেবায় কোন কর্মী ফাঁকি দিচ্ছে বা ঘুষ খাচ্ছে, কিম্বা কোন লোক ঠকিয়ে দুধ নিচ্ছে, ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ একশো টাকা পুরস্কার পাবেন। আর যার দরকার ছাপানো ফর্মে আবেদন করবেন, অনুসন্ধান করে সেই মত টিকিট দেওয়া হবে এবং তদানুযায়ী সকাল আটটার মধ্যে দুধ পাবেন। ফুল ভোর থেকে রাত পর্যন্ত এবং কাঠের শিল্পের বিভাগ বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

অতঃপর মাধুরী সকলকে গোশালা, কারখানা এবং ফুলবাগান দেখালো। তার বান্ধবী মেনকা, গীতা এসেছে, বললো—তোর মহীনদা কৈ রে মাধু? আসেনি?

এটা তাঁরই কাজ কিনা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। না, আসেননি তিনি নিজে কি কাজ করছেন?

আমার বাঁশীটা তিনি বাজাচ্ছেন বলে চলে গেল মাধুরী অন্যত্র। গীতা আর মেনকা হাসলো। ওরা জানে, মাধুরীর মা বাবা দাদা এত নির্বোধ নয় যে ঐ ষাট টাকার কেরানীর হাতে মেয়ে ছেড়ে দেবে। গীতা বললো ওকে হয়তো তাড়িয়ে দিয়েছেন ওরা। মাধুরীকে খুব বশ করেছিল ভাই ছেলেটা।

কি জানি বেশ গাইতে পারে কিন্তু গান শুনলে ওকে সত্যি ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। ওর গান নাকি রেকর্ড হয়েছে রে মেনকা? দাদা বলেছিল, রেকর্ড খুব জনপ্রিয় হয়েছে।

হতে পারে। দোকানে খোঁজ নেব বলে মেনকা গাড়িতে চড়লো।

মাধুরী রয়ে গেল ওখানে, বিস্তর কাজ তার রয়েছে, অফিস গোছানো, খাতা পত্র ঠিক করা, গরু ছাগলের দেখা, ফিরতে রাত হয় ওর। কিন্তু সবাই চলে গেল। উমেশবাবু গেলেন মাধুরী একা একান্ত একা। নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো সেই মা ছেলের মূর্তিটার কাছে দেখতে লাগলো। মূর্তিটা যেন সজীব হাসছে মাধুরীকে দেখে না না, হাসবার তো কিছু হয়নি—যার সঙ্গে মাধুরী সেদিন এসেছিল, সে আজ সাথে নেই, হাসবার তো কথা নয়, কিন্তু ওটা মূর্তি শিল্পীর খুশি মত হাসে কাঁদে সন্তানকে বুকে নিয়ে স্বগর্বে হাসছে, সার্থক নারীত্ব—ও মা! ওর পরে কিছু হবার নেই। ওর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে কেন হাসবে না।

কিন্তু মাধুরী—না, মাধুরী ওখানে দাঁড়াতে পারলো না আর দল ছাড়া একটা বাচ্চা হাঁস এদিকে এসে পড়েছিল তাকেই কোলে তুলে নিল। জলের ধারে দাঁড়ালো গিয়ে। হাস কোলে ওর প্রতিবিম্ব পড়েছে জলে। হাসটাকে ছেড়ে দিল সে চলে যাচ্ছে। মাধুরী তাকিয়ে রইল তার পানে অনেকক্ষণ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ফিরতে হবে নিঃশব্দে উঠলো মাধুরী। পাখিরা সব কুলায় ফিরছে কয়েকটা বক উড়ে চলে গেল। শরতের প্রসন্ন আকাশে সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে খণ্ড খণ্ড। মাধুরী হেটে আসছে বাগানের পথ দিয়ে একা কত ফুল কত সুন্দর পাতা কত প্রজাপতি উড়েছে সীমা সংখ্যা নাই শাড়ির গেরুয়া আঁচল ভর্তি করে ফুল তুলতে পারে তুল'বে নাকি? তুললো কতকগুলো, রাস্তার মোড়ে যেখান থেকে মহেন্দ্র কার্ড দিয়েছিল ওকে, সেখানে এসে থামলো অনেক গুলোফুল আঁচলে আরো তুলবে? কিন্তু কি হবে? মাধুরী অকস্মাৎ আঁচলটা উজাড় করে ফুল গুলো ঐ খানেই ঢেলে দিল।

অফিস ঘরে এসে বসলো মাধুরী, লোকজন কাজ করছে। খানিক তদারক করলো গরু ছাগলকে খাবার দেওয়ালো অতঃপর আর কি করা যায়? অফিস ঘরটা দোতলা উপরে উঠে গেল মাধুরী। এখানে ওর নিজের থাকার মত ব্যবস্থাও করে রেখেছে তবে আজই থাকবে না দরকার মত থাকবে। ঘরটা দেখলো একবার চোখ বুলিয়ে সুন্দর নীড় একটি। বড়দা মাধুরীর যোগ্য করেই তৈরি করিয়েছে। সংলগ্ন স্নানাগার দু'পাশে বারান্দা ফুলের টব আর নীচে থেকে উঠে আশালতা দিয়ে ঘেরা একটি কুঞ্জ ঝিলের জলটা চমৎকার দেখায় দক্ষিণের বারান্দা থেকে। টাকা মানুষকে সম্পদ দান করে কত সৌভাগ্য কিন্তু সুখ শান্তি তৃপ্তি টাকা দিতে পারে সেগুলো? না মাধুরীর সারা মন প্রাণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।

নেমে এসে দেখতে পেল, কোণের দিকে একটি বুদ্ধমূর্তি। এই বাগানেই বড়দা ওকে এনে বসিয়ে দিয়েছে সুন্দর মূর্তি। মাধুরী এগিয়ে এসে দেখলো পদ্মের উপরে পদ্মাসনে আসীন ভগবান বোধিস্বত্ব। মনে পড়লো মানুষের কল্যানের জন্যে পত্নী পরিত্যাগ করে ওর মহা তপস্যা বন্ধুত্ব লাভ কিন্তু রাজবধূ যশোরা। অভাগী গোপা। মাধুরী নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো মূর্তিটার কাছে কথাগুলো ভাবলো অকস্মাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মূর্তিটাকে দু'হাতে জড়িয়ে, মাথাটা লুটিয়ে পড়লো ওর পায়ের উপর। সাদা মার্বেল ছোখের জলে চকচকে হয়ে যাচ্ছে চমকে উঠছে যেন। নিজেকে বিশ্লেষণ করার আর সময় নাই, যে সত্য পৃথিবীর কাউকে জানাতে চায়নি মহেন্দ্র তাকে আর আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, নিষ্ঠুর রাক্ষসী ওকে চর্বণ করেছে এবার গ্রাস করবে। দরিদ্র মহেন্দ্র কি করতে পারে ওর বিরুদ্ধে। ওর সঙ্গে লড়াই করবার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার অর্থ মাধুরী যদি জানতে পারতো ঘূর্ণাক্ষরে তাহলে হয়তো মহেন্দ্রকে সুইজারল্যাণ্ড পাঠাবার ব্যবস্থা করতো কিন্তু মাধুরীর সে দান নেওয়া সম্ভব ছিল না মহেন্দ্রের পক্ষে।

পলায়নের গূঢ়তম কারণ এই মাধুরী। এ খবর জানাবে না, জানাবে না মহেন্দ্র তাকে। নিঃশব্দে মুছে যাবে মহেন্দ্র পৃথিবীর বুক থেকে মাধুরী নিরাপদে কোন যোগ্য ভাগ্যবানের গলায় মালা দিল, তাই দূর দূরতম দেশে চলে এল মহেন্দ্র। কিন্তু এই নির্বান্ধব পুরীতে তো সম্ভব নয়। অন্তরের অব্যক্ত প্রেম বহ্নিবুকে নিয়ে মহেন্দ্র কি আবার কলকাতায় ফিরবে? না সেখানে ফিরে মাধুরীর বিপদ আর ঘটাবে না সে। সেখানে গেলে তার বিষয় মাধুরীর সব কিছু জানবার বিশেষ সম্ভাবনা আর জানতে পারলে মাধুরী চেষ্টার ত্রুটি করবে না, মহেন্দ্রকে বাঁচিয়ে তুলতে, কিন্তু মহেন্দ্র নিজে জানে বাঁচা সম্ভব না। এখানে আসার আগে কলকাতায় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে সে দেখিয়েছেন গোপনে তিনি বলেছিলেন, প্রচুর অর্থ আর প্রচুর বিশ্রাম দরকার এর চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। ওর কোনটাই ছিল না মহেন্দ্রের, এখানে মৃত্যুটা ত্বরান্বিত হলো ভালোই। ওর জন্যে ভাবছে না মহেন্দ্র ভাবছে তার খোকনের জন্য। কিন্তু মহেন্দ্র আজন্ম ঈশ্বর বিশ্বাসী ভাবল এই অনন্ত বিশ্ব যিনি চালান, তিনি খোকনকে দেখবেন।

কিন্তু মহেন্দ্রর নিজের দেখতে ইচ্ছে করছে একবার খোকনকে। কতদূর বাংলাদেশের সেই ক্ষুদ্র পল্লী। কিন্তু যেতে হবে খোকনকে একবার দেখতে হবে তার পর মহেন্দ্র যাবে জীবনের পারে, যেখানে মাধুরীর জন্যে অপেক্ষা করার অন্তরায় নাই, মহেন্দ্র দাদাকে চিঠি লিখে দিল বাড়ি যাবার দিন ঠিক করে।

অফিসের কাজে ইস্তফা দিয়ে মহেন্দ্র সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরল অতি কষ্টে। জ্বর হয়েছে ওখানকার যে ডাক্তারটি ওকে দেখেছিলেন, তিনি বলেছেন বাড়ি চলে যান ওখানে আর কেন? অর্থ আত্মীয় স্বজনের কাছে গিয়ে মরুনগে। মহেন্দ্র হাসলো কথাটা শুনে। সেও জানে সে সত্য। তিনি চলে গেলে মহেন্দ্র নিঃশব্দে শুয়ে ভাবতে লাগলো পৃথিবীতে কেন সে এসেছিল। সর্বত্র সে শুধু পরাজিত হয়েছে, শৈশবে মা বাপের স্নেহ পেল না দাদাবৌদি সে অভাব পূরন করলেন, কিন্তু দাদাও অন্ধ হলেন। অতিশয় মেধাবী ছাত্র হয়েও মহেন্দ্র পড়তে পারল না। একটা চাকরি যোগাড় করে করে

দাদাকে সাহায্য করতে পারেনি সে শত চেষ্টা করেও। অবশেষে চাকরি যখন মিললো, সাফল্য যখন সম্মুখে সাহিত্য, সঙ্গীতে যখন সে নাম কিনছে তখন দূরন্ত ব্যাধি যাকে ঠেকিয়ে রাখা অসাধ্য মহেন্দ্রের পক্ষে। সর্বত্র তাই বিফলতা, আবার যেটা সে কল্পনাও করতে পারে নি, সেই প্রেম এল তার জীবনে, এমন নিবিড় হয়ে এলো যেন শ্রাবণের বর্ষণে কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট। জীবন পাত্র যখন দ্রাক্ষারসে টলমল করছে, তখনই সে স্বর্গ সুধাকে পদদলিত করে আসতে হলো। মহেন্দ্র এ অভিশাপ তার জীবনে। সর্বশেষ অবলম্বন খোকনকেও ছেড়ে যেতে হবে, বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠেছে।

জল খেল মহেন্দ্র এক ঢোক, মনে পড়লো দমদমার বাগান ওঙ্কার ধ্বনি করতে গিয়ে মহেন্দ্র এই ব্যথাটা অনুভব করেছিল, তখন ও জানেনি কিসের এ ব্যথা কিন্তু তার পরিণাম আজ পরিস্ফুট।

ভাবছে মহেন্দ্র মাধুরী কিছুই জানতে পারবে না তার সম্বন্ধে। অকৃজ্ঞতা এবং প্রেমের অবমাননাকারী ভেবে মহেন্দ্রকে মন থেকে মুছে দেবে, তার সুযোগ ও করে দিয়ে এসেছে মহেন্দ্র ডাকবাক্সে বৌদির চিঠিখানা ফেলে রেখে।

আহা বৌদি, সে ভাবছে, মহেন্দ্রের, বিয়ে দিয়ে ঘরে একটা সঙ্গিনী আনবে হায়রে অদৃষ্ট। চিঠিখানা পেয়ে হয়তো চমকে উঠবে ওরা, কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে খোকন। না খোকনের এখানে অত জ্ঞান হয়নি, কিন্তু দাদা বৌদি?

একখানা উপন্যাস বেরিয়েছে মহেন্দ্রের, আরেকখানা দিয়েছে পাবলিশারকে, তৃতীয় খানাও শেষ করে যেতে পারবে হয়তো। রেকর্ডখান কয়েক ওর গানের সকলের মালিক করে দিল ওর খোকনকে এবং সবাইকে জানিয়ে দিল তার ঠিকানা যেন কাউকে জানানো না হয়। অতঃপর সেতারখানা আর বিছানা বালিশ বেধে মহেন্দ্র ট্রেনে চড়ে বসল একদিন।

পূজার বেশি দেরি নাই, মহেন্দ্র ততদিন টিকতেও পারে কিন্তু হাসি পেল ওর। ভেবে কি লাভ। তাকে যেতে হবেই আজ হোক আর দিন কয়েক পরে হোক তবে খোকনের পূজাটা ভালভাবে কাটবে মহেন্দ্র এই ক'দিন থাকলে।

গভীর রাত্রি, রেলগাড়ি ঝমঝম শব্দে দৌড়াচ্ছে, মহেন্দ্র এক কোণায় সেতারের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলো। ঝলঝল করেছে যন্ত্রটা যেন স্বাস্থ্যোজ্জ্বলা অপরূপা মাধুরী বধু বেশী বাসর সঙ্গিনী মাধুরী। আস্তে আস্তে হাত বুলালো মহেন্দ্র ওর গায়ে একবার, তারপর আঙ্গুল চালালো, রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে সে সুর ঝঙ্কার হয়তো মাধুরীর মনে পৌঁছাবে। মুখে অমলিন হাসি ফুটে উঠলো মহেন্দ্রের।

কাকু আসবে তবু মা এতা কাঁদছে কেন? ভেবে পাচ্ছে না ছেলেটা। কী হলো। বাবাই কেন দাঁড়িয়ে ওখানে। কিন্তু বাবার চোখে তো জল নেই? তানপুরা সেতার মৃদঙ্গ বাঁশীর মাঝে বাবা চুপ করে দাঁড়িয়ে। খোকন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে হলো কি? অকস্মাৎ দেখতে পেল বাবা বলছে—

এবার ঘুমাও হে ক্রুদ্ধ শিল্পী এবার এই হতভাগ্য বংশকে মার্জনা কর আমার শেষ সম্বল কেড়ে নিও না, বাবার মাথাটা লুটিয়ে পড়লো মৃতঙ্গের উপর। কিন্তু কিছুই বুঝলো না খোকন। কাকুর ঘর পরিষ্কার করছে মা, কাকু থাকবে। পরিষ্কার তো করাই উচিত। খোকন নিজেও গেল, কিন্তু মা অবিরত কাঁদছে। বললো খোকন—না বৌদি এই সেতারটি ওকে ভোলবার জন্য।

খুব দামী সেতার না?

হ্যাঁ বৌদি, আমার জীবনটার দাম বলে হাসে মহীন নিঃশব্দে। থাক ভাই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো।

আর ক'দিন বাঁচবো। বৌদি হাসে মহেন্দ্র সকরুণ হাসি আবার। অর্পণা নির্বিঘ্নে কেঁদে চলে যায় অন্যত্র।

তৃতীয় উপন্যাসখানাও শেষ করে পাঠিয়ে দিল মহেন্দ্র প্রকাশককে। বিশ্বাসী প্রকাশক ওর নাম করেছে, তাই দ্বিতীয় তৃতীয় খানার জন্য ভালই রয়েলটি পাবে মহেন্দ্র।

খোকনকে কিন্তু কেই ঢুকতে দেয় না এ ঘরটায়। কাকুর অসুখ খোকন কাছে এসে দেখতে

পায় না কাকুই বারণ করে। কেন? কাকু তো অমন ছিলো না। বাইরে বাইরে ঘোরে আর কাঁদে খোকন। নিশ্চুপ বসে থাকে পুকুর পাড়ে নয়তো শিউলী গাছটার তলায়।

পূজা এসে পড়লো। বাংলার আকাশ আনন্দের আর গানে পরিপূর্ণ, শুধু দেবেন্দ্রের ভাঙ্গা বাড়িখানা প্রতীক্ষা করছে মৃত্যুর। দিন দিন অবসন্ন হয়ে আসছে মহেন্দ্র, শেষ হয়ে আসছে আয়ু দীপ। প্রথম উপন্যাস ছাপা হয়ে এসেছে অনেকদিন দ্বিতীয়টাও এল সপ্তমীর দিন নাগাদ, তার সঙ্গে কয়েকটা সমালোচনা আর বেশ কিছু টাকাও। কিন্তু দেবেন্দ্র নোটের বাণ্ডিলটা হাতে নিতে পারলেন না। তৃতীয় উপন্যাসখানাও শীঘ্র বেরিয়ে যাবে। ব্যাস। মহেন্দ্রের সাহিত্য জীবনের ইতি। কে জানে বাংলার পাঠকের অন্তরে কোন গ্রন্থাগারের বইয়ের তাকে কোন পুস্তকের দোকানে সে বেঁচে আছে দেখবার জন্য মহেন্দ্র কিছু মাত্র মাথাব্যথা থাকবে না, তাকে ভুলে গেলেই ভালো। মানুষ আরো উন্নততর সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবে যা মহেন্দ্র করতে পারল না। শেষ বইয়ের নাম দিয়েছে ক্রন্দসী। অসীম আকাশ জুড়ে তার পটভূমি আলো জগতের নায়ক নায়িকা কে জানে, ওটা পড়ে কি ভাববে মাধুরী?

মাধুরী নিশ্চয় পড়বে, কিন্তু উপায় কি? পড়ে কিন্তু কিছুই বুঝবে না, কিছুই জানবে না মহেন্দ্র সম্বন্ধে। মহেন্দ্র এ জীবনে আর তাকে বিড়ম্বিত করতে যাবে না, হয়ত জন্মান্তরেও না। মাধুরী যেখানকার, সেখানেই থাক। আকাশের চাঁদকে মাটিতে নামাবার সাধনা শুধু নির্বুদ্ধিতা নয় অন্যায়। তাতে গোটা পৃথিবীকে চাঁদের আলো থেকে বঞ্চিত করা হয়।

আজ বিজয়া দশমী। কত স্মৃতি বুক জুড়ে জাগছে মহেন্দ্রের। রাত্রিতে গঙ্গার কুলের উপর রাত কাটানো, পার্কে বসে খিচুড়ি খাওয়া, তারপর উমেশবাবুর বাড়িতে মাধুরীর দেখা, না এসব ভেবে লাভ নেই।

চিঠি আছে বাবু, বলে সাগর পিয়ন একখানা খাম দিল তার খাটে ছুড়ে। নীল রং এর খাম কোথাও ফিকে, কোথাও গাঢ় নীল বর্ণ সুন্দর। খুলে ভিতরে ঐ একই রং এর কাগজ বেরুলো সুন্দর হস্তাক্ষর, মাধুরী লিখেছে, প্রিয় কিন্তু শব্দটা লিখেই এমন কেটেছে যে, পড়া যায়। কাগজটা বদলে দিলেই পারতো ইচ্ছে করে বদলায়নি, অতঃপর ওর নীচে লিখেছে।

শ্রীচরণেষু,

আজ বিজয়া দশমী, তুমি এসেছিলে এই পূণ্য দিনে, আজ তোমাকে প্রণাম না জানিয়ে পারলাম না মহীনদা। জানি তুমি যেখানে থাক, তোমাকে খোকনের স্নেহে তোমাকে টেনে আনবে অন্ততঃ এই দিন তোমার বাড়িতে, তাই বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিলাম আশা করি যথাসময়ে পাবে।

অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে তোমার চলে যাওয়ার পিছনে যাই থাক আমি অনুসন্ধান করবো পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের বন্ধন রজ্জুটা চোখে দেখা না গেলেও ওদের প্রেমের সত্যটা মলিন হয় না মহীনদা। সূর্যের কত তাপ আছে আর সূর্য কত দূরে আছে, পৃথিবী নাইবা জানলো ওর আলোতে উত্তাপে তো পৃথিবী ফলে ফুলে জীবনে পরিপূর্ণ হচ্ছে, এই কি যথেষ্ট নয়?

দাদা বৌদিকে বিজয়ার সহস্র প্রণাম জানাই। ইতি তোমার মাধু—

লিখেই তোমার মাধু কথাটা কেটে নীচে লিখেছে প্রণেতা মাধু অথচ অনায়াসে কাগজখানা বদলে এই কটা লাইন আমার জন্য কাগজে লিখে পাঠাতে পারতো। কেন সেটা করেনি, জানে মহেন্দ্র। ছেলেমানুষী। না তার অন্তর।

স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যা কিছু লিখেছে, তাকে নষ্ট করেনি মাধুরী শুধু ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু কোনো ঠিকানা নাই চিঠিতে। ঠিকানা অবশ্য জানে মহেন্দ্র কিন্তু জেনে কি হবে। এ চিঠির জবাব দেওয়া হবে না।

নীরবে চিঠিখানা বুকের উপর রাখলো মহেন্দ্র রেখে চোখ বুজলো। জল আসছে চোখে ওর কিন্তু সামলাচ্ছে। অকস্মাৎ অর্পণা এসে ঢুকলো। ভাবলো হয়তো ঘুমাচ্ছে মহীন।

নীরবে অর্পণা বুক থেকে চিঠিখানা তুলে নিল। আধা মিনিটে পড়ে ফেললো কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। কে মাধুরী চেয়ে দেখলে মহেন্দ্র ঘুমায়নি, জেগে রয়েছে। বলল কে মেয়েটি?

ওর কথা আজ থাক বৌদি সেতার দাও একবার।

চিঠির জবাব?

না দিতে হবে না, চিঠিখানা ঐ কুলুঙ্গীতে রেখে দাও বৌদি মহেন্দ্র উদগত অশ্রুতে ভেঙ্গে পড়ছে বারবার, অর্পনা সবই বুঝল বলল—

সে অভাগী তোমার অসুখের কথা জানে না মহীন।

না না জানানো চলবে না বৌদি, তাকে কিছুতেই জানাতে হবে না।

কুমারী মেয়ে সে ভুলে যাক মহীনকে। চিঠিখানা ঐখানে রেখে দাও। যেন আমি শুয়ে শুয়ে দেখতে পাই বৌদি।

মহীন। উচ্ছসিত হয়ে কেঁদে উঠলো অর্পণা। দুর্ভাগী অর্পণা সন্তান স্নেহে মানুষ করেছে মহীনকে, খোকনের চেয়ে মহীন তার কাছে এতটুকু কম নয়, কিন্তু মানুষের কিছুই করবার নাই। নিজেকে সামলে যত্ন করে রেখে দিল চিঠিখানা খামের ভিতর ঐ কুলঙ্গীতে মহীনের শয্যার বা দিকে।

মহেন্দ্র অতিকষ্ঠে আঙ্গুল বুলিয়ে চলেছে সেতারে সন্ধ্যা আসন্ন।

বিসর্জনের বাদ্য কোলাহল, প্রতিমার গ্রাম পরিক্রমণ এবং বিসর্জন শেষ হলো। মহেন্দ্র তখনো বাজাচ্ছে সেতার। কি মধুর ঝঙ্কার, কি করুণ সে রাগিনী। বিশ্বমার বিরহে যেন ধরিত্রী গুমরে উঠছে। অকস্মাৎ খোকনকে নিয়ে অর্পণা এল। খোকন প্রণাম করবে কাকুকে।

ওকে কেন আনলে বৌদি এখানে?

তা হোক। বড্ড কাঁদছিলঃ তোমার অত ভাবতে হবে না, নে প্রণাম কর।

খোকন প্রণাম করে নির্ণিমেষ চেয়ে রইল কাকুর পানে যেন চেনাই যায় না। কিন্তু কাকু বললো আস্তে—

বেঁচে থাক, এই বংশের গৌরব হয়ে বেঁচে থাক মানিক—

কিন্তু খোকনকে ওর বুকে নিতে পারল না, জড়িয়ে ধরলো না, এ যে কত বড় দুঃখ তা জানে ওর অন্তর্যামী। অসহ্য বেদনায় মহেন্দ্র উঃ বলে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়।

খোকন আস্তে ডাক দিল কাকু।

মহেন্দ্র শুধু চাইল, কথা বলতে পারল না।

ক্লান্তিতে সর্বাঙ্গ অবসন্ন ওর। অর্পণা খোকনকে সরিয়ে দেখলো মহীন নির্জীব ক্ষীণ হয়ে আসছে। ও ঘরে দেবেন্দ্রকে জানালো গিয়ে, দেবেন্দ্র উঠে এসে দেখলেন নাড়ি— তারপর নিঃশব্দে ও ঘরে ফিরে গেলেন মহীনের কোল থেকে সেতারখানা নিয়ে। শোন মহীন—ও ঘর থেকেই বললেন এবং আরম্ভ করলেন বাজাতে। ওঃ। মানুষ যে এমন পাথর গলান সুর জাগাতে পারে, জানতো না কেউ। বিজয়ার প্রনাম করতে আসছে গ্রামবাসিগণ সবাই স্তব্ধ দাঁড়িয়ে গেছে। ভেতরের ঘরে মৃত্যু পথযাত্রী মহীন—কাছে একা অর্পণা আর বাইরের ঘরে দেবেন্দ্র সেতার বাজাচ্ছেন চোখে জল ভেসে আসছে। মধ্যরাত্রির মহা নীরবতা বিদীর্ণ করে বেজে চলেছে সুরলহরী তরংগে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন এক অশরীরী আত্মাকে কোন দ্যুলোকের পথে কে জানে।

মহীন? অর্পণা আর্ত কণ্ঠে ডেকেই চুপ হয়ে গেল। আর ঐ আর্তকণ্ঠের আঘাতেই যেন সুর সাধক দেবেন্দ্রের হাতের সেতারটার একটা তার ছিঁড়ে যন্ত্রটা ও আর্তনাধ করে উঠলো। মহীন নাই। ও ঘর অর্পণা মূর্ছিতা হয়ে পড়েছে আর এ ঘরে দেবেন্দ্র নিঃশব্দে বসে রইলেন ছেঁড়া সেতারটা হাতে নিয়ে। তখন সুরের পরীরা যেন নৃত্য করে বেড়াচ্ছে ঘরের আনাচে কানাচে ক্রন্দন ধ্বনি তুলে কেউ এই সমাধি মন্দিরকে বিচলিত করতে সাহস করলো না। খোকনকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি—সে বাইরে দাঁড়িয়ে তুলসী তলার প্রদীপটার বুক জ্বলছে—অমঙ্গল হয়। জলভরা চোখে দেখেছে খোকন অকস্মাৎ দমকা হাওয়ায় প্রদীপটা নিবে গেল—অন্ধকারে খোকন একা।

নানা কাজে ব্যস্ত মাধুরী সমস্ত দিন। আজ বিজয়া দশমী। কাজের মধ্যে যতবার মনে হচ্ছে মহীন এতক্ষণ চিঠিখানা পেয়েছে, ততবারই ওর মুখখান হাসি মাখা হয়ে উঠেছে। চিঠিতে যদিও কিছু নাই, তবু কত যে আছে ওর অন্তরের সৌরভ।

সকাল থেকে আজ বিনামুল্যে ফুল আর দুধ বিতরণ করছে ও পাড়ায় ছেলেমেয়েদের—আর একটু করে মিঠাই। গরু। ছাগলগুলোকে নিজের হাতে কাঁচা ঘাস খাইয়েছে কর্মচারীদের বকশিস দিয়েছে। ওপাড়ার পূজা মণ্ডপে পাঠিয়েছে ওর প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত ননী ক্ষীর। রাত দশটা পর্যন্ত সব শেষ। বিসর্জন দেখতে দেখতে শ্যামবাজারে বাড়িতে ফিরছে মাধুরী।

সারা মনখানি জুড়ে কেমন একটা বিশেষ আনন্দানুভূতি আজ যেন জেগে আছে, আঁচলে আছে একরাশ ফুল ওর বাগানের ফুল। নিজের হাতে একটা মালা গাঁথতে গেটে ঢুকার সময় একটু লাফিয়ে উঠতেই। আংগুলে সূচ ফুটে গের, উঃ। অব্যক্ত শব্দ করে উঠলো মাধুরী বাড়িতে ঢুকলো। গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে যাচ্ছে আঁচলের 'সাক্ষী' ফুলগুলি তুলে নিয়ে সটান ওপরে চলে গেল। ওখানেই খেয়েছে তাই বড় বৌদিকে ডাক দিয়ে জানিয়ে দিল যে খাবে না।

নিজের ঘরে এসে মাধুরী দরজা বন্ধ করলো দেরাজ টেনে মহীনের ফটোখানা বের করলো অত্যন্ত গোপনে এ ফটো সে রাখে, তাই বাঁধানো হয়নি টিপয়ে সেটা সাজিয়ে নিজের গলার মালা তাকে পরাতে গিয়ে মাধুরী দেখতে পেল—সুচ ফোঁটা আংগুলে কখন একবিন্দু রক্ত এসেছিল, তাই লেগে গেছে ফটোর বুকেঃ সাদা পাঞ্জাবী পরা বুকখানা দাগি হয়ে গেছে।

কেন এমন হচ্ছে? বার বার কেন হচ্ছে এরকম? মাধুরী নিমিষে চোখে রক্তের দাগটা দেখতে দেখতে ভাবলো—আঁচল দিয়ে মুছবার চেষ্ট করলো। সে আধুনিক সমাজের শহুরে মেয়ে কোন কুসংস্কার ওকে আচ্ছন্না করে না, তবু যেন কি এক অমঙ্গল আশংকায় মলিন হয়ে উঠলো মাধুরী কিন্তু তখনি দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে ফটোটাকে লক্ষ্য করে আপন মনে।

না না এসব কিছু না হয়তো তোমার পল্লীবধু নিয়ে রাত জাগছো বাড়িতে তাই আমার মালা নিতে চাইছ না, কিন্তু আমি তো ব্যাঘাত করিনি, বাধা দিইনি আমার গোপন পূজা গোপনেই থাকবে। মালাটা পরিয়ে দিল মাধুরী ধুপ জ্বেলে দিল তারপর প্রণাম করলো গলায় আঁচল দিয়ে।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছে ঘড়িটা দেখলো একবার, কিন্তু এখনো কিছু কাজ বাকি। গ্রামোফোনটা খুললো মাধুরী, দম দিল তারপর একখানা নতুন বোর্ড ভাল করে মুছে চোখ বুজে বললো মনে মনে, তোমার গাওয়া গান শুনতে শুনতে আজ ঘুমোব—বড্ড ঘুম পেয়েছে।

রের্কড খানায় পিন লাগিয়েই মাধুরী শুয়ে পড়লো পালঙ্কে। সুর ছড়িয়ে পড়ছে—
গড়িয়ে পড়ছে যেন, আকাশচুম্বী পাহাড় থেকে অলকানন্দ ঝরছে মিষ্টি হাসি ফুটলো
ওর মুখে নীল আলোটা জ্বেলে দিয়েছে। রেকর্ড বাজছে। অকস্মাৎ কড় কড় আওয়াজ।
হলো কি? মাধুরী ত্বরিত উঠে আলো জেলে দেখলো থেমে গেছে মেশিনটা। এ রকম
তো হয় না? রেক্র্ড খানা হাতে তুলতেই দু'খানা হয়ে গেল। মাধুরীর দুচোখ দিয়ে
জল ঝরে পড়লো—না কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না আর। বার বার এমন
অমঙ্গল কেন? অন্তর জুড়ে এই প্রশ্ন জাগলো।

সারা রাত কিভাবে কাটলো, জানে না মাধুরী, ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল
মার্বেলের মেঝেতে, ঘুম ভাঙল মেজদির আহবানে। তাড়াতাড়ি উঠে আলোটা
নেভালো, ফটোখানা লুকিয়ে ফেললো এবং ভাঙা রের্কডটা আলমারীর তলায় ভরে
দিল তারপর দরজা খুলে বললো কি বৌদি?

আজ আমাদের স্টীমার পার্টি আর তুই এখানে ঘুমুচ্ছিস। যাবি বলেছিলি যে?

না বৌদি, আমার যাওয়া হবে না। অনেক কাজ পড়ে আছে বজ্রধামে এখুনি
বেরুতে হবে। কাল রাত্রে ফিরতে অনেক দেরী হয়েছিল আমার।

কুমার বরুণবাবু তাছাড়া আরো অনেকে যাচ্ছেন। ওস্তাদ হিমায়েত খাঁও আসবেন। তুই না গেলে সব ফাকা লাগবে ছোটনি চল।

না বৌদি মাফ চাচ্ছি। মাধুরী স্নান করার জন্য চলে যাচ্ছে।

সোসাইটি তুই ছেড়ে দিলি মাধু? মেজবৌদি করুণ স্বরে বললো আবার।

হ্যাঁ, ও সোসাইটি ছেড়েছি, অতকম জলে আমার মত মাছ খেলতে পারে না, বাংলার যে বিরাট বিস্তার সমাজ, সেখানে আমার ঠাঁই করে নিতে চাই। তাদের দুঃখ দৈন্য আনন্দ বিলাসের অগাধ জলে সাঁতরে বেড়াবো বৌদি, তোমার ইঙ্গ বঙ্গ সোসাইটিতে আমার পোষাবে না হাসলো মাধুরী।

ওঁরা সবাই আশা করে আছেন।

ওদের জানিও, গঙ্গাকে ঐরাবত আটকাতে পারে না, হোক না সে ইন্দ্রের বাহন, গঙ্গা সাগরে পড়বেই সাত কোটি সন্তানকে উদ্ধার করতে হবে তার। চলে গেল মাধুরী বাথরুমে। মেজবৌ তবু আধ মিনিট থেকে দেখলো ওর ঘরখানা খোলা গ্রামোফোনটা গলায় ছেড়া মালা, পুড়ে যাওয়া ধুপ কিন্তু কৈ?

কোথাও মহেন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন নেই তো? না মহেন্দ্র এখানে কি জন্য আসবে। মাধুরীর মনের মত কেউ এখানে আসেনি তাই মেয়েটা এরকম করছে কিন্তু সমাজে যদি না বেরোয় তো মনের মত বর জুটবে কি করে। মেজদা বলছে মাধুরীকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু যা মেয়ে। ও কি যাবে। স্নান সেরে বেরুক, আরেকবার বলবে মেজবৌ ভেবে চলে গেল।

মাধুরী বেরুলো বাথরুম থেকে। মনটা খুব হাল্কা হয়ে গেছে। গত রাত্রের ব্যাপারগুলো কিছু নয় ও নিয়ে মন খারাপ করবার কিছুই নাই মা পূজার ঘরে গিয়ে প্রণাম করলো ঠাকুরকে তারপর চা খেল বাবার সঙ্গে উমেশবাবু প্রশ্ন করলেন—। তুই যাবিনে ওদের পার্টিতে?

না বাবা ওতে আমি আনন্দ পাইনে।

কেন মা? সবাই খাবি দাবি, গান গল্প করবি, বেশ তো ব্যাপার।

ওতে মন শুধু ভোগের দিকে থাকে বাবা, ভাবের দিকে যায় না, এগুলো এতো বর্হিমুখো যে নিজেকে খুঁজতে আবার নির্জনে গিয়ে বাসা নিতে হয়।

উমেশবাবু জানেন তাঁর এই মেয়েটির অসাধারণত্ব, চিন্তায় এবং কাজে সে চিরদিনই স্বতন্ত্র এবং এই জন্য তার ভয়, আর পাঁচটা মেয়ের মত নয় মাধুরী হলে ভাল হতো, কিন্তু হয়নি এখন যখন উপায় কি? তবু হেসে বললেন তোরা ছেলেমানুষ এখন তো বাইরে খেলাধুলা নিয়েই থাকা উচিত—।

খেলাধুলাকে উল্টে দাও, ধুলাখেলা হয়ে যাবে, ওগুলো সব খেলাধুলা গায়ে দাগ লাগে, মনকে বিরক্ত করে হাসলো মাধুরী, বললো মানুষ ততক্ষণ ছেলে মানুষ থাকে বাবা যতক্ষণ সে জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না, দু'পাঁচ বছরের জীবনের উদ্দেশ্যো বুঝেছিলেন, ঈশ্বর লাভ তিনি তখনি করেছিলেন আর ছেলেমানুষ ছিলেন বুঝলেন বাবা?

হ্যাঁ মা, করুণ হাসলেন উমেশবাবু।

তুমি আমার সব থেকে ভাল ছাত্র বাবা—বলে উঠে চলে গেল।

এরপর গাড়িতে চড়ে বেরুলো মাধুরী বাজারে যাবে রেকর্ড ভেঙ্গে গেছে সেটা কিনতে হবে ওকে। দু'পাশে সারি সারি দোকান সাজানো, পূজার বাজারের ভিড় তখনো রয়েছে, দেখছে মাধুরী গাড়িতে বসে, বড় বড় পোষ্টার মারা রয়েছে দেয়ালে।

মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস, 'মরণ যমুনা' বের হলো।

একখানা বইয়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মাধুরী দোকানীকে বললো—

'মরণ যমুনা' আছে? দিন একখানা।

দোকানদার দিল বই খানা ওর হাতে এনে। চমৎকার বাঁধানো বই, খুলেই দেখতে পেল উৎসর্গ পত্রটা শ্রীমতি মাধুরী করকমলেষু—

বুকে ঠেকালো বইখানা মাধুরী, প্রশ্ন করলো দোকানদারকে আবার—বইটা কেমন হয়েছে? কি রকম বিক্রি হচ্ছে—

অসাধারণ বই রেকর্ড সেল যাচ্ছে।

খান পাঁচেক দিন আমার, মাধুরী বললো।

আপনার কি কেউ হন উনি? দোকানদার অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো বইগুলো হাতেই।

না, হ্যাঁ, আমার —মাধুরীর মুখে হাসি, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

পাঁচ টাকা বইয়ের। টাকা পাঁচটা দিয়েই মাধুরী চলে গেল ক্যাশ মেমো নেবার জন্যে অপেক্ষা করলো না।

বইগুলো অতি যত্নে বাধলো একটা তোয়ালে দিয়ে। পড়বে, পড়ে দেখবে তার 'মরণ যমুনা' কোথায় কেমন সে। মাধুরীই কি 'মরণ যমুনা' নাকি। দূর। মাধুরী ছেড়ে যাওয়ার জন্যেই ঐ নাম দিয়েছে মাধুরী যেন বুঝতে না পারে। অম্লান হাসি ওর মুখে, অমলিন ওর হৃদয়, ভাবলো বিয়ে না হলে কি বাঁচে না মানুষ? খুব বাঁচে, আরো ভালভাবে বাঁচে। এই যে স্মৃতি অমৃত, এই যে আলো স্পর্শ এ কি তুচ্ছ, মুল্যহীন।

গ্রামোফোনের দোকানে এলো মাধুরী, নামলো গাড়ি থেকে। চেনা দোকানী আসুন আসুন বলে অভ্যর্থনা করলো। মাধুরী গিয়ে বসতে বসতে বললো—

মহীনদার, মহীন মুখুজ্যের কি রেকর্ড বেরিয়েছে দিন।

অসম্ভব সেল ওর খান তিনেক মাত্র আছে আর বলে দোকানী রেকর্ড বের করে বললো, বাজিয়ে দিই?

হ্যাঁ বাজান, দেখে নিই ঠিক আছে কিনা।

দোকানদার রেকর্ড চালিয়ে দিল গ্রামোফোনে শুনছে। মাধুরী শুনছে তন্ময় হয়ে। কোথায় আছে মাধুরী? মাটিতে না আকাশে ও জানে না কলকাতা শহরের দোকান, অজস্র লোক, অসংখ্যা শ্রোতা এবং খরিদ্দার, সবাই দেখছে—নির্বাক নিস্পন্দ মাধুরী বসে আছে ঠিক পাথরের মূর্তির মত। দুই চোখের কোল বেয়ে দু'টি ধারা নেমে এসেছে, একি সুখ। একি বেদনার অমৃত মন্থন।

অকস্মাৎ সিন্ধুলব্ধ মাধুরী রেকর্ড কয়খানা বাক্সে ভরে সটান দমদমার বাগানে চলে গেল বুকটা তখন ফুলে উঠেছে কি এক আনন্দ বেদনায়।

সারা বাড়ীটা কেমন যেন নিঝুম হয়ে গেছে, কারো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, মনেই হয় না যে ওখানে মানুষ আছে, যেন বহু প্রাচীন একটা সামাধিস্তুপ।

সকালে খোকন হাত মুখ ধুয়ে বাগানে ফুল তুলে আঁচল ভর্তি করে, তারপর নিঃশব্দে এসে জানালা গলিয়ে ছড়িয়ে দেয় মহেন্দ্রের বিছানার উপর। বিছানায় মহেন্দ্রের ফটো আর সেই সেতারখানা, সাজানো আছে। কুঠুরীর দরজায় একটা প্রকান্ড তালা, খোকন ঢুকতে পারে না। বন্ধ দরজার সম্মুখে হেঁট হয়ে প্রণাম করে, চোখে জল আসে ওর মুছে নিঃশব্দে পড়তে বসে গিয়ে।

তারপর সমস্ত দিন নিঝুম বাড়ীখানা, বাইরে দেবেন্দ্র তার চৌকিতে শুয়ে বসে ভেতরে অর্পণা নীরবে গৃহকাজে রত, স্কুল থেকে ফিরে খোকন নীরবেই কিছু জল যোগ করে তারপর বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যায় আসে সঙ্গীত সাধকের দল ঐ সময়টা একটু যা লোকসমাগম বোঝা যায়, কিন্তু এতো সাবধান যেন এখনি ঘুম ভেঙে যাবে এমনি ভয়ে ভয়ে। টোলের ছাত্রগুলি আছে কিন্তু তারা জানতেই চায় না যে, তারা আছে এমনি নিঃশব্দে তারা পাঠ অভ্যাস করে। শ্মশানের স্তব্ধতা যেন জেগে আছে বাড়িখানায় অহরহ।

কিন্তু তথাপি দিন চলে যাচ্ছে, মাস গেল, বৎসর পূর্ণ হতে চলল। আবার সেই বিজয়া দশমী। এর মধ্যে মহেন্দ্রর প্রথম উপন্যাস মরণ যমুনার প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে, অন্য বই দুটিও ভালো বিক্রি হয়েছে। বেশ কিছু টাকা দিয়ে আবার ছাপার স্বত্বঃ কিনে নিয়ে গেছেন পাবলিশার্স। দেবেন্দ্র কথাও কইলেন না। শুধু সই করে দিলেন খোকনের অভিভাবক হিসাবে। টাকাও ছুলেন না তিনি।

মরণের পরেও তার খোকনের জন্য রোজগার করেছে, অর্পণা কেঁদে ভাসালো টাকাটাকে।

অন্ধ তাই দেখি না, কানটাও গেলে ভাল হতো অর্পণা, এসব শুনতে পেতাম না।

নিঃশব্দে অর্পণা টাকাগুলো নিয়ে ভেতরে গেল। দেবেন্দ্র সহ্য করতে পারেন না এই অর্থাগম। মহীন নেই, তার টাকা আসে মহীনের অর্জিত এ যে ওঁর বুকে কতবড় বজ্র জানেন তিনিই। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ থেকে বললেন বুকখানা তো ফেটে যাচ্ছে না।

শুনতে পায় অর্পণা গড় গড় করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। অভাগী নারী অশ্রু সম্বল করে বেঁচে আছে শুধু খোকনের মুখ চেয়ে। সন্ধ্যায় ধুপ ধাপ জ্বেলে দিতে আসে মহেন্দ্রের ঘরখানায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে বিছানার কাছে তারপর তালা দিয়ে চলে যায়।

আজ আবার বিজয়া দশমী, ঘরখানা ভালো করে পরিষ্কার করলো অর্পণা। বিছানাটা ঝেড়ে পাতলো ফটোটি সযত্নে মুছে রাখলো, সেতারটি ঝেড়ে মুছে আবার রেখে দিচ্ছে। সাগর পিওন এসে বললো, চিঠি বৌদি ঠাকুরণ।

দাও, অর্পণা হাতে করে নিল। সাগর, নীল রংগের খাম আর সেই রং এর কাগজ উজ্জ্বল লাল কালিতে লেখা ঠিকানা, যেন বুকের রক্ত দিয়ে লিখেছে নামটা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অতি সাবধানে পড়লো যেন খামটা নষ্ট না হয় এমনি ভাবে চিঠিটা খুলল অর্পণা।

পড়লো—

শ্রীচরণেষু

আজ আবার বিজয়া দশমী মহীনদা, সারা বছরের প্রণাম গ্রহণ কর। যত দূরেই থাক, তোমার সঙ্গ আমি সর্বক্ষণ পাই, সঙ্গীতে সঙ্গীতে আর তোমার দেওয়া কাজে। সে কাজ এত সুন্দর মহান, তা জানতাম না।

জীবন শুধু সুন্দর নয় মহীনদা, সে জীবন মহীময়, কিন্তু সে জীবন হবে তপঃ ক্লিষ্ট ঋষির জীবন, কর্মময় ত্যাগের জীবন। তোমার প্রেমের বলে আমি জৈব জীবনের গন্ডী পার হয়ে যেতে পারবো মহীনদা, ভয় নাই।

দাদা বৌদিকে আমার অনন্ত প্রণাম আর খোকনকে অন্তরের শুভাশীষ জানালাম। তোমাকে কি জানাবো ভেবে পাচ্ছি না, সবই জানালাম, প্রণাম নমস্কার প্রীতি, ভালবাসা। ইতি—মধু।

আহা! কে এই অভাগী। আপন মনে বলে উঠলো অর্পণা। চিঠিতে কোথাও ঠিকানা নাই। নীচের দিকে পুনশ্চ দিয়ে লেখা হয়েছে—

রেকর্ড আর রেডিওতে আমার অরুচি ছিল, ওতে তোমার গান বাজে, তাই ও দুটো আজ আমার খুব প্রিয়, কিন্তু আমার সেতার তোমার হাতে কেমন বাজে শুনতে বড় ইচ্ছে হয়, এ স্বপ্ন কবে সফল হবে মহীনদা?

অর্পণার চোখ ছাপিয়ে জল আসছে। পিছনে খোকন নিজের হাতে মালা গেঁথে এসে দাঁড়িয়েছে কাকুর ফটোতে পরাবে। প্রশ্ন করলো—

কার চিঠি মা, কি লিখেছে?

আরো বড় হয়ে দেখিস মানিক, অর্পণা খামে ভরে চিঠিখানা সযত্নে তুলে রাখলো সেই কুলুঙ্গীতে, খোকন ফটোতে মালা দিলো প্রণাম করলো।

মহীনের ঘর খুলে ওর মাথার কাছে বসিয়ে দাও অর্পণা। আর সেতারখানা দাও ওকে শোনাতে হবে আজ।

জল তো পড়ছে না দৃষ্টিহীন চোখ। হাসছেন দেবেন্দ্র, অর্পণা একটু ভয় পেল কিন্তু স্বামীকে সে চেনে, বললো,

আজ একখানা চিঠি এসেছে। আবার সেই নীল খাম, লাল কালির ঠিকানা। কে লিখেছে? দেবেন্দ্র প্রশ্ন করলেন।

সেই মাধুরী, ওর ডাক নাম হয়তো মাধু। ওরই হয়তো ঐ সেতারখানা ওটাই বাজাও।

অর্পণা স্বামীকে ধরে এনে বসিয়ে দিল মহেন্দ্রর বিছানায়। হাত তুলে দিল মাধুরীর সেতারখানা। দেবেন্দ্র আধ মিনিট স্তব্ধ থেকে বললেন। সঞ্চিত পাষাণে তাঁর পূজার

ইতিহাস, আর বিশুষ্ক ফুল বিশ্বদলে তাঁর মাধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষন্তি সিন্ধর নবুবৎ
পার্থিব রাজঃমধু ওঁ মধুওঁ—

প্রতি বিজয়া দশমীর ডাকে আসে ঐ চিঠি, নীল খাম লালকালিতে লেখা নাম। অর্পণা নিঃশব্দে খুঁলে পড়ে, চোখের জলে ভাসে, তারপর রেখে দেয় আলমারীতে। সন্ধ্যায় দেবেন্দ্র বাজান মাধুরীর সেতারখানা। এমনি চলেছে, আট বছরের খোকন ষোল বছরে পড়েছে, ম্যাট্রিক দিচ্ছে এবার, কিন্তু অর্থাভাবে আর পড়া হবে না বোধ হয়। মহেন্দ্রের বই—এর রয়েলটির টাকা বেশি আর নাই, কতদিনই বা আসবে আর! কিন্তু অর্পণার দাদা কলকাতায় ভালো চাকুরি, করেন, তিনি কতদিনই এসে বললেন ছেলেটাকে তিনি কলকাতায় নিয়ে পড়াবে?

কলকাতায় ছেলে পাঠাতে আমার ইচ্ছে নেই দাদা। কলকাতায় পাঠিয়ে আমি মহীনকে হারিয়েছি, অর্পণা চোখের জল ফেলে বললো।

কলকাতায় না গেলে চলে না অর্পণা দাদা বললো, ওখানে যেতে হয়। যার যার নিয়তি, কলকাতা কি দোষ করলো? ছেলেটাকে দে আমার, মানুষ করি।

সব শুনে দেবেন্দ্র চুপ করে থাকলেন অনেকক্ষণ। খোকনের মামার কথায় বললেন—

যাও যেখানে খুশি নিয়ে ওকে মানুষ করতে, আমি যাকে মানুষ করেছিলুম, সে আমার ঘুমিয়ে গেছে, তাকে জাগিয়ে দিও না, নিঃশব্দে নিয়ে যাও, সে যেন জানতে না পারে, এই বংশ আর কারো সাহায্য নিচ্ছে। উঠে চলে গেল অন্যত্র।

অতঃপর মামার সঙ্গে খোকন এল কলকাতায়। মামার নাম অসিত বাবু ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকেন মধ্য কলকাতা, চাকুরী করেন গভর্ণমেন্ট অফিসে। রোজগার ভালই, তার নিজের ছেলেমেয়ে দু'তিনটি। খোকন তাদের সঙ্গেই পড়াশুনা করছে। কলেজেও যাচ্ছে। কিন্তু গরীবের ছেলের পড়ার যে কত অসুবিধা, তা ভুক্তভোগীই জানে, সব বই কেনা হয়নি, মাইনেও সব মাসে যথাকালে দেওয়া হয় না, তাছাড়া কলেজের কত রকম আগডুম বাগডুম, চাঁদা তো লেগেই আছে। তবু খোকন পড়া চালিয়ে যাচ্ছে তাকে মানুষ হতে হবে। গানবাজনাও ভাল শিখেছে। দু'একটা আসরে গায় এমন করে নিজের একটু ঠাঁই করে নিল সঙ্গীত মহলে। কিছু রোজগারও হচ্ছে।

পূজার বন্ধে বাড়ী এল খোকন। সেই বিজয়া দশমী, সেই নীল খাম অর্পণা খুলে পড়ে রেখে দিচ্ছে। খোকন বললো—

এবার বড় হয়েছি মা দাও চিঠিগুলো পড়ে দেখি।

না খোকন, ও কি দেখবি।

দেখতেই হবে, দেখার জন্যে কাকু আমার রেখে গেছে ঝর ঝর জল ওর চোখে। ন'খানা চিঠি সবশুদ্ধ, সবগুলোই সালের পর সাল ঠিক করে সাজিয়ে পড়লো, কোনটায় ঠিকানা নাই। অতি ভদ্রভাষায় অতি সংক্ষিপ্ত চিঠি। কিন্তু প্রতি অক্ষরে অন্তর নিংড়ে লেখিকা নিজেকে সমর্পণ করেছে কাকুর কাছে। কল্পনা প্রবণ কবি খোকন বেশ
বুঝতে পারল, এই মাধুরী কাকুর প্রিয়তমা। সযত্নে চিঠিগুলি আবার সাজিয়ে রেখে
দিল ঠিক করলো যেই হোন মাধুরী তাকে খুঁজে খোকন বের করবে। শেষের
চিঠিখানায় সামান্য ইঙ্গিত রয়েছে—
ব্রজধামে আভীর, নারী গোপ—বালক এবং ধেনুদলের অভাব নেই, নেই শুধু
রাখালরাজ কৃষ্ণ। কিন্তু বৃন্দাবনে নিত্য প্রেম তাকে আবার আনবেই ফিরিয়ে।
কলকাতায় ফিরলো খোকন। কাকুর প্রিয়তমার খোঁজ করতেই হবে, দেখা করতে
হবে তাঁর সঙ্গে। অবসর সময় পরে কাজ হলো ওর প্রতি বাড়ির নাম খুজে ফেরা।
বড় বড় রাস্তা থেকে গলি পর্যন্ত নেম প্লেট দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়ে, না ব্রজধাম নয়।
তবু নিরাশ হয় না খোকন। সংকল্প, খুঁজে বার করতেই হবে ব্রজধাম তার কাকুর
প্রিয়তমার নিবাস।
বিজয়া দশমী আসছে। প্রতি বছর এই দিনে উৎসব হয় ব্রজধামে। এ দিনেই
মাধুরীর জীবনের এক পরম দিন। এ দিনই মহীন এসেছিল তাদের বাড়ীতে আজ

মহীনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে পেরেছে মাধুরী। গরীব দুঃখী কাঙ্গালদের মুখে হাসি ফোটানের কাজে অনেকটা সফল হয়েছে সে। বিরাট আয়োজন চলছে এদিনের জন্য। ব্যবস্থা করা হয়েছে গরীব ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় বিতরণের, রোগী ও শিশুদের দুগ্ধ দেওয়ার।

খোকনদের কলেজ বন্ধ হয়েছে। পূজা উপলক্ষে তার মামাও ছুটি পেয়েছেন, সবাই বাড়িতে গেলেন। খোকনকেও নিতে চেয়েছিলেন সঙ্গে কিন্তু গেল না খোকন। কারণ এই সময়টাতে খোঁজ করা যাবে ব্রজধাম।

মামা বিদায়ের পর বেরিয়ে পড়ল খোকন। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল দক্ষিণ কোলকাতায়, পরিশ্রান্ত হয়ে একটা গাছের নীচে বসল খোকন। জিজ্ঞেস করল তাদের কাছে কোথায় যায়। তার জবাবে তারা ব্রজধামের কথা বলল। চমকে উঠল খোকন এবং তাদের সঙ্গে পথ ধরল। যেতে যেতে একজনকে জিজ্ঞেস করল কে থাকেন সেখানে?

তাও জান না মা লক্ষ্মী থাকেন।

কে মা লক্ষ্মী?

কে আবার মা, লক্ষ্মী, তাকে কে না চেনে এই কলকাতায়?

ব্রজধামে শুনে খুশীই হয়েছিল, কিন্তু তার অধিবাসিনী মা লক্ষ্মী, কে এই মা লক্ষ্মী তার কাকুর মাধুরী, না অন্য কেউ? গিয়েই দেখা যাক না।

ব্রজধামে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল খোকন। কত আয়োজন কত ব্যবস্থা। কিন্তু কে, যার জন্যে সে এতটা দূরে এসেছে, তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করল খোকন। লক্ষ্মী দেখা দেন না কাউকে—

হ্যাঁ দেখা দেন তিনি সন্তানদের। তবে এই সময় বড় ব্যস্ত। দশমীর দিন এসে সেদিন তিনি স্বহস্তে কাপড় বিতরণ করবেন, দুগ্ধ বিলাবেন। বিজয়া দশমীর দিন আসবে সে, দেখবে মা লক্ষ্মীকে, চলে যাচ্ছিল? হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা গাড়ী ছুটে গেল। খোকন সেদিকে চাইতেই আরোহীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই অন্তর তার শ্রদ্ধায় ভরে উঠল সত্যিই লক্ষ্মী এই মহিলা। খোকনের দৃষ্টি অনুসরণ করল কোথায় যান তিনি। গাড়ীটা রাস্তার পাশে থামল ডাক বাক্সটার কাছে। খোকন চেয়ে দেখলো মহিলা সেখানে নামলেন। হাতে তাঁর একটা নীল খাম, হ্যাঁ হ্যাঁ সে খামই ত যে খাম পর পর ৯ খানা সাজানো রয়েছে তাদের বাড়ীতে। আজ অষ্টমী হ্যাঁ আজইত ডাক করতে হবে বিজয়ার দিন পৌঁছাবার জন্যে। এই দিনই ত কাকুর নামে উপস্থিত হয় এই নীল খাম। অস্থির হয়ে পড়ল খোকন, দৌড়ে গিয়ে পায়ে লুটিয়ে কিন্তু ততক্ষণে মহিলা গাড়িতে উঠে ছেড়ে দিয়েছেন। বাধ্য হয়ে খোকনকে ফিরতে হল বাড়ী।

আজ বিজয়ার দিন, খোকন আগে থাকতেই তৈরী হয়েছিল, ভোরে উঠেই ব্রজধাম গিয়ে হাজির হল। আশ্চর্য হয়ে সে আয়োজনের সমারোহ দেখে,

অষ্টমীর দিন স্বহস্তে চিঠিখানা ডাকে দিয়েছে মাধুরী। প্রতি বৎসর দেয় আজ দশমী, মহেন্দ্র আজ পাবে চিঠিটা। মুখখানা হাসিতে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠলো সকাল থেকে অকারণ পুলকে মনটা স্পন্দিত হচ্ছে, না মস্ত বড় কারণ আছে, আজ বিজয়া দশমী মাধুরীর জীবনের বিশেষ দিন।

স্নান সেরে মহেন্দ্রের ফটোখানা সাজালো মাধুরী ফুল পাতা দিয়ে। ধুপ জ্বেলে দিল, প্রণাম করলো, তারপর বারান্দায় এসে দেখলো। লোকারণ্য, বিনামুল্যে আজ দুধ আর মিষ্টি বিতরণ করবে সে পাড়ার সব ছেলেমেয়েকে। বিকালে প্রত্যেক মেয়েকে মালা আর ফুলগুচ্ছ দেয়, আর দেয় নতুন জামা কাপড় গরীব ছেলেমেয়কে। এ পোষাক পরে তারা বিসর্জন দেখতে যায় এ পাড়ায়। দেখলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে সব দুধ নিচ্ছে, সবাই হাসি মুখ হৈ হুল্লার মধ্যেও আনন্দ। তৃপ্তির হাসি ফুটলো মাধুরীর মুখে। এই গরীবদের মুখে যদি হাসি না ফুটতো আজ, তবে মিছে মঙ্গল কলস হোত তার। মনে পড়লো, গাড়ীতে বসে মহীন আর মাধুরীর, দু'পয়সার বার্লি কিনতে এসে ছিল একটি মেয়ে, মেসই সুত্রপাত মহীন যদি একবার এসে দেখতো এইসব।

না না, মহীনের এসে কাজ নেই, বিয়ে, বৌ, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে আছে, তাকে তার অশক্ত দুর্বল শরীর সেবা যত্নে হয়তো সুস্থ হয়ে উঠেছে, পল্লী বধুর নিপূণ পরিচর্যায় হয়তো মোটা হয়ে উঠেছে। মাধুরী ভাবতে লাগলো, তার চিঠি খানা আজ পাবে, পেয়ে কি ভাববে মহীন। নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে মাধুরীর অন্তরে সে অক্ষয়, তার স্বাক্ষর তেমনি উজ্জ্বল আছে, কিন্তু তার পল্লীবধু দেখে যদি চিঠিগুলো কি ভাববে? নিশ্চয়ই সে মাধুরীকে শত্রু ভাববে না। মাধুরী তার মঙ্গলই কামনা করে।

দশ বছরে দশখানা চিঠি লিখেছে মাধুরী মহীনের বাঁধানো ফটোতে নয়টি দাগ রক্তের। আজ আর একটি দেবে, তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে ডান হাতের অনামিকা বিদ্ধ করলো রক্ত পড়ছে, ফটোতে ফোঁটা দিতে দিতে বললো—

এই একবিন্দু মধু তোমার দিলাম, রক্ত চোখের জলটা মুছে ফেললো মাধুরী হাসছে। নিজের সিঁথিতে ঠেকালো আঙ্গুলটা রক্ত লাগলো। প্রণাম করলো আবার এই চিহ্নটা ওর এয়োতির। আঙ্গুলটা তুলো দিয়ে বেঁধে নিল, তারপর বেরিয়ে গেল কাজ দেখতে।

বিরাট বিস্তর আয়োজন। স্তুপাকার করা হচ্ছে। জামাকপড় বিতরণ করা হবে। সদ্যজাত শিশু থেকে বারো বছরের ছেলেমেয়ের জন্যে নানা রকম পোশাক এ পল্লী দরিদ্র অধিবাসীদের জন্যই। তাদের হিসাব করে টিকিট দেওয়া হয়েছে। ক'খানা লাইন দিয়ে দাঁড়ালো এসে, বাচ্চারা তাহাদের মার কোলে আলাদা জায়গায়। পাড়ার কোন বয়স্ক বা শ্রদ্ধা ভাজন ব্যক্তি এই পৌরহিত্য করেন, জজ ম্যাজিস্ট্রেট, কাউকে ডাকে না মাধুরী, কিন্তু আরো কাজ আছে। ব্রজধামের বিদ্যার্থিগণ খেলাধুলা দেখাবে, আবৃত্তি করবে গান শোনাবে, ছোট মেয়েরা ফুলের মালা গাঁথার প্রতিযোগিতা দেখাবে এবং আরো কত কি তার জন্যেও পুরস্কার দেবে মাধুরী। ব্যাপারটা সমারোহের তাই বিস্তর লোক দেখতে আসে।

প্রকান্ড প্যান্ডেল, অসংখ্য লোক দেখছে এই দীপ্তময়ী দেবীকে, গান হোল আবৃত্তি হলো, খেলাও হলো, পুরস্কার বিতরণ চললো, অতঃপর সারি দিয়ে দাঁড়ালো বালক বালিকাদের পোশাক বিতরণ চলছে, কতক্ষণ লাগাবে কে জানে। হয়তো রাত হয়ে যাবে, যাক তবু খোকন দেখা করবেই ওর সঙ্গে। কিন্তু তার কাছে যাবে কি করে? যা ভিড়। আর উনি যে মাধুরী দেবী, তাও তো জানা নেই। ওঁর নাম কি লক্ষ্মী দেবী? আপন মনে ভাবছে খোকন এক কোনে দাঁড়িয়ে। যা হয় হবে, ওকে গিয়েই শুধুবে খোকন মাধুরী দেবীকে?

কিন্তু এই ভিড়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করে জানলো, ইনি চিরকুমারী মানব সেবাই এর ব্রত, গরীবের মা বাপ ইনি। লোকে একে পূজা করে বললেই হয়।

একটা বাচ্চা মেয়ে লাইনে, এগুতে পারছে না ভয়ে দেখে উনি বলছেন আয়, চলে আয় মা, ভয় কি? নিজেই এসে কোলে নিলেন মেয়েটাকে, তারপর তার ময়লা ছেড়ো ফ্রকখানা খুলে নতুন রঙিন ফ্রক আর ইজের পরিয়ে চুমা খেলেন, বললেন, তোমরাই সব আমার খোকা খুকু।

সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করে উঠলো, লক্ষ্মীমার জয় হোক। হাত ইশারায় থামতে বললেন দেবী, আবার চললো বিতরণ। অতঃপর দুঃখী মেয়েদের শাড়ী দিয়ে সিন্দুর দিয়ে, চিবুক ছুয়ে আদর করলেন। সবাই প্রণাম করছে ওকে।

খোকনের মনে হচ্ছে, নিশ্চয় উনি মাধুরী দেবী? ছুটে গিয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওর।

অপরাহ্ন হয়ে গেল এসব শেষ হতে, অভুক্ত ক্লান্ত লক্ষ্মীমা ভেতরে ঢুকলেন, আর জয়গান করতে করতে ঘরে ফিরলো অন্য সকলে। শূন্য প্যান্ডেলটায় খোকন একা লাজুকে খোকন দেখা করতে পারলো না। সেও ক্লান্ত অভুক্ত অসুস্থ বোধ করছে, ফিরে যাবে নাকি খোকন? চোখের সামনে ফটকটা বন্ধ হয়ে গেল।

শূন্য প্যান্ডেল ছেড়ে খোকন বাগানের পাশে গলি রাস্তাটায় এসে আনমনে চলতে লাগলো শুনতে পেল, ভেতরে রেকর্ড বাজছে, তার কাকুর গলা, দোতলার পানে চাইল

খোকন, না কিছু দেখা যায় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে গানখানা, খোকন আবার তাকালো দোতলার পানে। নিজের গলাটাও ওর সঙ্গে মিশিয়ে দিল—

তোমার আমার মিলন হবে ঐ খানে ঐ সন্ধ্যারাতে—
বিরহিনী বসুন্ধরা আলোর লাগি যেথায় জাগে।
ঐখানে ঐ সাগর বেলায়,
আকাশ যেথায় আবেশ ভরে অসীমতার পরশ লাগে।

জীবন সেথায় জেগে থাকে অতন্দ্র ঐ তারা পারা সঙ্গীতে আর সৌরভে যার বিরাম বিহীন প্রেমের ধারা—

লীলা কমল নিত্যা হেথায় গন্ধ মধু বিলায়ে যায়, মরণ হারা সেই যমুনার কুলে মিলন তরী।

খোকন গাইছে রেকর্ডটার সুরের সঙ্গে—

মরণহারা সেই যমুনার চির বাধাশ্যাম জাগে।

কে? কে ওখানে?

প্রশ্ন করেছেন জানালায় দাঁড়িয়ে সেই করুণারূপিণী দেবী। মুখ বাড়িয়ে দেখলেন খোকনকে, আবার সন্দেহ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—

কোত্থেকে কে আসছে? কি তোমার নাম?

আগ্রহ যে অতিরিক্ত বেড়ে গেছে তাঁর। কী এক প্রত্যাশায় চোখ মুখ দীপ্ত হয়ে উঠেছে কথা বলতে বলতে ছুটে নেমে এসে ওদিকার ছোট দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালেন— খোকন তার অবয়ব দেখতে পায়। হ্যাঁ বস্ত্র বিতরণ করছিলেন ইনি লক্ষ্মী মা। দেবী আবার বললেন—

তোমাকে যেন খুব চেনা মনে হচ্ছে, কাকে চাইছো? কেন এখানে দাঁড়িয়ে?

মাধুরী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। তিনি কি থাকেন এখানে?

হ্যাঁ, আমার নাম এসো তা কে তুমি? তুমি কে, যেন চিনেই ফেলেছে ওকে, এমনি তার মুখের ভাব।

হ্যাঁ মহেন্দ্র মুখোজ্যের ভাইপো আমি, বলে খোকন প্রণাম করতে যাবে—

কোলে মাধুরী ওকে টেনে নিল। এসো মানিক, এসো আজ বিজয়া দশমী। মহীনদা ভাল আছে তো খোকন? তোমাকে পাঠিয়ে—

মাধুরী টেনে বাগানের ভিতরে আনছেন খোকনকে, এ অবস্থাতে বলল তোমাকে মুখ দেখেই চিনতে পেরেছিলাম তোমার কাকুর মতন গড়ন কিনা, আর গলাটও তেমনি মিষ্টি। এস, সবাই ভাল আছে তো খোকন তোমার মা বাবা আর? কথাটা শেষ করলো, হয়তো মহীনের স্বীয় কথা শুধাতে চায়। একেবারে ঝিলের ধারে নিয়ে এল খোকনকে, কথা বলে চলছে মাধুরী তুমি তো ওর ভাইপো, মহীনের ক'টি ছেলেমেয়ে খোকন?

বিয়ে তো করেননি, কাকু। ছেলেমেয়ে নেই।

অ্যা, বলে আকস্মাৎ মাধুরী যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, পর মুহূর্তেই সুন্দর হাসিতে মুখ স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে উঠলো, সে মুখ এতো সুন্দর আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে যেন বিয়ের কনে, অনুরূপ—সে মূর্তি।

দেখলো খোকন, তার অনুভূতিময় অন্তর দিয়ে অনুভব করলো মাধুরীকে আপনার প্রেমে আপনি পরিপূর্ণ এক গরীয়সী রাধা যেন।

ভাবছে খোকন, কাকুর বিষয় কিছুই ইনি জানেন না, এর লেখা চিঠিতেই সেটা বোঝা যায় কাকুর কথাটা জানবার জন্যেই খোকন এখানে এসেছে আজ কিন্তু কেমন করে জানাবে খোকন। আরেকবার চেয়ে দেখলো ঐ দীপ্তিময়ী কে। মাধুরী বলছে—

বিয়েই করলো না? আশ্চর্য। ভেবেছিলাম ওকে হারিয়ে। আচ্ছা থাক ও কথা। হাসিটা চাপাতে পারছে না মাধুরী, কিন্তু স্নেহের উজ্জ্বলতা ওকে নবোঢ়া। বধূ থেকে সন্তানের জননী পর্যায়ে উন্নীত করে দিল, ঝিলের ঘাটে আনলো খোকনকে বলল—

এই যে ছেলে, এখানে দাঁড়াও আমার কোল ঘেঁষে হ্যাঁ তোমার কাকু বলে, বিশে

যত মা সবার চেহারা এক রকম দেখতে আমার চেহারাটা এই রকম হয়েছে কিনা? হাসছে মাধুরী, হাসছে খোকনের মুখ পানে চেয়ে। একি উচ্ছাস এক দুকুলপ্লাবী স্নেহের স্রোতস্বিনি। কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে খোকনের। কি করে সামলাবে খোকন।

চল ঐ নৌকায় বসে, তোমার কাকু এখানে আমায় প্রণব নাদ শোনাতঃ টেনে আনলো খোকনকে। জীর্ণ সেই নৌকাটা সযত্নে বাধা আছে।

ডুববে না, বসো এখানে কোথায় থাক খোকন?

লেবুতলায়, খোকন কথাটা শেষ করবার পূর্বেই মাধুরী, আবার বললো—

তুমি আজ আমার কাছে থাকবে। কাকুকে বলবে আমার কাছে ছিলে এই বিজয়া দশমীতে। বসো তোমার জন্যে খাবার আনতে বলি, বলেই মাধুরী ডাক দিল জোরে—

যত রকম ভাল খাবার আছে, নিয়ে আয় এখানে। খোকনকে বললো— ঝিলের জলেই হাত মুখ ধোবে নাকি বাথরুম যাবে?

না, এখানেই ধুই, বেচে গেল খোকন। চোখের জলটা ধুয়ে ফেললা। ঝিলের জলে মাধুরী লক্ষ্য করে নাই, কি এক স্বর্গীয় আনন্দে ও ভরপুর। তোমার কাকুর স্বাস্থ্যটা এখন নিশ্চয় ভাল হয়েছে, না খোকন?

আরেক আঁজলা জল চোখমুখে দিয়ে খোকন কান্না চাপলো। রাশীকৃত খাবার নিয়ে এল ঝি সন্দেশ রাবড়ি রসগোল্লা, দৈ কিন্তু মাধুরী খোকনকে বলল কাকু তোমার দুধ খাওয়াতে পারেনি ছোটবেলায়, সে কি দুঃখ তার। তাই আমি এখানে সব খোকা খুকুদের দুধ খাওয়াই, মা তো দুধই খাওয়াবে কি বল?

হ্যাঁ খোকন আরেক আঁজলা জল ছুঁড়ে দিল চোখে মুখে।.

এখন তো দুধ খেতে পাও খোকন?

হ্যাঁ, গাই আছে আমাদের বাড়িতে। কথাটা বলে শেষ করবার আগে আগেই মাধরী বললো—তোমার কাকু তাহলে ভালই রোজগার করে। ঘর সংসার শ্রী ফিরিয়েছে কেমন? তোমাকে তো কলকাতায় রেখে পড়াচ্ছে তোমায় ছেড়ে সে থাকতে পারে তো? দিনের মধ্যে কতবার যে তোমার নাম করতো— হাসছে মাধুরী।

আর সামলাতে পারছে না খোকন। কান্নায় ফেটে পড়ছে চোখ দুটো ওর। পকেট থেকে আধা ময়লা রুমালটা বের করে কড়কড়ে মুখ মুছছে, প্রকাশ হয়ে যাবে হয়তো কাকুর মৃত্যুর সংবাদ। না, কান্না ওকে রোধ করতেই হবে, খোকন অতি কষ্টে নিজেকে সামলাচ্ছে। কাকু যে এর মাঝে আজো জীবিত, কি করে খোকন জানাবে এঁকে মৃত্যু সংবাদ, না জানাতে পারবে না খোকন এই স্বপ্নময়ীর ঘুম ভাঙাবে না সে।

এসো, মাধুরী একটা সন্দেশ তুলে ওর মুখে দিচ্ছে—স্নেহশীতল মাতৃহস্ত বললো— বাজারের নয়, আমি নিজে তৈরী করেছি, দুধ ছানা সব এখানে তৈরি করি তোমার কাকুকে বলো, তার খোকনের মত হাজার খোকন নিত্য দুধ খায়, খাও, মুখে দিয়ে বললো—

এতো মিষ্টি গলা তোমার। গান শিখছো খোকন?

হ্যাঁ অল্প, কথা খোকন বলতে পারছে না, অসহ্য আর্ততায় স্বরটা গলায় আটকে যাচ্ছে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চায় সর্বাঙ্গ। কিন্তু আবার বললো মাধুরী তোমার কাকুর সেই সেতারটা বাজায় তো খোকন? এখনো সেটা বাজে?

হ্যাঁ খুব ভাল বাজে! অত ভাল সেতার আর নেই ওখানে।

আচ্ছা, তোমাকে আরেকটা কিনে দিব আমি। খাও সবগুলো খাও লক্ষী ছেলেটি, খেয়ে নাও। শেষে দুধ খাবে, ওর সর্বাঙ্গে হাত বুলুচ্ছে মাধুরী পুত্র—বিরহিনী মা যেন।

তোমার আর তো ভাই বোন নেই।

না, ওগুলো কি ফুল? খোকন নিজেই সামলাবার জন্যে কথা পালটাতে চায়।

ওগুলো? তোমার কাকুর ভাষাতেই বলি, ও নিজেই ওর পরিচয় যেমন তোমায় দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম হাসলো মাধুরী অম্লান সুন্দর হাসি গিলতে পারছে না, অশ্রুবাষ্প আটকে আছে গলায়, বললো—

আর খেলে হাঁটতো পারবো না, দুধটা খাই চোখের জল আবার সামলালো গেলাসের আড়ালে।

সে কি? তোমাদের সবই অমনি। তোমার কাকুও খুব কম খায়, খাবে ভালো করে।
হ্যাঁ, খোকন চোঁ চোঁ করে দুধ গিলছে।
আস্তে আস্তে খাও। চল, তোমায় ভেতরে নিয়ে যাই?
আমি-কাউকে কিছু বলে আসিনি, সবাই খুঁজবে বলে খোকন দুধের গ্লাসটা নামিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে যাবার আগেই মাধুরী আঁচল দিয়ে মুছে দিল বললো—
নাইবা গেলে আজ। আমার সঙ্গে গাড়ীতে বসে প্রতিমা বিসর্জন দেখবে। তোমার কাকুর সঙ্গে এই কথা আছে আমার তারপর সারারাত তোমাদের বাড়ির গল্প শুনবো।
হ্যাঁ, কিন্তু না আমার মামাতো বোনকে সঙ্গে নিয়ে বিসর্জন দেখতে যাক, না গেলে সে কাঁদবে। তাছাড়া বিজয়ায় প্রণাম করতে হবে, মিথ্যাই বললো খোকন। মানুষের যে মিথ্যা বলার কত দরকার আর সামলাতে পারছে না। পালাতে পারলে বাঁচে সে। মাধুরী বললো—
বেশ যাবে, হাসলো মাধুরী, হাতটা ধরে টেনে বললো, বলেই চলেছে—
তোমার কাকুকে একবার আসতে বলো খোকন, বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। বলো যে পৃথিবীর আদিম দিন আর নেই সে এখন ফলে ফুলে ভর্তি, অগণ্য তার সন্তান, সূর্য এখন মেঘের আড়াল থেকে বেরুতে পারে।
হাসলো মাধুরী, হেসে বললো—
তোমার কাকুর চিন্তা আর ভাষা অসাধারণ কিনা তারই ভাষায় বললাম কথাগুলো এসো—
খোকন নত হয়ে প্রণাম করবার ছলে চোখের জলটা সামলে নিল আবার কিন্তু মাধুরী সস্নেহে ওর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলছে—
বলো যে "মধু জমলে মোম হয় তখন আর গড়িয়ে যায় না" হাসছে মাধুরী—
ওটা তোমার কাকুর জন্য, ও তোমার বুঝে কাজ নেই। আসতে বলো তাকে একবার—
খোকন আর কথা কইতে চাইছে না, কইতে পারছে না।
ওকে এগিয়ে দেবার জন্যে মাধুরী সেই ছোট দরজাটার কাছে এলো। খোকন আবার প্রণাম করলো ওকে? মাথায় হাত দিয়ে বললো—
বেঁচে থাকো। বংশের গৌরব হয়ে বেঁচে থাকো—
ঠিক কাকুরই শেষ কথাটা, খোকন গট্ গট্ করে হাঁটছে।
ওকে একটিবার আসতে বলো খোকন মাধুরীর কণ্ঠ ঝংকার দিল আবার।
খোকন চলতে চলতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো দ্রুত হেঁটে চলছে। পালিয়ে যেতে হবে, যত শ্রীঘ্র পারে ওর কাছ থেকে পালাবে খোকন।
না, বলা হলো না বলতে পারলো না খোকন, কাকু নেই। কাকু যে ওর কাছে আছেন, ওর অন্তরে কাকু যে আজো জীবিত।
মোড়ের মাথায় এসে খোকন তাকালো একবার মাধুরী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাত তুলে বললেন—কাকুর সঙ্গে আবার এসো খোকন।
দ্রুত সরে গেল খোকন সেই ডাক বাক্সটার কাছে। দু'হাতের মধ্যে মাথাটা গুছে দাঁড়িয়ে পড়লো অসহ্য বেদনায় ওর সারা অংগ কাঁপছে— চোখের জল বন্যা নেমেছে দুই গণ্ডে। ডাকবাক্সে মাথা রাখলো।
তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে।

